اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

এল্‌ম ও আ'মল (২)

ভলিউম-৪

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান এম, এম; এফ, আর
প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

সূচী-পত্র

এলম্ ও খোদাভীতি

হিজরী ১৩৪১ সনের ২০শে শা'বান, রবিবার প্রাতঃকালে দিল্লীর মাদ্রাসায়ে আবদুররব-এ দাঁড়াইয়া, হযরত থানবী (রঃ) এলমের ফযীলত এবং আল্লাহ তা'আলার ভয় সম্বন্ধে তিন ঘন্টা কাল এই ওয়াযই করিয়াছিলেন। প্রায় সাত শত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। হযরত মাওলানা যাফর আহমদ ওস্মানী ছাহেব ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

o

[তাহাই প্রকৃত এল্ম যাহা আল্লাহ্ তা'আলার পথ প্রদর্শন করে, অন্তর হইতে পথভ্রষ্টতার মরিচা দূর করে। আর লোভ ও কুপ্রবৃত্তি দূর করিয়া অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় উৎপন্ন করে। এতদ্ভিন্ন আমলের উদ্দেশ্যেই এল্‌ম শিক্ষা কর। আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই হউক কিংবা অন্তঃকরণেরই হউক। যেহেতু কোন রাস্তাই উদ্দেশ্যবিহীন হইলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং আমল বিহনেও এল্‌ম কামেল হইবে না, ত্রুটিপূর্ণ হইবে।]

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم - اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم - انما يخشى الله من عباده العلماء - ان الله عزيز غفور ○

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে আলেমগণই ভয় করিয়া থাকেন। নিঃসন্দেহ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল পরাক্রান্ত, খুব ক্ষমাশীল।"

॥ বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা ॥

আমি যাহা তেলাওয়াত করিলাম উহা একটি আয়াতের অংশ বিশেষ। এল্‌ম এবং খোদাভীতির পারস্পরিক সম্পর্ক কোন গুপ্ত বিষয় নহে এবং এত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য যে, সাধারণের মুখে প্রথম ইহার দাবী করা হয়, অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াতটি পড়িয়াও দেওয়া হয়। যে ব্যক্তির কোরআন ও হাদীসের সহিত কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে সে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞ নহে। অতএব, অবস্থা তো ইহাই চায় যে, এ বিষয় বর্ণনা করারই প্রয়োজন নাই। হয়ত এখনকার এই বর্ণনাকে জানা বিষয়কে জানান হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা তো একটি প্রকাশ্য বিষয়—সকলেই জানে; কিন্তু আমি ইহার প্রয়োজনীয়তা এখনই ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ, যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, এই সম্পর্কটি সর্বজন বিদিত তথাপি এখনকার এই বর্ণনাকে 'অর্জিত-অর্জন' বলা যাইতে পারে না। কেননা, ইহাও সম্ভব যে, এই বর্ণনার দ্বারা খোদাভীতির প্রতি তাকীদ এবং সে বিষয়ে অধিকতর স্মরণ করাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ স্বতন্ত্রভাবে তাকীদও নূতন উপকারিতার মধ্যে গণ্য কিন্তু এখন তো ইহাতে প্রশ্ন রহিয়াছে যে, এলম ও খোদা ভীতির পারস্পরিক সম্পর্ক যেরূপ জানা থাকা উচিত তাহা আছে কি না। আসল কথা এই যে, সাধারণতঃ এই সম্পর্কটির পুরাপুরি জ্ঞানই অনেকের নাই। যদিও বলা বেআদবী, তথাপি এখন যেহেতু একটি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, সুতরাং পরিষ্কার ভাবে বলা যাইতেছে যে, সাধারণ তো সাধারণ, আমাদের ন্যায় লেখা-পড়া জানা লোকও যাঁহারা আলেম বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারাও অনেকে এই সম্পর্কটি সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান রাখেন না। আবার কাহারও জ্ঞান থাকিলে তদনুযায়ী আমল করেন না। আমলই যখন নাই তখন এলমও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, এল্‌মের উদ্দেশ্য আমল করা, তাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাই হউক কিংবা অন্তরের দ্বারাই হউক, উদ্দেশ্যযুক্ত না হইলে কোন পন্থাই পূর্ণ হয় না। অতএব, আমল বিহনে এলমও কামেল (পূর্ণ) হইবে না। অর্জনের বা লাভ করার দিক দিয়া যদি এল্‌মকে পূর্ণও মানিয়া লওয়া হয়, তথাপি আর এক দিক দিয়া অর্থাৎ আমল উদ্দেশ্য না হওয়ার কারণে সে দিক দিয়া অপূর্ণ।

এই তাক্‌রীরে একটি সন্দেহেরও অবসান হইয়া গেল। এই তাকরীরের প্রথম দিকের কোন কোন অংশের উপর হয়ত কেহ সন্দেহ করিয়া থাকিবেন যে, "আপনি তো বলিলেন, এলম আমলের জন্য উদ্দেশ্য, কিন্তু কোন কোন এল্‌ম তো শুধু জ্ঞান লাভই উদ্দেশ্য, যেমন আক্বায়েদ বা বিশ্বাস্য বিষয়সমূহের এল্‌ম। ইহাতে তো আমল উদ্দেশ্য নহে।" আমার পূর্বোক্ত বর্ণনার শেষাংশে এই সন্দেহের উত্তর হইয়া গিয়াছে।

উত্তরের সারমর্ম এই যে, এল্‌মকে ব্যাপকার্থক রাখিলে নিঃসন্দেহে কোন কোন এল্‌ম মূলতঃ উদ্দেশ্য, আর যদি এল্‌ম বলিতে পূর্ণ এল্‌মকে উদ্দেশ্যযুক্ত এল্‌ম বলা হয়, তবে এখন কোন এল্‌মই শুধু জ্ঞানার্জনের স্তরে কাম্য নহে ; বরং প্রত্যেক এল্‌ম হইতে আমলও উদ্দেশ্য, আবার আমার কথার মধ্যে আমলকে আমি ব্যাপকার্থক রাখিয়াছি, তাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল হউক কিংবা অন্তরের আমল হউক। সুতরাং এখন আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা এল্‌ম বলা হয় দৃঢ় বিশ্বাসকে, আর ইহা অভিজ্ঞতার কথা—শরীয়তে যেই স্তরের দৃঢ় বিশ্বাস উদ্দেশ্য উহা তদনুযায়ী আমল ব্যতীত হাছিল হয় না। যদি তুমি কোন একটি এল্‌ম্‌ হাছিল কর এবং উহা প্রয়োগ না কর, তদনুযায়ী কাজের অভ্যাস না কর, তবে নিশ্চিতরূপে তোমার এল্‌ম ত্রুটিপূর্ণ রহিয়া গেল। (যেমন, চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়িয়া চিকিৎসা-ব্যবসা করে না কিংবা বাবুর্চি খাদ্য পাকাইবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া পাককার্যে মশ্‌গুল হইল না, তবে তাহাদের এই জ্ঞান কোন কাজেরই থাকিবে না। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

এমন কি, যতক্ষণ খাঁটি আকীদাসমূহ যথা তাওহীদ ইত্যাদি অনুযায়ী আমল না করা হয়, ইহা হালে পরিণত হয় না, অথচ বিশ্বাসের পূর্ণতার স্তর সেই হালের অবস্থাই বটে।

অতএব, যাহারা নিজদিগকে এলমের গুণে গুণান্বিত মনে করে, তাহাদের মধ্যেও এই ত্রুটি বিদ্যমান, অর্থাৎ, তাহারা এল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না। অতএব, তাহারাও এল্‌ম এবং আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক হইতে অজ্ঞ। কিন্তু সকলে এরূপ নহে ; বরং ইহারা তাহারাই যাহারা নিজদিগকে খাছ ও বিশিষ্ট মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা খাছ নহে ; (বরং অন্য অর্থে ইহাদিগকে খাওয়াছ বলে।) কেননা, সাধারণ এবং বিশিষ্ট কথা দুইটি তুলনামূলক। যাহারা নিজদিগকে খাছ মনে করেন, কামেল খাছের তুলনায় তাহারাও আ'ম। এখন এরূপ সন্দেহ আসিতে পারে না যে, আমার অদ্যকার অবলম্বিত বিষয়টির বর্ণনা অর্জিত-অর্জন ; বরং বুঝা গেল যে, যাহা অর্জিত বা জ্ঞাত আছে তাহা উদ্দেশ্য নহে এবং যাহা উদ্দেশ্য তাহা জানা হয় নাই। যাহা অর্জিত আছে তাহা অপূর্ণ এল্‌ম, আর যাহা উদ্দেশ্য তাহা পূর্ণ এল্‌ম ; সুতরাং অদ্যকার বর্ণনায় তাহাই হাছিল হইবে যাহা জানা নাই। যাহা হউক, বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হইয়া গেল।

॥ সংশোধনের উপায় ॥

এখন একটি প্রশ্ন এই রহিয়া গেল যে, যাহারা বাস্তবিক পক্ষে খাছ ও বিশিষ্ট তাঁহাদের পক্ষে তো এই বর্ণনা অর্জিত অর্জন হইবে। ইহার সোজা উত্তর এই যে, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া আমি বর্ণনা করিতেছি না ; বরং আমি

নিজেই তাঁহাদের মুখাপেক্ষী, তাঁহারা আমাকে সংশোধনের উপায় বলিয়া দিন, তবে যাহারা আমার লক্ষ্যস্থল, যাহাদের উদ্দেশ্য এই বর্ণনা, তাহাদের জন্য ইহা অজানা বিষয়ের অর্জনই হইবে। এই দলে আমি নিজেও রহিয়াছি এবং নিজেকেও লক্ষ্য করিয়া এই বর্ণনা করিতেছি। যেমন কোরআন শরীফে জনৈক মুমেন ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে :

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

"আমার কাছে কোন্ ওযর আছে যে, আমি সেই খোদার এবাদত করিব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ? আর তোমাদের সকলকেই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।" ইহাতে সে তাওহীদের আদেশের লক্ষ্যস্থল নিজকেও করিয়াছে। অতএব, এই সন্দেহেরও অবসান হইল যে, নিজেকে সম্বোধন করিয়া বর্ণনা করা আবার কেমন কথা ? কেননা, ইহার নযীর স্বয়ং কোরআনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি একটি তথ্য বর্ণনা করিতেছি। যখন কোন কাজে আমার উৎসাহ কম হয়, তখন আমি সে কাজটি সম্বন্ধে সাধারণ সভায় একটি ব্যাপক বিষয় বর্ণনা করি। তাহার ফলে আমার নিজেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে রহস্য এই যে, যে কাজটি সম্বন্ধে ব্যাপক বর্ণনা হয়, সাধারণতঃ উহার প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং খুব মনোযোগ সহকারে বর্ণনা করা হয়। শ্রোতৃবর্গকে উহার প্রয়োজনীয়তা খুব ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে স্বভাবতঃ বক্তার অন্তরে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, এত তাকীদ সহকারে অন্যান্য মানুষকে আমি যে বিষয়ের আদেশ করিতেছি, সকলের আগে আমারই সে বিষয়ে আমল করা কর্তব্য। ইহাতে মোটামুটি উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। আবার যদি শ্রোতৃ মণ্ডলীর মধ্যে কোন বুযুর্গ ও নেককার লোক থাকেন এবং ওয়াযে তাঁহার মন খুশী হয় এবং তিনি অন্তরের সহিত দোআ করেন আর সেই দোআ আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন। অথবা যদি উক্ত ওয়াযে কাহারও উপকার হয় এবং এইরূপ ব্যাপকভাবে বর্ণনাকারী তাহার হেদায়ত প্রাপ্তির কারণ হইয়া যায়, তবে তাহা বড় এবাদত বলিয়া গণ্য হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা বক্তার উপরে রহমত বর্ষণ করেন। কেননা, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে তাঁহার দিকে ঝুকাইয়া দিয়াছেন। অতএব, তিনি বক্তাকেও ইহা হইতে মাহ্‌রূম করেন না। স্বয়ং বক্তা নিজ ওয়াযে উপকৃত হওয়ার এসমস্ত কারণ হইয়া থাকে।

ফলকথা, বর্ণনা করিয়া দেওয়াকেই আমি নিজের জন্যও সংশোধনের একটি হিতকর পন্থা মনে করিতেছি। ইহাতে আমার নিজেরও বহু উপকার হয়। এইকারণেই আমি বলিয়াছি, আমি নিজেকে লক্ষ্য করিয়াও এই বর্ণনা করিতেছি। এই কথাটি আমি এই উদ্দেশ্যে বলিয়া দিলাম যেন অন্যান্য লোকেরাও সংশোধনের এই পন্থা

অবলম্বন করেন, অর্থাৎ, যে কাজে তাঁহাদের উৎসাহের অভাব হয়, সে কাজটি সম্বন্ধে সাধারণ সভায় কিছু বর্ণনা করিয়া দিন। পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইন্‌শাআল্লাহ্ অবশ্যই উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। যাহা হউক, এখন বোধ করি কেহ আর এই বর্ণনায় অর্জিত অর্জনের সন্দেহ করিবেন না এবং বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন যদিও সকলের জন্য না হউক; বরং কতক লোকের জন্যই হউক। আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, কাহারও প্রয়োজন নাই, তবে আমি নিজের সংশোধনের নিমিত্ত ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি।

॥ এল্‌ম্ ও খোদাভীতির সম্পর্ক ॥

এখন শুনুন, এমনি তো এল্‌ম্ ও খোদাভীতির সম্পর্ক সকলেই জানে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে মানুষ খোদাভীতি ও এল্‌মের সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য এই আয়াতটি পড়িয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি ক্ষেত্র এই যে, কোন বক্তা এলমের ফযীলত এবং আবশ্যকতা বর্ণনার মনস্থ করিলে এবং মানুষকে এল্‌ম শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করিতে চাহিলে এই আয়াতটি পড়িয়া থাকেন। সেক্ষেত্রে তিনি এল্‌মের প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত এইরূপে বিশ্লেষণ করেন যে, এল্‌ম এমন বস্তু যাহার ফলে অন্তরে খোদাভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর খোদাভীতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। কেননা, কোরআনের স্থানে স্থানে খোদাভীতির নির্দেশ আসিয়াছে। اِتَّقُوا اللهَ "আল্লাহ্‌কে ভয় কর" আর فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ "তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না আমাকে ভয় কর।" এতদ্ভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, খোদাভীতি ঈমানের শর্ত।

اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ "আশা এবং ভয়ের মাঝখানে ঈমান।"

খোদাভীতির জন্য এল্‌মের প্রয়োজন। ঈমানের জন্য খোদাভীতির প্রয়োজন, আর নিয়ম এই যে, প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহাও প্রয়োজনীয় বটে। সুতরাং এল্‌ম হাছেল করা নিতান্ত জরুরী বলিয়া প্রমাণিত হইল।

আর একটি ক্ষেত্র এই যে, কেহ যদি নির্ভীকতা ও বেপরোয়ায়ীর সহিত কোন কাজ করে, তখন উপদেশচ্ছলে নিম্ন আয়াতটি পড়া হয় اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ "আলেমগণই কেবল খোদাকে ভয় করে।" ইহাতে বুঝা যায়, সে ব্যক্তি এল্‌ম্ হইতে মাহ্‌রূম বলিয়াই এরূপ কাজ করিয়াছে। তাহার এল্‌ম থাকিলে সে কখনও এমন নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতার কাজ করিত না।

প্রথম ক্ষেত্রে আয়াতের এবারত দ্বারাই এল্‌মের প্রয়োজনীয়তা কাজে দুঃসাহসিকতা এবং বেপরোয়ায়ীর কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অর্থে অনিবার্যরূপে

এল্‌মের ফযীলতও প্রমাণিত হইয়াছে। কেননা, অজ্ঞতাকে নাফরমানী কাজে দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে। অতএব, প্রকারান্তরে এল্‌মকে গুনাহের কাজ ত্যাগ করার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আর নাফরমানীর কাজ পরিহার করা নিতান্ত জরূরী ; সুতরাং উহার কারণও জরূরী হইল, আর শরীয়তে যে বস্তু জরূরী বলিয়া স্বীকৃত উহার ফযীলত অবধারিত। প্রয়োজন যেই স্তরের ফযীলতও সেই স্তরেরই হইবে। যেমন, ওয়াজিব অপেক্ষা ফরয অধিক জরূরী ; সুতরাং ফরযের ফযীলতও ওয়াজিবের চেয়ে অধিক। এইরূপে ওয়াজিব সুন্নতের চেয়ে এবং সুন্নত মুস্তাহাবের চেয়ে অধিক ফযীলতওয়ালা। যখন এল্‌মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইল কেননা, এল্‌মের অভাব দুঃসাহসিকতা ও বেপরোয়ায়ীর কারণ। সুতরাং এলমের ফযীলতও স্বীকৃত হইল। যাহা হউক, উভয় ক্ষেত্রেই আলোচ্য আয়াতটি পাঠের দ্বারা এল্‌মের ফযীলত প্রমাণ করা হইয়া থাকে। একস্থানে স্পষ্ট শব্দের দ্বারা, অপর স্থানে ইঙ্গিতের দ্বারা।

মোটকথা, এল্‌ম ও খোদাভীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলেই জানে। কিন্তু যেরূপ জানা উচিত তদ্রূপ জানে না। ইহার প্রমাণ এই যে, এই সম্পর্ক জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী কোন ফল দেখা যাইতেছে না ; বরং উহার বিপরীত ফলই প্রকাশ পাইতেছে। কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব উহার অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য হইতেই প্রকাশ পায়। যদি কোন স্থানে কোন বস্তুর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিদ্যমান থাকে, তবে বলা হইবে যে, এখানে উক্ত বস্তু বিদ্যমান আছে। আর যদি অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিদ্যমান না থাকে তবে বলিতে হইবে ; বস্তুটির অস্তিত্ব নাই। এই নিয়মানুসারে এখানে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, খোদাভীতি ও এল্‌মের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল ও বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে নাই ; বরং উহার বিপরীত ফলই বিদ্যমান রহিয়াছে।

॥ এল্‌ম সম্পর্কে ত্রুটি ॥

এলম ও খোদাভীতির সম্পর্ক জ্ঞান লাভ করিয়া আজকাল আমাদের মধ্যে দুই প্রকারের খারাবী সৃষ্টি হইয়াছে। একটি আলেমদের মধ্যে অপরটি ঐ দলের মধ্যে যাহারা আলেমদের খুঁত খুঁজিয়া বেড়ায় এবং সমালোচনা করে। আলেমদের মধ্যে এই খারাবী সৃষ্টি হইয়াছে যে, এই আয়াতটি দ্বারা এল্‌মের ফযীলত প্রমাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন এবং বলেন, দেখ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আলেমদের প্রশংসা করিয়াছেন। কাজেই এল্‌মের বড় ফযীলত, আর আমরা এলম হাছিল করিয়াছি। সুতরাং আমাদেরও ফযীলত আছে। কিন্তু এই ফযীলতের আসল কারণ যে খোদাভীতি উহা বর্ণনা করেন না। অন্যান্য লোকদিগকেও ইহার নির্দেশ দেন না যে, খোদাভীতি অর্জন কর। নিজেরাও সেদিকে গুরুত্ব প্রদান করেন না। অধিকন্তু উহার শিকড় হাল্‌কা

করিয়া দেন। যেমন, অধিকাংশ যাহেরী এল্‌মের আলেম এল্‌মে বাতেনকে অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করিয়া থাকে অথচ এল্‌মে বাতেন হইতেই খোদাভীতি উৎপন্ন হয়। আর যাঁহারা এল্‌মে বাতেন শিক্ষা করেন ও শিক্ষা দিয়া থাকেন তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া থাকে; বরং বিপদ এই যে, কেহ কেহ ভয় না করারই তা'লীম দিয়া থাকেন যদিও উহার বাহ্যিকরূপ অন্য রকম হউক; কিন্তু ভিতরে তাহা নির্ভীকতাই বটে।

যেমন, এক সময়ে মুসলমানগণ কাফেরদের সহিত মিলিত হইয়া যখন কুফরী ও নাফরমানীমূলক কার্য অবলম্বন করিল এবং কেহ কেহ তাহাদিগকে এসম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিল, তখন তাহাদের পক্ষ হইতে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহা হালাল হারামের মাস্‌আলা বর্ণনা করার সময় নহে, এখন কাজ করিবার সময়। জানি না, মুসলমানদের এমন কোন কাজও থাকিতে পারে যাহাতে তাহাদের হালাল হারাম জানিয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই। এই উত্তরে তাহারা যেন এক রকম পরিষ্কার ভাবেই মুসলমানদিগকে খোদার প্রতি নির্ভীক হওয়ার তা'লীম দিয়াছিল। অতএব, যে বস্তু এল্‌মের ফযীলতের কারণ ইহারা সে বস্তুরই মূলোচ্ছেদ করিয়া দিতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত ঠিক এইরূপ:

یکے بر سر شاخ و بن می برید + خداوند بستان نگہ کرد و دید

অর্থাৎ, "একব্যক্তি গাছের ডালের উপর বসিয়া উহার গোড়া কাটিতেছে, বাগানের মালিক তাকাইয়া তাহা দেখিলেন—"...।

খোদাভীতির সহিত এই ব্যবহার করিয়াও তাহারা এই ভাবিয়া মনে মনে বেশ খুশী যে, আমরা আলেম যাহাদের সম্বন্ধে খোদা বলিয়াছেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"আল্লাহ্‌র বান্দাগণ হইতে একমাত্র আলেমগণই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকেন" বরং কেহ কেহ ইহার সহিত আরও একটা কথা যোগ করিয়া থাকেন:

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ

'ইহা তাহারই জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে।' ইহার সারমর্ম এই হইল যে, আলেমগণ খোদাকে ভয় করেন। আর যাহারা খোদাকে ভয় করে তাহাদেরই জন্য বেহেশ্‌ত এবং তাহারা খোদার সন্তোষ লাভ করিবে। অতএব, এল্‌ম দ্বারা বেহেশ্‌ত ও খোদার সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে। এখন দেখুন এল্‌মের ফযীলত কত।

বন্ধুগণ! মূলে তো এই হিসাবটি বাস্তবিকই ঠিক, কিন্তু প্রথমে তো সেই মধ্যবর্তী বিষয়টি অর্থাৎ, খোদাভীতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে হইবে যাহার সম্মিলনে এই ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। আর যদি সেই খোদাভীতি শুধু কথার কথাই থাকে, তবে ফলও সেই কথার কথাই থাকিবে, বাস্তবে কিছুই হইবে না। আর এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী

বিষয়টি ঠিক সেইরূপই হইবে যেমন এক বানিয়া গড় বাহির করিয়াছিল। সে একটি গরুর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সপরিবারে কোথাও যাইতেছিল। পথে একটি নদী পড়িল যাহাতে অনেক পানি ছিল। গাড়োয়ান উহাতে গাড়ী নামাইতে ইতস্তঃ করিতেছিল, তখন বানিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা আমি বাঁশ ফেলিয়া পানি মাপিয়া লইতেছি। এই বলিয়া সে নদীর কিনারে বাঁশ ফেলিয়া দেখিল যেমনএক হাত পানি, আরও একটু সম্মুখে দেখিল আরও বেশী, তার সম্মুখে অথৈ পানি। সে সবগুলি কাগজে লিখিয়া গড় বাহির করিয়া দেখিল পানি কোমর পর্যন্ত। অতএব, গাড়োয়ানকে আদেশ করিল, গাড়ী নামাইয়া দাও। আমি গড় বাহির করিয়া দেখিয়াছি এই পানিতে গাড়ী ডুবিতে পারে না। মধ্যস্থলে পৌঁছিলে যখন গরু সহ গাড়ী ডুবিতে লাগিল, তখন বানিয়া পুনরায় তাহার হিসাবের কাগজ খুলিয়া দেখিল হিসাব ঠিকই আছে। এখন সে বলে, لکھا جوں کا توں کنبہ ڈوبا کیوں؟
"লেখা যেমনটি তেমনই আছে। পরিবার ডুবিল কেন ?"

সেই বোকা এতটুকু কথা ভাবিয়া দেখে নাই যে, মধ্যস্থলের গভীরতাকে সে যে সকল দিকে ভাগ করিয়া দিল তাহাতে কি বাস্তবেও মধ্যস্থলের পানি সবদিকে ভাগ হইয়া গেল ? কখনই তাহা হয় নাই। কাগজের ভাগ কাগজেই রহিয়াছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানের গভীরতা যতটুকু ঠিক ততটুকুই রহিয়া গিয়াছে। তাহার গড় বাহির করার কিছুই ফল হয় নাই। এইরূপে এখানেও মনে করুন, আপনি মধ্য বস্তুটির সাহায্যে ফল বাহির করিয়াছেন যে, এল্‌মের দ্বারা খোদাভীতি উৎপন্ন হয় এবং খোদাভীতির দ্বারা বেহেশ্‌ত লাভ হয়; সুতরাং আমরা বেহেশ্‌তী। আপনার এই মধ্যস্থ বিষয়টি শুধু কথায়ই আছে, বাস্তবে নাই। সুতরাং ফলও কথায় হইবে বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুই হইবে না।

যেমন, আপনি যদি কোন পুরুষকে বলেন, তুমি যদি স্ত্রীলোক হও, তবে গর্ভবতী হইবে, আর যদি তুমি গর্ভবতী হও, তবে সন্তান প্রসব করিবে। তবে কি আপনার এই কথা বিশ্বাসের ফলে সত্য সত্যই তাহার সন্তান জন্মিবে ? কখনই না। কেননা, তাহার স্ত্রীলোক হওয়া এবং গর্ভবতী হওয়া কেবল কথার কথা রহিয়া গিয়াছে। কাজেই সন্তান প্রসব করাও বাস্তবায়িত হইবে না—কথার কথাই থাকিবে।

অতএব, এরূপ বাক্য বিন্যাসে কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক সেইরূপই যেমন কোন মহাজনের গোমস্তা দোকানে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছিল—একশত টাকা হইতে ষাট টাকা গেলে হাতে থাকে চল্লিশ। আর এক হাজার হইতে সাত শত টাকা গেল, হাতে রহিল তিনশত। জনৈক ভিখারী তথায় দাঁড়াইয়া ইহা শুনিতেছিল। গোমস্তা হিসাব শেষ করিলে ভিখারী ভিক্ষা চাহিল। গোমস্তা বলিল, বাপু! আমার নিকট পয়সা কোথায় ? মহাজন আসিলে তাঁহার নিকট চাহিও। ভিখারী বলিল, তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

আমি প্রায় এক ঘণ্টাকাল যাবৎ দাঁড়াইয়া তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে শুনিতেছি যে, হাতে এত রহিল, হাতে এত রহিল। আমি সমস্ত অবশিষ্ট হিসাব করিয়া দেখিলাম তোমার হাতে কয়েক হাজার টাকা আছে। তবে তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ যে, তোমার হাতে কিছুই নাই ? গোমস্তা বলিল, বাপু! সেটা তো ছিল কাগজের হাত। আমার হাতে এক পয়সাও পড়ে নাই।

এইরূপে এখানেও মনে করুন, যে পর্যন্ত গর্ভের অস্তিত্ব বাস্তবায়িত না হইবে, সে পর্যন্ত সন্তানের অস্তিত্বও শুধু কল্পনায়ই থাকিবে ঠিক অনুরূপ ভাবে খোদাভীতির অস্তিত্ব যে পর্যন্ত বাস্তবরূপ গ্রহণ না করিবে সে পর্যন্ত উক্ত বাক্য বিন্যাসে এল্‌মের ফযীলত কথার কথায়ই থাকিবে। বন্ধুগণ! এই মধ্যস্থ বিষয়টি সর্বপ্রথমে বাস্তবে পরিণত হইতে হইবে। অর্থাৎ, সত্য সত্যই অন্তরে খোদার ভয় উৎপন্ন হইতে হইবে। তখন বাস্তবিক পক্ষে আপনি বেহেশ্‌ত পাইতে পারেন। অন্যথায় শুধু কথার কথায় কি হইবে ? কথায় কি কোথাও মনে খোদাভীতি জন্মিয়াছে ?

وَجَائِزَةٌ دَعْوَى الْمَحَبَّةِ فِي الْهَوَى + وَلٰكِنْ لَا يَخْفٰى كَلَامُ الْمُنَافِقِ

"এশ্‌কের বেলায় মহব্বতের দাবী করা যাইতে পারে। কিন্তু মুনাফেকের কথা কখনও গোপন থাকে না।"

॥ আগমন ও আনয়নের প্রভেদ ॥

যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শরাব পান করে নাই অথচ সে দাবী করিল যে, আমি বড় মূল্যবান শরাব পান করিয়াছি, তবে তাহার অবস্থাই তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবে ; বরং সে যদি মিছামিছি মাত্‌লামির ভান করিয়া টলিতেও থাকে তথাপি অভিজ্ঞ লোকেরা বুঝিয়া লইবে যে, শুধু ভণ্ডামি। অনভিজ্ঞ লোকেরা অবশ্য ধোকায় পতিত হইতে পারে। যেমন, জনৈক মৌলবী ছাহেব ধোকায় পড়িয়াছিলেন :

রুড়কী শহরে জনৈক ওয়ায়েয মৌলবী আসিলেন। এক সওদাগর তাঁহাকে দাওয়াত করিয়া নিজের দোকানে লইয়া গেলেন। সেকালে সবেমাত্র সোডা ওয়াটারের বোতল চালু হইয়াছে, তখন সোডার বোতলের ছিপি ভিতরে থাকিত না ; বোতলের মুখেই থাকিত। বোতলের মুখ শক্তি প্রয়োগে খুলিতে হইত। উক্ত সওদাগর মৌলবী ছাহেবের সম্মুখে একটি সোডা ওয়াটারের বোতল খুলিয়া পান করিলেন। বোতল খুলিতে উহা হইতে খুব বাষ্প উঠিল এবং ছিপি জোরে ছুটিয়া বহু দূরে যাইয়া পড়িল। মৌলবী ছাহেব উহাকে শরাব মনে করিয়া সওদাগরকে গাল-মন্দ বলিতে লাগিলেন। বলিলেন : 'তুমি শরাব খাও ?' সওদাগর বলিল : ইহা শরাব নহে, সোডা ওয়াটার, লেবু ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খুব ভাল জিনিষ। ইহা হযম ক্রিয়ার

খুব সাহায্য করে।' মোটকথা, সে উহার অনেক প্রশংসা করিয়া মৌলবী ছাহেবকে বলিল: আপনিও এক বোতল পান করুন।' প্রথমতঃ তিনি বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অস্বীকার করিতেই থাকিলেন। কিন্তু কসম খাইয়া বিশ্বাস জন্মাইবার কারণে অবশেষে এক বোতল পান করিলেন।

এখন সওদাগর একটু রঙ্গ করিতে মনস্থ করিলেন। মৌলবী ছাহেব বোতলটি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে সওদাগর মাতলামির ভান করিয়া ঝুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। মৌলবী ছাহেব তখন বেশ ঘাবড়াইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন: ইহা নিশ্চয়ই শরাব। এই ব্যক্তিকে নেশায় ধরিতেছে, কিছুক্ষণ পরে আমারও এরূপ অবস্থা হইবে। এই হতভাগা আমার দুর্নাম করিয়া দিল। লোকে কি বলিবে? "রাত্রে তো মৌলবী ওয়ায করিয়াছেন আর এখন শরাব পান করিতেছেন।" বলিল, আল্লাহুর ওয়াস্তে আমাকে কোঠার মধ্যে বন্ধ করিয়া দাও, যেন আমার মাতলামি কেহ দেখিতে না পায় এবং আল্লাহুর ওয়াস্তে আমাকে দুর্নামগ্রস্ত করিও না। আমি তো প্রথম হইতেই অস্বীকার করিতেছিলাম। কিন্তু তুমি ধোকা দিয়া আমাকে শরাব খাওয়াইয়া দিলে। মৌলবী ছাহেব খুব অস্থির হইয়া পড়িলে সে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আমি তো একটু রঙ্গ করিতেছিলাম মাত্র।

এই ঘটনায় মৌলবী ছাহেব ধোকায় পতিত হওয়ার কারণ এই ছিল যে, মৌলবী ছাহেব কোন দিন শরাবখোরকে দেখেন নাই। অন্যথায় সওদাগরের মাতলামি দেখিয়া তিনি ধোকায় পড়িতেন না। কেননা, সওদাগরের এই নেশা ইচ্ছা করিয়া আনয়ন করা হইয়াছিল। আর শরাবের নেশা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাআপনি আসিয়া থাকে এবং আগমন ও আনয়নের মধ্যে আস্‌মান জমিনের প্রভেদ। উভয়ের আকৃতিই বলিয়া দিবে যে, এই ব্যক্তি শরাব পান করিয়াছে এবং ঐ ব্যক্তি ভণ্ডামি করিতেছে।

॥ কথার ক্রিয়া ॥

দেখুন, যদি কেহ দাবী করে যে, আমি প্রত্যহ দুধ, ঘি, ঘৃত পক্ক এবং বলকারক খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহার চেহারায় মৃত্যুর ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, তবে এই ব্যক্তির দাবী কেহ মানিয়া লইতে পারে কি? কখনই না; বরং প্রত্যেকেই বলিবে, "চেহারা তো সাক্ষ্য দিতেছে যে, মিঞা সাহেব দুই বেলা পেট ভরিয়া শুষ্ক রুটিও খাইতেছে না।"

এইরূপে কেহ যদি হঠাৎ সংবাদ পায় যে, তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে যাহাতে চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে। এবং সে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বসিয়া এই সংবাদটি শ্রবণ করে। অতঃপর সে উক্ত সংবাদ গোপন রাখিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে জানাইল যে, আমি বড় আনন্দদায়ক একটি সংবাদ পাইয়াছি।

কিন্তু তখন তাহার অবস্থা এইরূপ যে, মুখ শুষ্ক, ঠোঁটে পাপড়ী জমিতেছে। চেহারায় নৈরাশ্যের ছায়াপাত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কে স্বীকার করিবে যে, তাহার নিকট আনন্দের খবর আসিয়াছে? এইরূপে বুঝিয়া লউন—শুধু খোদাভীতির দাবী করিলেই খোদাভীতির প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না; বরং দাবীদারের কৃত্রিমতা তাহার অবস্থা হইতে আপনাআপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহার হৃদয়ে খোদাভীতি বিদ্যমান তাহার অবস্থাই অনুরূপ হইয়া থাকে। তাহার নিকটে বসিলেই বুঝা যায় যে, তাহার হৃদয়ে খোদার ভয় বিদ্যমান আছে। প্রকাশ্যে যেমন হাসি খুশীই করুক না কেন। যেমন, ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী যতই ভান করিয়া মনের অবস্থা গোপন করার চেষ্টা করুক কিন্তু তাহা গোপন থাকিতে পারে না।

کہ عشق ومشک را نتواں نہفتن - "এশ্‌ক্ এবং মিশ্‌ক্‌কে কখনও গোপন রাখা যায় না":

می تواں داشت نہاں عشق زمردم لیکن + زردی رنگ رخ و خشکی لب را چہ علاج ؟

"এশ্‌ক্ তো লোক চক্ষু হইতে গোপন রাখা যায়। কিন্তু চেহারার ফেকাশে রং এবং ঠোঁটের শুষ্কতা গোপন রাখার কি উপায় হইতে পারে?"

হযরত গাউসে আ'যম (রঃ)-এর পুত্র যখন যাহেরী এলম সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন হযরত গাউসে আয'ম তাঁহাকে ওয়াযে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তিনি "আযাবের ভয় এবং সওয়াবের উৎসাহ ব্যঞ্জক বড় বড় বিষয় বর্ণনা করিলেন কিন্তু শ্রোতৃবর্গের উপর উহার কোনই ক্রিয়া হইল না। তিনি ওয়ায শেষ করিলে হযরত গাউসে আ'যম মিম্বরে তশ্‌রীফ নিলেন এবং গত রাত্রের একটি নিজস্ব সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করিলেনঃ "গতরাত্রে আমি রোযার উদ্দেশ্যে সেহরী খাওয়ার জন্য কিছু দুধ রাখিয়াছিলাম। একটি বিড়াল আসিয়া আমার দুধগুলি খাইয়া ফেলিয়াছে।" শুধু এতটুকু বলিতেই সভার অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল, কেহ কাঁদিতে লাগিল, কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ পরিধানের কাপড় ছিঁড়িতে লাগিল। গাউসে আ'যমের পুত্র ইহা দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ইহা এমন কি একটা বিষয় ছিল যে, মানুষ ইহাতে এত ভারাক্রান্ত হইয়া গেল। হযরত গাউসে আ'যম বলিলেনঃ 'বাপু! তোমার এল্‌ম্ এখন পর্যন্ত মুখেই সীমাবদ্ধ আছে। উহাকে অন্তরে পৌঁছাও।' তখন দেখিবে তোমার সামান্য কথাও মানুষের অন্তরে স্থান করিয়া ফেলিয়াছে।

বন্ধুগণ! আমি সত্য বলিতেছি, দ্বীনের সহিত সম্পর্কহীন মানুষ যদি দ্বীনের কথাও বলে, তবে উহাতে অন্ধকার মিশ্রিত থাকে। তাহার লিখিত অক্ষরগুলিতে এক প্রকার কালিমা লিপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনদার লোক দুনিয়ার কথা বলিলেও তাহাতে 'নূর' থাকে। কেননা, প্রকৃত পক্ষে কথা অন্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া আসে। অতএব, অন্তরের অবস্থার প্রতিক্রিয়া কথার মধ্যে অবশ্যই প্রকাশ পায়ঃ

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا + جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيْلاً

"নিশ্চয়, কথার উৎপত্তি অন্তরের মধ্যে, জিহ্বাকে শুধু অন্তরের অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ করা হইয়াছে।"

কথা তো কথাই, পোশাকের মধ্যেও অন্তরের অবস্থার ক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বুযুর্গ লোকদের পোশাকের মধ্যেও নূর থাকে। দর্শকগণ তাহা দর্শন করিয়া থাকেন; বরং তাঁহার বসিবার স্থানেও নূর থাকে।

আমার ওস্তাদজী মরহুম একবার ষ্টেশনে যাইয়া এক জায়গায় বসিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন। "এখানে বসিতেই নূরে অন্তর আলোকিত হইয়া গিয়াছে। কি কারণ? এখানে এত নূর কেন?" পরে জানা গেল একজন বুযুর্গ লোক আসিয়া কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহার সংস্পর্শে পাথরও মুক্তায় পরিণত হইয়াছে! ইহাই তো তাবার্‌রুকাতের মূল।

এইরূপে আমি বলিতেছি, দ্বীনের সহিত সম্পর্কহীন লোকের কিতাবে কালিমা লিপ্ত থাকে। যদিও তাহাতে ভাল ভাল বিষয় বস্তু লিখিত থাকুক এবং তাহা দিলওয়ালা লোকই দেখিতে পান। যেমন, কোন এক ব্যক্তি মাওলানা গোলাম আলী সাহেবের মজলিসে আসিলে তিনি বলিলেন: এই লোকটি আসিতেই মজলিস অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সন্ধান লইয়া দেখ তাহার নিকট কি আছে? অনুসন্ধানে দেখা গেল, শেখ বু-আলী সাইনা-এর কোন একটি কিতাব লোকটির বগলের নীচে রক্ষিত ছিল।

বন্ধুগণ! বক্তার হৃদয়ের ক্রিয়া তাহার কথায় এবং গ্রন্থ প্রণেতার হৃদয়ের অবস্থা তাহার রচিত গ্রন্থে অবশ্যই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই কারণেই বিধর্মীদের কিতাব কখনও পাঠ করা উচিত নহে। কেননা, কিতাব পাঠ করা আর উক্ত কিতাবের প্রণেতার সংসর্গে থাকা সমান কথা। বে-দ্বীনের সংসর্গে থাকার যে ফল, তাহার লিখিত কিতাব পাঠেরও সেই ফল। কিন্তু আজকাল মুসলমানগণ এবিষয়ে মোটেই পরোয়া করে না। প্রত্যেকেই যে কিতাব ইচ্ছা পড়িতে আরম্ভ করে।

॥ কিতাব পাঠে সাবধানতা ॥

বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে, রাসূলের ওয়াস্তে, বে-দ্বীনের বিশেষ করিয়া ইস্‌লামের শত্রুদের লিখিত পুস্তক কখনও পাঠ করিবেন না। তালেবে এল্‌মদিগকেও বলিতেছি তাহারা যেন এরূপ পুস্তক পাঠ না করে। উত্তর দিবার কিংবা প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেও যেন পাঠ না করে:

إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْكَامِلِيْنَ بِضَرُوْرَةٍ

'কিন্তু যদি কামেল লোকদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে কোন প্রয়োজনে পাঠ করিবার নির্দেশ দেন তবে পড়িতে পারে।"

হাদীসে নির্দেশ আছে, দাজ্জালের সংবাদ শুনা মাত্র তথা হইতে দূরে পালাইয়া যাইও, কাছে যাইও না। তর্ক-বিতর্ক এবং প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেও যাইও না। কেননা, তর্কের উদ্দেশ্যে তাহার নিকটে যাইয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসী হইয়া যাইবে। অতএব, তালেবে এল্‌মগণ, যেহেতু তাহাদের এলম অসম্পূর্ণ, তর্কের উদ্দেশ্যেও তাহারা যেন ইস্‌লাম বিরোধী লেখকের কিতাব পাঠ না করে। কেননা, কোন কুস্তীগীর কাহারও সহিত কুস্তী লড়িতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত প্রতিপক্ষ তাহার চেয়ে দুর্বল না সবল। দুর্বল হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। অন্যথায় তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকাই ভাল। এরূপ শক্তিশালী লোকের সহিত তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত যে তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞানী ও জ্ঞান বিশারদ লোক ভিন্ন অপর কাহারও জন্য বিধর্মী দলের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার অনুমতি নাই। কেননা, অনভিজ্ঞ লোকের উপর আশংকা আছে যে, কোন সময় নিজেই কোন সন্দেহের মধ্যে পতিত হইয়া ঈমান হারাইতে পারে। আজকাল বিরোধী সম্প্রদায়ের কিতাবে খুবই নিকৃষ্ট ধরণের বিষয়বস্তু লিখিত থাকে যাহা দেখিবা মাত্র প্রথম বারেই অপূর্ণ জ্ঞানী পাঠকের মন অস্থির ও দোদুল্যমান হইয়া পড়ে। কাজেই এই জাতীয় কিতাব কখনও পাঠ করা উচিত নহে।

॥ কেশ মোবারকের তাকসীম ॥

এই সফরেই আমি রেলগাড়ীতে জনৈক আর্য লেখকের একটি পুস্তক দেখিলাম। জনৈক সহযাত্রী আমাকে তাহা দেখাইলেন। পাপিষ্ঠ দুরাচার উহাতে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কেশ মোবারক 'তাক্‌সীম করার ঘটনার উপর প্রশ্নোত্থাপন করিয়াছে যে, نعوذ بالله তিনি 'মানুষ পূজা' তা'লীম দিয়াছেন। হুযুর (দঃ) বিদায় হজ্জের দিন স্বীয় কেশ মোবারক ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। এই লেখক উক্ত ঘটনার উপর মানুষ পূজার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে। আহা! তুই এশ্‌কের প্রতিক্রিয়া কি বুঝিবি? এশ্‌কের সহিত কাফেরের কি সম্পর্ক? আসল কথা এই যে, ছাহাবায়ে কেরাম হুযুরের প্রতি আশেক ছিলেন। তিনি বলিতেনঃ আমার মৃত্যুর পর তাহারা আমার ছুরত দেখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। কাজেই তিনি নিজের কেশ মোবারক তাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন যেন বিচ্ছেদ যন্ত্রণার সময় উহা দর্শন করিয়া কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি কোন দিন এশকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে সে বুঝিতে পারে, প্রিয় জনের এন্তেকালের পর তাঁহার স্মৃতি চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া কি পরিমাণ

সান্ত্বনা লাভ করা যায়। আশেকদের অবস্থা তো এইরূপ যে, তাহারা এতটুকু সংবাদ জানিতে পারিয়াই সন্তুষ্ট যে, হুযূর (দঃ)-এর কেশ মোবারক ইহজগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদিও তাহা দর্শনের ভাগ্য আমার আজও হয় নাই।

مرا از زلف تو موئے پسند ست + هوس را ره مده بوئے پسند ست

অর্থাৎ, "তোমার কেশ গুচ্ছের একটি মাত্র কেশই আমার পক্ষে অনেক। না, বরং উহার খুশ্‌বুই যথেষ্ট।" এরূপ ক্ষেত্রে বয়েতটি হযরত শেখ আবদুল হক দেহ্‌লবী (রঃ) লিখিয়াছেন যে, "আমরা যদিও কেশ মোবারকের দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করি নাই কিন্তু খবর তো পাইয়াছি যে, হাঁ, কেশ মোবারক দুনিয়াতেই আছে। বস্‌, আমাদের সান্ত্বনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অতএব বলুন, আশেকদিগকে সান্ত্বনা প্রদান কিসের মানুষ পূজা? পূজার সহিত ইহার কি সম্পর্ক? কোন বন্ধু সফরে যাত্রা করিবার কালে নিজের বন্ধু হইতে একটি আংটি কিংবা অন্য কিছু স্মৃতি চিহ্ন চায় এবং সে একটি স্মৃতি চিহ্ন দিয়া দেয়, তবে কি সে তাহার পূজা করে? কখনই না। হুযূর (দঃ) এর এই কাজও এই প্রকারেরই ছিল। ইহার উপর প্রশ্ন উঠে কেন?

এই উত্তরটি দেওয়া হইয়াছে প্রেমিকসুলভ রুচি অনুসারে। আর একটি উত্তর এই যে, হুযূর (দঃ) এই কেশ বন্টন দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামের একতা রক্ষা করিয়াছেন। কেননা, ছাহাবীগণ তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, তাঁহার ওযুর পানি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন। প্রত্যেকে চাহিতেন, 'হুযুরের ওযুর পানির ছিটা আমার গায়ে পড়ুক। অতএব, তাঁহারা কি হুযূরের কেশ মোবারক কখনও ত্যাগ করিতে পারিতেন? যাহা তাঁহার শরীর মোবারকের অংশ বিশেষ। যদি হুযুর (দঃ) তাহা নিজ হাতে বন্টন না করিয়া দিতেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে উহা লইয়া প্রতি-দ্বন্দ্বিতা হওয়া বিচিত্র ছিল না। এই কারণেই হুযূর (দঃ) নিজে উহা তাক্‌সীম করিয়া দিয়াছিলেন। এই উত্তর প্রশ্নকারীর রুচি অনুযায়ী দেওয়া হইল। কেননা, তাহারা একতাকেই ধর্ম ও ঈমান বলিয়া মনে করে, (যদিও ইহার তাওফীক তাহাদের কখনও না হয়,) হুযূর (দঃ) نعوذ بالله কি মানুষ পূজার তা'লীম দিবেন? অথচ তিনিই পৃথিবীতে তাওহীদের তা'লীম দিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে সকল ধর্মের লোকেরাই শির্‌কের মধ্যে লিপ্ত ছিল, তাওহীদ কেহ জানিত না। এই প্রশ্নকারী শুধু একটি ঘটনা দেখাইয়াছে, অন্যান্য ঘটনাসমূহ তো দেখেই নাই। যদি দেখিতে পাইত, তবে এই ঘটনাটির তথ্য তাহার দৃষ্টির সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া যাইত।

॥ কবর পূজা ॥

একবার ছাহাবায়ে কেরাম হুযূর (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন: পারসিকরা তাহাদের রাজাকে সেজদা করিয়া থাকে, আমরা কি আপনাকে সেজদা করিতে পারি না? আপনি

তো তাহার চেয়ে অধিক সেজ্‌দা পাইবার উপযোগী। হুযূর (দঃ) বলিলেন: তওবা কর, তওবা কর, খোদা তা'আলাকে ভিন্ন আর কাহাকেও সেজদা করা জায়েয নহে। অতঃপর বলিলেন: ارأيت لو مررت على قبري أكنت تسجد له 'বল ত, তোমরা যদি কোন সময় আমার কবরের নিকটে যাও, তবে কি তোমরা আমার কবরকে সেজ্‌দা করিবে?' ছাহাবাগণ বলিলেন: "না"। 'সুব্‌হানাল্লাহ্'। ছাহাবায়ে কেরামের স্বভাব কেমন নিখুঁত ছিল। কাজেই তো হুযুর (দঃ) তাঁহাদিগকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ছাহাবায়ে কেরামের স্বভাবের মধ্যে কথাটি দৃঢ়রূপে জমিয়া ছিল যে, কবর সেজ্‌দা করার উপযুক্ত নহে।

কিন্তু এখনকার রুচি ইহার বিপরীত। আজকালকার মুসলমানদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই বলিত, জী হাঁ। আমরা আপনার কবরকেও সেজদা করিব। কেননা, আজকাল কবর পূজার হিড়িক লাগিয়াছে। বুযুর্গানে দীনের মাযার-সমূহের সেজদা করা হইতেছে; বরং কোন কোন স্থানে আওলিয়ায়ে কেরামদের মাযার তো-নহে; বরং কোন কোন স্থানে তাঁহাদের রুমাল তাওলিয়া, কোন কোন স্থানে কুকুর, কিংবা তাঁহাদের খাটিয়া বা চৌকি কবরস্থ রহিয়াছে এবং উহার উপর মান্নত উৎসর্গ করা হইতেছে।

এক ব্যক্তি বলিত, আজকাল কাহাকেও ওলী বানাইয়া দেওয়া গণিকাদের ক্ষমতায় রহিয়াছে। কেননা, কোন একটি কবরের নিকট একবার যদি নাচগানের আসর জমান হইল, তখন হইতেই সেই কবরের সমাহিত লোকটি ওলী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামের জ্ঞান ও রুচি অতিশয় বিশুদ্ধ ছিল, তাঁহারা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কবরকে সেজ্‌দা করিব না। অথচ আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম পরলোক গমনের পরেও এক বিশেষ জীবনে জীবিত থাকেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করে। ছাহাবায়ে কেরামও তাহা জানিতেন, অবশ্য সেই জীবন এই পার্থিব জীবনের ন্যায় নহে; বরং তাহা আলমে বরযখের জীবন। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের বরযখী জীবন এমন শক্তিশালী যে, উহার কোন কোন লক্ষণ পার্থিব ব্যাপারেও প্রকাশ পায়। যেমন, তাঁহাদের বিবিগণকে নেকাহ করা কাহারও পক্ষে জায়েয নহে। যদিও এই হুকুমটির কথা কেবল হুযুর (দঃ) সম্বন্ধেই কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রকাশ্য ভাষা ব্যাপক বলিয়া বুঝা যাইতেছে এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। এই হুকুমটি হাদীসে ব্যাপক শব্দেই আসিয়াছে:

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة -

"আমরা-নবী সম্প্রদায়ের কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যাহাকিছু ত্যাগ করিয়া যাই তাহা ছদ্‌কাহ্‌"। আর তাঁহাদের দেহকে জমিন খাইতে পারে না। অর্থাৎ জমিনের সঙ্গে মিশিয়া যায় না। শহীদানের দেহ সম্বন্ধেও হাদীসে এরূপ বর্ণিত আছে। যাহা হউক, আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জীবিতই আছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ছাহাবায়ে কেরামের বিশুদ্ধ রুচি দেখুন, ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা এই উত্তরই দিয়াছেন যে, না, আমরা কবরকে সেজদা করিব না। হুযূর (দঃ) বলিলেন : তবে এখন কেন সেজদা করিতে চাও? ইহাতে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, যে বস্তু কোন এক সময়ে মৃত্যুর কারণে সেজদার উপযোগী থাকিবে না উহা কোন কালেই সেজদার উপযোগী নহে। অতএব, খোদা ভিন্ন আর কাহাকেও সেজ্‌দা করা জায়েয নহে। অথচ শুধু সেজদা সকল অবস্থায় এবাদতের মধ্যেও গণ্য নহে; বরং এবাদতের নিয়তে হইলে এবাদত; অন্যথায় সালামের উদ্দেশ্যে সেজদা করা প্রাচীনকালের শরীয়তসমূহে জায়েয ছিল। কিন্তু হুযূর (দঃ) নিজের জন্য তাহাও বরদাশত করেন নাই। এমন কি, আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেজদা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি তাহা পছন্দ করিতেন, তবে ছাহাবায়ে কেরাম যখন নিজেরাই তাঁহাকে সেজদা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি নিষেধ করিতেন? যে ব্যক্তি নিজে পুজিত হওয়া পছন্দ করে, সে তো এরূপ সুযোগকে স্বর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিবে। মনে করিবে, আমার তো বলিবারও প্রয়োজন হয় নাই, ভক্তেরা নিজেরাই সেজদার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু হুযূর (দঃ) জীবিতকালেও উহার অনুমতি দেন নাই এবং মৃত্যুর পরেও অনুমতি দেন নাই। অধিকন্তু তিনি মৃত্যুর পুর্বক্ষণে বলিয়া গিয়াছেন :

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ -

"ইহুদী নাছারাদের প্রতি খোদার লা'নৎ বর্ষিত হউক, যাহারা নিজেদের নবীগণের কবরসমূহকে সেজদার স্থান করিয়া লইয়াছে।" ইহাতে ছাহাবায়ে কেরামকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, তোমরা তোমাদের নবীর কবরের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিও না। এতদ্ভিন্ন হুযূর (দঃ) এসম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনাও করিয়াছেন, اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُّعْبَدُ - "হে খোদা! আমার কবরকে মূর্তি সাজাইও না যাহাকে পূজা করা হইবে।" এই পাপিষ্ঠ দুরাচার আর্য লেখক হুযূরের এসমস্ত তা'লীম কোন দিন দেখে নাই? যাহাতে সে বুঝিতে পারিত যে, হুযূর সর্বদা বান্দাই থাকিতে চাহিয়াছেন, মা'বুদ হইতে চাহেন নাই। কেবল এক কেশ বন্টনের ঘটনাই সে দেখিয়াছে যাহাতে নিজের তরফ হইতে উহার কারণ আবিষ্কার করিয়াছে যে, তদ্দ্বারা মানুষ পূজা-শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। আরে পাপিষ্ঠ! যে ব্যক্তির রুচি এরূপ হয়, তাহার

অপরাপর কার্য ও বাণী উহার বিরোধী হয় না। কিন্তু হুযূরের কার্য ও বাণীসমূহ এই ইচ্ছার প্রকাশ্য বিপরীত। তবে তোমার এই উক্তি কেমন করিয়া ঠিক হইবে যে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল মানুষ পূজার তা'লীম দেওয়া। কেননা, এই কাজের কারণ অন্য-কিছু হইতে পারে না? যেমন আমি বলিয়া দিয়াছি যে, এই কাজে হুযূরের শাসন-তান্ত্রিক উদ্দেশ্যও ছিল এবং প্রেমিক সুলভ উদ্দেশ্যও ছিল। মানুষ-পূজার সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। প্রসঙ্গক্রমে এই আলোচনাটি মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে, আসলে আমি বলিতেছিলাম—অন্তরের প্রতিক্রিয়া, মানুষের কথা এবং পোশাকে পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের তাবার্‌রুকের মধ্যে প্রভাব হইয়া থাকে এবং সংসর্গে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়া (প্রভাব) হয় :

یک زمانه صحبت با اولیاء + بہتر از صد ساله طاعت بے ریا

অর্থাৎ, "আউলিয়া-য়ে কেরামের সহিত সামান্য সময়ের সংসর্গ লাভ করা একশত বৎসর ধরিয়া রিয়াকারী ভিন্ন খাঁটি নিয়তে এবাদত করার চেয়ে উত্তম।" এই তো গেল সংসর্গ লাভের ফল, আর সাক্ষাৎ লাভ সম্বন্ধে মাওলানা বলেন :

اے لقائے تو جواب ہر سوال + مشکل از تو حل شود بے قیل وقال

"আপনি এতই মঙ্গলময় যে, আপনার সাক্ষাৎই সকল প্রশ্নের জবাব। নিঃসন্দেহ, আপনার দ্বারা সকল মুশ্‌কিল আসান হইয়া যায়।" আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, বুযুর্গানে দ্বীনের চেহারা মোবারকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। কোন কোন সময় বুযুর্গানের কাছে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে গিয়া দেখিলাম তাঁহাদের চেহারার দিকে দৃষ্টিপতিত হওয়া মাত্র প্রশ্নের উত্তর আপনাআপনি অন্তরে আসিয়া গিয়াছে; বরং আমি আরও অগ্রসর হইয়া বলিতেছি যে, বুযুর্গানের ধ্যান করিলেই ফল পাওয়া যায়। পীরের ধ্যান করার মাসআলাটির মূলতত্ত্ব ইহাই, যাহা সুফিয়ায়ে কেরাম শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে পরবর্তীকালে ইহাতে অনর্থক বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। এই কারণেই মাওলানা ইস্‌মাঈল শহীদ (রঃ) পীরের ধ্যান করিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু তিনি ধ্যান মাত্রকেই নিষেধ করেন নাই; বরং বিশেষ ধরনের ধ্যানকে নিষেধ করিয়াছেন—যাহা এই যুগে সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যদি কোথাও তাঁহার কথায় ব্যাপকতা দেখা যায়, তবে সেই ব্যাপকতার অর্থ তদ্রূপই হইবে—যেমন, আজকাল আমরা বলিয়া থাকি, "রেহান রাখা হারাম।" অথচ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ অর্থাৎ, শান্তি ও স্থিরতা লাভের উপায় রেহানের বস্তুসমূহ যাহা পাওনাদারের অধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আয়াত দ্বারা-পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রেহান রাখা জায়েয। কিন্তু আজকালের প্রচলিত নিয়মের রেহান হারাম। কেননা, আজকাল পাওনাদার রেহানে আবদ্ধ বস্তু হইতে ফলভোগ করিবে

বলিয়া শর্ত করিয়া থাকে—অথচ তাহা হারাম। এইরূপে মাওলানা শহীদ (রঃ)-এর বাণীতেও ধ্যান শব্দে সেই বিশেষ প্রকারের ধ্যানই উদ্দেশ্য যাহাতে আজকাল লোকে বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। কেহ কেহ বাস্তবিকই ইহাতে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

যেমন, এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, পীরের ধ্যান কেমন মনে করেন? আমি জবাব দিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি পীরের ধ্যান বলিতে কি মনে করিতেছ?" সে বলিল, পীরের আকৃতির মধ্যে খোদা তা'আলাকে মনে করা। আমি বলিলাম, ইহা তো পরিষ্কার শিরক্। মাওলানা শহীদ (রঃ) এই ধ্যানকেই নিষেধ করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই যে, তিনি পীরের ধ্যান বাতেল হওয়া সম্বন্ধে এই প্রমাণটি বর্ণনা করিয়াছেন: مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ "এসমস্ত কিসের অর্থহীন মূর্তি যাহার পূজায় তোমরা আত্মহারা হইয়া রহিয়াছ।" এই আয়াতটি মুশ্‌রিকদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। তবে সকল অবস্থার ধ্যানকে তিনি হারাম বলেন নাই। অন্যথায় তিনি শাহ্ ওলিউল্লাহ্ ছাহেবেরও পরিষ্কার ভাষায় প্রতিবাদ করিতেন। কেননা, শাহ্ ওলিউল্লাহ্ ছাহেব القول الجميل কিতাবে পীরের ধ্যানের মাস্‌আলা লিখিয়াছেন। আর যাঁহার নাম মৌলবী ইসমাঈল শহীদ, যিনি কাহারও পরোয়াকারী ছিলেন না, খুব স্পষ্টভাষী ছিলেন, যদি সকল অবস্থার ধ্যান হারাম মনে করিতেন, তবে তিনি শাহ্ ওলিউল্লাহ্ ছাহেব লিখিয়াছেন বলিয়া কোন পরোয়া করিতেন না; বরং দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহারও প্রতিবাদ করিতেন যে, এই মাসআলায় তিনি একটু অমনোযোগিতার পরিচয় দিয়াছেন কিংবা ভুল করিয়াছেন। কিন্তু মাওলানা শহীদ তাঁহার কোনই প্রতিবাদ করেন নাই; ইহাতে বুঝা গেল যে, মূল ধ্যানকে তিনি জায়েয মনে করিতেন। অবশ্য সীমাহীন বাড়াবাড়িকে হারাম বলিতেন।

অতএব, এই মাস্‌আলাটিতে আজকাল মানুষ দুই প্রকারের ত্রুটি করিতেছে। এক প্রকারের ত্রুটি এই যে, কেহ কেহ মুর্খতা বশতঃ এই মাস্‌আলায় সীমাহীন বাড়াবাড়ি করিয়াছে। যেমন, এইমাত্র আমি এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিলাম যে, সে খোদাকে পীরের আকৃতির মধ্যে মনে করাকে "পীরের ধ্যান" বলিয়া জানিত। আবার শুধু ধ্যানের স্তরেও অন্যান্য লোকেরা বাড়াবাড়ি করিয়াছে, ইহাদিগকে যাহেরী আলেম সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা যায়। তাহারা শুধু ধ্যানকেও হারাম বলিতেছে, অথচ উহাতে কোন দোষ নাই; বরং অলসতা অমনোযোগিতার কারণে যে সমস্ত বাজে কল্পনা আসিয়া মন অধিকার করে, পীরের ধ্যান দ্বারা তাহা দুর করা যায়। ইহার রহস্য এই যে, একটি যুক্তি সম্মত মাসআলা আছে: اَلنَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهُ اِلٰى شَيْئَيْنِ فِي اٰنٍ وَّاحِدٍ।

"নাফ্‌স্‌ একই সময়ে দুই বস্তুর প্রতি মনোযোগী হইতে পারে না"। অতএব, কল্পনা সে পর্যন্তই আসিতে পারিবে যে পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি মনের সম্পর্ক স্থাপিত না হয়। আর যদি কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া যায়, তখন আর বাজে কল্পনা আসিয়া মন অধিকার করিতে পারে না। এই কারণে বাজে চিন্তা ও কল্পনা দুরীভূত করার উদ্দেশ্যে মনকে অন্য কোন বস্তুর সহিত আকৃষ্ট রাখা হিতকর। যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, তবে ইহার চেয়ে উত্তম আর কি হইতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত মনের সম্পর্ক স্থাপনই তো আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তরীকৎ পন্থীর অন্তরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত এমন দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা কঠিন যেন আল্লাহ্‌ তা'আলার ধ্যানের সহিত অন্য কোন পদার্থের ধ্যান আসিতে না পারে। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুভবনীয়ও নহেন দর্শনীয়ও নহেন। অদৃশ্য এবং প্রাথমিক স্তরের তরীকৎ পন্থীর ধ্যান কোন অদৃশ্য বস্তুর সহিত জমে না। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় কোন অনুভবনীয় বস্তুর ধ্যান করা আবশ্যক যাহা সহজে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। অবশ্য ইহার জন্য নিজের স্ত্রীর ধ্যানও যথেষ্ট। কিন্তু সুফিয়ায়ে কেরাম পীরের ধ্যান এই উদ্দেশ্যে মনোনীত ও নির্ধারিত করিয়াছেন যে, পীর অনুভবনীয় হওয়ার সাথে সাথে ধর্ম কর্মের সহায়কও বটেন। তাঁহার প্রতি মহব্বত রাখিলে আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে বাধা জন্মে না; বরং এই সম্পর্ককে আরও বৃদ্ধি করে। কিন্তু বিবী কিংবা অন্য কোন পদার্থের ধ্যান করিলে যদি বিবীর কিংবা অন্য কোন বস্তুর মহব্বত অন্তরে দৃঢ় হইয়া যায়, তবে বাজে কল্পনা মন হইতে দুর করার পরে আবার সেই মহব্বতকেও দুর করিতে হইবে। ইহাতে পরিশ্রম দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। আর পীরের ধ্যানে পীরের প্রতি মহব্বত দৃঢ় হইয়া গেলে উহাকে মন হইতে দুর করিবার প্রয়োজন হইবে না; বরং পীরের মহব্বত যত অধিক হইবে আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাহা তত অধিক হিতকর ও সহায়ক হইবে।

ইহার কারণ এই যে, অন্যান্য জিনিসের প্রতি মহব্বত নাফ্‌সের কোন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য হইয়া থাকে, আর পীরের প্রতি মহব্বত সেই উদ্দেশ্যে হয় না; বরং শুধু খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই হইয়া থাকে। আর খোদার সহিত সম্বন্ধ করার জন্য কাহারও সঙ্গে মহব্বত করিলে তাহা প্রকৃতপক্ষে খোদার প্রতি মহব্বত বলিয়াই গণ্য হয়। দেখুন আমাদেরে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি কেহ আমাদের সন্তান কিংবা আমাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মহব্বত রাখে, তবে উহাকে আমরা নিজের প্রতি মহব্বত বলিয়াই মনে করি। এইরূপে যেহেতু খোদার জন্যই লোকে পীরের সহিত মহব্বত রাখে; সুতরাং উহাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি মহব্বত বলিয়াই মনে করিতে হইবে। ইহা আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে

প্রতিবন্ধক না হইয়া বরং সহায়কই হইবে। এই কারণেই সুফিয়ায়ে-কেরাম মন হইতে বাজে চিন্তা ও কল্পনা দূর করার উদ্দেশ্যে পীরের ধ্যানের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।) কলেমায় যে গায়রুল্লাহ্‌কে অন্তর হইতে দূর করা হয় এখানে (গায়র) শব্দের মান্তেকী অর্থ উদ্দেশ্য নহে। কেননা, তাহাতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বতও অন্তর হইতে দূর করিয়া দেওয়ার সন্দেহ হইতে পারে; বরং শব্দের প্রচলিত অর্থ এখানে গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ "বেগানা"। যেমন, বলা হয়, "ভাই তুমি তো আমার 'গায়র' নও" অর্থাৎ পর নও। এখানে যদি 'গায়র' শব্দের মান্তেকী অর্থ লওয়া হয়, তবে 'গায়র নও' শব্দের অর্থ হইবে তুমি আর আমি একই। তবে কি ইহাদের উভয়ের জন্য একই হুকুম হইবে অর্থাৎ একজনের বিবী অপর জনের জন্য হালাল হইবে? কখনই না। কাজেই এখানে 'গায়র' শব্দের মান্তেকী অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না। তদ্রূপ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমায় 'গায়রুল্লাহ্' বলিতে মান্তেকী 'গায়র' অর্থ হইবে না; বরং 'গায়র'-এর অর্থ হইবে 'আজনবী' অর্থাৎ 'পর' যাহার সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে। এই অর্থে রাসূলুল্লাহর মহব্বত এবং পীরের মহব্বত আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতের গায়র (পরিপন্থী) নহে, সুতরাং উহা অন্তর হইতে দূর করাও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সুফিয়ায়ে-কেরাম অনুপযুক্ত লোকদের নিকট গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মান্তেকী এবং প্রচলিত অর্থের প্যাঁচ লাগাইয়া রাখিয়াছেন যেন তাহারা এই রহস্যের সন্ধান না পায়। যেমন কবি বলিতেছেন:

با مدعی مگوئید اسرار عشق ومستی + بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی

"এশ্‌কের দাবীদার লোকের নিকট এশ্‌ক্ ও মত্ততার রহস্য প্রকাশ করিও না, তাহাদিগকে দুঃখ চিন্তা এবং আত্ম অহংকারে মরিতে দাও।" কবি আরও বলেন:

ابدال را ست مر اصطلاحے "আবদালের ভিন্ন একটি প্রচলিত পরিভাষা আছে।" তাহাদের পরিভাষা সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, সুতরাং প্রথমে তাঁহাদের নিজস্ব পরিভাষা জানিয়া লইতে হইবে। তৎপর তাঁহাদের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত। 'গায়র' সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রচলিত অর্থ যখন জানা গেল, তখন নিম্নোক্ত বয়েতটিতে আর কি প্রশ্ন হইতে পারে?

هرچه بینم درجهاں غیر تو نیست + یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو

"যাহাকিছু পৃথিবীতে দেখিতেছি তুমি ছাড়া নহে। হয়ত তুমি, কিংবা তোমার স্বভাব অথবা তোমার গন্ধ" (অর্থাৎ দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই আপনার আজ্ঞাবহ, প্রত্যেক বস্তু হইতে আপনারই মহিমা দৃষ্টিগোচর হইতেছে।) সারমর্ম এই যে, সমগ্র পৃথিবী আপনার গুণাবলী ও কার্যাবলী প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্র। আপনার সহিত সকল বস্তুরই সম্পর্ক রহিয়াছে। (সুতরাং অপর বলিতে কোন অস্তিত্বই নাই। সর্বত্র

আপনারই প্রকাশ, কিন্তু ইহার এবারত ও বর্ণনা ভঙ্গী এইরূপ যে, মুর্খ লোকেরা খোদার সত্তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধোকায় পড়িবে। অতএব, এই অর্থে পীরের মহব্বত খোদার মহব্বত ছাড়া অন্য কিছু নহে। কেননা, পীরের মহব্বত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবার সহায়। পীরের ধ্যানের ইহাই মুলকথা।

কিন্তু এমতাবস্থায় পীরের ধ্যান করা এই শর্তে জায়েয হইবে যেন সর্বদা উহাতেই মগ্ন হইয়া বসিয়া না থাকে। অর্থাৎ, উহার জন্য কোন নির্দিষ্ট ওযিফা বা সময় এমনভাবে নির্ধারণ না করা হয় যে, সেই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার খেয়াল আসিলেও ইচ্ছা পূর্বক উহাকে প্রতিরোধ করে। পীরের ধ্যানের ওযিফা নির্ধারিত করিয়া লওয়াতেই মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব, বুযুর্গানে দ্বীনের ছোহবৎ এবং সাক্ষাৎ তো বড় জিনিস। তাহাদের ধ্যানও খোদাপ্রাপ্তির জন্য হিতকর।

বুযুর্গানে দ্বীনের তাবারুক গ্রহণের মুলও ইহাই। কেননা, তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু দেখিয়া তাঁহাদের স্মরণ জীবন্ত হয় এবং তাঁহাদের স্মরণ মনে উদিত হইলে অন্তরে নুর উৎপন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে, পীর বুযুর্গের ছবি রাখাও জায়েয, যেহেতু উহাতেও ইয়াদ তাজা হয়। কেননা, পোশাক এবং ছবির মধ্যে পার্থক্য আছে। পোশাকের স্মৃতি অন্যরূপ, উহাতে পুজার আশঙ্কা নাই, পক্ষান্তরে ছবি রাখিলে পূজার আশঙ্কা আছে। বস্তুতঃ এই ছবি রাখার ফলেই পৃথিবীতে মুর্তি পূজা বিস্তার লাভ করিয়াছে।

মোটকথা, যখন প্রমাণিত হইল যে, আন্তরিক অবস্থার প্রভাব, কথা এবং পোশাকে প্রকাশ পায়। সুতরাং বিধর্মীদের রচিত পুস্তক এবং তাহাদের পোশাক হইতে দুরে থাকা উচিত। কেননা, বিধর্মীদের অন্তরে অন্ধকারই বিরাজমান,—তাহারা যতই পবিত্রতার দাবীই করুক না কেন এবং যতই ভাল ভাল বিষয় বস্তু বর্ণনা করুক না কেন ; কিন্তু তাহাদের দাবীর অবস্থা এইরূপ হইবে :

وَقَوْمٌ يَدَّعُوْنَ وِصَالَ لَيْلٰى + وَلَيْلٰى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ

"লোকে লায়লী অর্থাৎ, সত্যিকারের মাহবুবের মিলন লাভের দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু মাহবুব তাহাদের জন্য উহা স্বীকার করে না।" আর দ্বীনদার লোকের কথা দুনিয়াবী ব্যাপারেও নুরশূন্য হইবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ইহা গুপ্ত কথা নহে। তবে পরীক্ষাকারীর প্রকৃতি ও স্বভাব সুস্থ হইতে হইবে। বন্ধুগণ! দুই ভাই যদি একই রাত্রিতে নিজ নিজ বিবির নিকট গমন করে, যাহাদের মধ্যে একজন পুরুষত্ব শক্তির অধিকারী আর একজন নপুংষ। তবে প্রাতঃকালে উভয়ের চেহারা ও কথা-বার্তা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মিলন কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে এবং কে বঞ্চিত রহিয়াছে।

॥ খোদাভীতির প্রভাব ॥

খোদার বান্দাগণ! এতটুকু কথাও ত গোপন থাকে না। আর যে খোদাভীতির প্রভাবে পাহাড় কম্পিত হয় তাহা গোপন থাকিবে? আপনার অন্তরে খোদাভীতি থাকিবে আর তাহা আপনার কাজে-কর্মে প্রকাশ পাইবে না এমন কখনও হইতে পারে না। কিন্তু কতক লোক ধোকায় পতিত রহিয়াছে। নিজেকে নিজে খোদাভীরু ও খোদার সহিত সম্বন্ধযুক্ত মনে করে অথচ আল্লাহ্র দরবারে তাহার কোন পাত্তাই নাই। সম্ভবতঃ সে মনে করিয়া থাকিবে যে, যে বস্তুর কল্পনা মনে উদিত হয়, সে বস্তু স্বয়ং অন্তরে আবির্ভূক্ত হইয়া থাকে এবং সম্পর্ক ও ভয়ের কল্পনা তাহাদের আছে, কাজেই তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে খোদাভীরু এবং খোদার সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট হইয়া গেল। শুধু কল্পনা করিলেই যদি কোন বস্তু স্বয়ং অন্তরে আসিয়া পড়ে, তবে যে ব্যক্তি পর্বতের কল্পনা করে তাহার মনে হুবহু পর্বতই আসিয়া বিদ্যমান হওয়া উচিত। তবে পর্বতের কল্পনায় তাহার অন্তর ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না কেন? এত বড় বিরাট পদার্থ ক্ষুদ্র একটু অন্তরে কেমন করিয়া ধরিল? ইহা তো বাহ্যদর্শী লোকদের অজ্ঞতা। তাহারা শুধু খোদাভীতির কল্পনাকেই খোদাভীতি লাভ করা মনে করিয়া থাকে।

এখন আমি পীর সাহেবদের নাড়ি-ভুড়ি বাহির করিতেছি। ইহাদের মধ্যেও অনেকে ধোকায় পতিত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহারও সবে মাত্র মোকামের রুচি আয়ত্ত হইয়াছে। কিছু কিছু 'হাল কাইফিয়তও' দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু এখনও 'হাল' দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, অমনি পীর সাজিয়া বসিয়াছেন। শিক্ষা-দীক্ষার কায়দাও জানে। মানুষ তাঁহার হাতে সফলতাও লাভ করে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যায় তাঁহার সেই মোকামও নাই, সেই হালও নাই। তবে সেই খোদাভীতির প্রভাব কোথায় গেল? তাহার মধ্যে যদি খোদাভীতি বিদ্যমান থাকে, তবে গুনাহ্র কাজ হইতে বিরতি কেন নাই? যদি তিনি নম্র ও বিনয়ী হন, তবে লোকের কথায় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন কেন?

আসল কথা এই যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়েই স্বাদ উপভোগ করিয়াছেন, কিন্তু উদর পূর্ণ হয় নাই। স্বাদ কিছু ভোগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মনে করিলেন, যখন ইচ্ছা খোদাভীতি ও বিনয়ের 'হাল' মনে প্রবল করিয়া লইব। কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা বাস্তবে পরিণত না হয়, শুধু শুধু চাহিলে কি হইবে? চাওয়া তো কাফেরেরাও চাহিয়া ছিল "لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا" "আমরা ইচ্ছা করিলে এই কোরআনের ন্যায় কালাম বানাইতে পারিব।" কিন্তু কোন দিন করিয়া তো দেখায় নাই। এই ব্যক্তির চাওয়াও তদ্রূপ চাওয়াই বটে; অর্থাৎ, যখন চাহিব খোদাভীতি এবং বিনয় হাছিল করিয়া লইব। কিন্তু একদিনও হাছিল করে নাই। অতএব, এমতাবস্থায় তাহার পীর

সাজিয়া বসা ঠিক এইরূপই যেমন এক ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ করিবার ক্ষমতা আছে। সে বলিল, আমি যখন ইচ্ছা বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়া লইব। অতএব, তোমরা আমাকে এখন হইতেই 'বাবা' বলিতে থাক। বলুন ত, এখন হইতে তাহাকে 'বাবা' কেন বলা হইবে? তাহার উচিত প্রথমে বিবাহ করা। তারপর বিবীর সহিত সহবাস করা, যখন বিবী গর্ভবতী হইয়া প্রসব করিবে সেদিন হইতে সে আপনা-আপনিই 'বাবা' হইয়া যাইবে। কাহারও বলার প্রয়োজন হইবে না।

অতএব, হে তরীকতপন্থীর দল! শুধু মোকামের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইও না; বরং উহাতে দৃঢ়তা অর্জন কর। শুধু ইচ্ছার উপর থাকিও না। মনে করিও না যে, পন্থা ও উপায় যখন জানা হইয়াছে, তখন ইচ্ছামত পূর্ণতা অর্জন করা যাইবে। স্মরণ রাখিও, এইরূপে কখনও পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হইবে না। পূর্ণতা অর্জনের পূর্বেই যদি পীর সাজিয়া বস, তবে পূর্ণতা অর্জনের তাওফীকই কোন দিন হইবে না। পূর্ণতা অর্জনের পন্থা তো এইরূপ:

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی + تا راہ بیں نہ باشی کے راہبر شوی

"হে অজ্ঞ! চেষ্টা করিতে থাক, যেন জ্ঞানী হইতে পার। যে পর্যন্ত নিজে রাস্তা না দেখিবে সে পর্যন্ত তুমি রাস্তা প্রদর্শনকারী হইতে পারিবে না।"

در مکتب حقائق پیش ادیب عشق + ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی

"হাকীকত অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানের মাদ্রাসায় এশ্‌কের সাহিত্যিকের সম্মুখে, হাঁ, হে বৎস! চেষ্টা করিতে থাক, তাহা হইলে কোন দিন বাবা অর্থাৎ পীরও হইতে পারিবে।"

মোটকথা, পীর সাজিবার পূর্বে কোন কামেল পীরের জুতা সোজা করিতে থাক এবং বাবা সাজিবার পূর্বে বেটা হওয়ার চেষ্টা কর। নতুবা স্মরণ রাখিও, কিছু দিনের মধ্যে তোমার এই ব্যক্তিত্বের খোলস খুলিয়া যাইবে। কেননা, তোমার অবস্থা এইরূপ: মনে কর, কেহ যখন কাহারও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে, তখন তিনি খুব বিস্ময়ের সহিত বলিয়া থাকেন: "আমি তো কোন কিছুরই উপযুক্ত নহি। আমি তো নিজেকে সর্বাপেক্ষা অনুপযুক্ত মনে করিতেছি"; কিন্তু অতঃপর যদি সে আবার তাহাকে বলে: "হাঁ, সাহেব! আমি ভুল করিয়াছি। বাস্তবিকই তো আপনি একজন অনুপযুক্ত লোক।" তখন দেখিবেন তিনি উত্তেজিত হইয়া কেমন লাফাইতে আরম্ভ করেন।

আপনি যদি ইহার এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, সে ব্যক্তি অনুপযুক্ত হইলেও অপরে তাহাকে অনুপযুক্ত কেন বলিবে? ইহাতে তো স্বভাবতঃই মানুষ রাগান্বিত হইয়া উঠে। দেখুন, অন্ধ যদিও নিজেকে অন্ধ বলিয়া জানে, কিন্তু অপর কেহ তাহাকে অন্ধ বলিলে সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। কেননা, সে ব্যক্তি তিরস্কারস্বরূপ তাহাকে অন্ধ বলে। ঐ ব্যক্তিরও উত্তেজনা এবং লাফালাফি এই কারণে নহে যে, সে নিজেকে

উপযুক্ত বলিয়া মনে করে ; বরং সে ব্যক্তি তাহাকে তিরস্কারের সহিত অনুপযুক্ত বলিয়াছে কারণেই সে ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

আচ্ছা! আমি খুব দৃঢ়তা ও স্নেহের সহিত বলি, আফ্‌সুস! তুমি কোন কাজের উপযুক্ত নও। তুমি এখনও নিতান্ত বোকাই রহিয়া গেলে। (এই বাক্যটি খুব দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছিলেন, সুতরাং সমস্ত মজলিস লুটাইয়া পড়িল,) দেখি, ইহাতে আপনার মন অসন্তুষ্ট হয় কি না। ছাহেবান! সতিকারের নম্রতা ও বিনয় না আসা পর্যন্ত কেহ তিরস্কারের সুরেই বলুক কিংবা স্নেহ সুরেই বলুক অবশ্য মনঃক্ষুণ্ণতা আসিবেই। অতএব, মনে রাখিবেন, কৃত্রিমতা বেশী দিন চলিতে পারে না। এক দিন উহার খোলস খসিয়া পড়িবেই।

অতএব, মোকামাতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব অর্জন করিতে চেষ্টা কর। শুধু স্বাদ গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইও না। পাতিলের উপর হইতে একটু স্বাদ গ্রহণ করিলে পেট ভরে না ; বরং পূর্বের ক্ষুধা আরও তীব্র হইয়া উঠে এবং পেট খালি হইয়া যায়। এই পথে এই প্রকারের কুমন্ত্রণা এবং ধোকা অনেক আছে। অনেক সময় মোকামের একটু স্বাদ পাইলেই পূর্ণ সফলতার সন্দেহ হয়। এই কারণেই আরেফ শীরাযী বলেন:

در ره عشق وسوسۂ اهرمن بسے ست + هشدار وگوش را به پیام سروش دار

"এশ্‌কের বাতেনী পথে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং নানা জাতীয় বিপদ অনেক। উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সাবধান থাক এবং শরীয়তের বিধান মানিয়া চল।" پیام سروش শব্দের অর্থ 'ওহী' এবং ওহী বলিতে কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্‌ এবং তাসাওওফ সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। কোরআন হাদীস তো সরাসরি ওহী ; ইহা সকলেরই জ্ঞাত। আর ফেকাহ্‌ শাস্ত্রে যদিও 'কেয়াস' মধ্যস্থলে রহিয়াছে তথাপি কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে اَلْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ। "কেয়াস উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে নূতনরূপে কোন হুকুম প্রমাণ করে না।" আধ্যাত্মিক জ্ঞানী লোকেরা ফেকাহ্‌ এবং তাসাওওফে ওহীর রং দেখিতে পান এবং বলেন :

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش + من انداز قدت را می شناسم

"যে বর্ণের পোশাকই পরিধান কর না কেন, আমি তোমার দেহের অবয়ব দেখিয়া চিনিয়া লইব।"

॥ খোদাভীতির চিহ্ন ॥

খোদাভীতি সম্বন্ধে কোরআন হাদীস দ্বারাও জানিয়া লওয়া উচিত যে, শরীয়ত খোদাভীতি লাভের কি আলামত বর্ণনা করিয়াছে। শুনুন, রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বলিয়াছেন :

اَسْأَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

"আমি আপনার নিকট এতটুকু ভয়ই প্রার্থনা করিতেছি যাহা আমার ও আপনার প্রতি নাফরমানীর মধ্যস্থলে প্রতিবন্ধক হয়। ইহাতে বুঝা যায়, সে ভয়ই কাম্য যাহা গুনাহ্‌র কাজ হইতে বাধা প্রদান করে। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না, বুঝিতে হইবে যে, কাম্য ও বাঞ্ছনীয় ভয়-ভীতি তাহার মধ্যে নাই। আর যখন ভয়ই নাই তখন তাহার নিকট এল্‌ম্ থাকারও এমন কোন দলিল নাই, যে দলিলের বলে সে এল্‌মের দাবী করিতে পারে অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় এল্‌ম। যদিও কিতাবী এল্‌ম্ তাহার হাছিল আছে ; কিন্তু শরীয়ত বিধানে যে এল্‌ম্ কাম্য তাহা এই কিতাবী এল্‌ম্ নহে ; বরং বাঞ্ছনীয় এল্‌ম্ তাহাই যাহা হৃদয়ে স্থান করিয়া লয় এবং যে এল্‌মের জন্য খোদাভীতি অনিবার্য।

অবশ্য এই আয়াতটি হইতে প্রথম দৃষ্টিতে এই অর্থ বুঝা যায় না ; বরং ইহার বিপরীত অর্থই বুঝা যায়। অর্থাৎ খোদাভীতির জন্য এল্‌ম্ অপরিহার্য। কেননা, এল্‌মের উপরই খোদাভীতি নির্ভর করে। আর নির্ভরশীল বস্তুর অস্তিত্বের জন্য নির্ভরকৃত বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই আয়াতটি দ্বারা এল্‌মের জন্য খাশ্‌ইয়াৎ জরূরী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কিন্তু ওয়ায শেষ করার কাছাকাছি যাইয়া এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে আমি দেখাইয়া দিব যে, এই আয়াতটি দ্বারাই এবং এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব ছাড়াও অন্যান্য দলিলের সাহায্যে প্রমাণিত হইবে যে, খোদাভীতি যদি গুনাহ্‌গার ও গুনাহ্‌র কাজের মধ্যে আবরণ বা বাধা প্রদানকারী না হয়, তবে বুঝিতে হইবে কাম্য এল্‌মও তাহার হাছেল নাই। যেমন হাদীসে আছে, لا يزني الزاني وهو مؤمن "কোন যেনাকার যেনা করে না যে অবস্থায় সে মু'মেন," একথার প্রমাণ। এইরূপে 'যেনা' নির্ভীকতার প্রমাণ এবং যেনার সময় ঈমান থাকে না, বলা হইয়াছে। আর ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস এক অর্থে এল্‌ম। অতএব, যখন ভয় না থাকার অবস্থায় ঈমান থাকে না বলা হইয়াছে ; সুতরাং এল্‌মের অস্তিত্বের জন্য খোদাভীতি অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতএব, খোদাভীতি ও এল্‌মের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এক দিক হইতে কোরআন দ্বারা এবং অপরদিক হইতে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল। এইরূপে উভয় দিক হইতে উভয় বস্তুর পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সাব্যস্ত হইয়া গেল। তবে এতদুভয়ের একটির অস্তিত্বের অভাবে অপরটির অস্তিত্বও লোপ পাওয়ার যে হুকুম দেওয়া হয়, তাহা উহার মূল বস্তুর লোপ পাওয়া নহে ; বরং এই লোপ পাওয়ার অর্থ এই যে, একটির অভাবে অপরটির পূর্ণতা থাকিবে না। ত্রুটিপূর্ণ ও খর্ব হইয়া পড়িবে এবং বাঞ্ছনীয় কাম্য স্তর পর্যন্ত থাকিবে না। আর উহার কোন কোন ফল বা ক্রিয়ারও প্রকাশ হইবে না। যেমন, এই হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে—

لَا يَزْنِي وَفِيْهِ اَثَرُ الْاِيْمَانِ الْمَطْلُوْبِ

ইহার অর্থ হইল, "মুমেন ব্যক্তির মধ্যে যে পর্যন্ত ঈমানের বাঞ্ছনীয় ফল ও ক্রিয়া বিদ্যমান থাকিবে সে পর্যন্ত সে যেনা করিতে পারে না এবং যখন সে যেনা করিবে তদবস্থায় তাহার মধ্যে ঈমানের সেই কাম্য ফল থাকিবে না যদিও মূল ঈমান বাকী থাকে।" অতএব, এখানে মূল ঈমান লোপ পাওয়া অর্থ নহে ; বরং ঈমানের বাঞ্ছনীয় ফল বিদ্যমান না থাকা উদ্দেশ্য। কিংবা অন্য কথায় বলা যায়, যাহার মধ্যে খোদাভীতি না থাকিবে তাহা হইতে এল্‌ম সর্বোতভাবে লোপ পায় না ; বরং এল্‌মের ফল বা ক্রিয়া লোপ পায়। বস্তুতঃ শরীয়তের কাম্য সেই এল্‌মই যাহা স্বীয় ফল ও ক্রিয়াসহ হয়। (যেমন, তলোয়ার বলিতে সেই তলোয়ারই উদ্দেশ্য যাহাতে কাটিবার গুণ থাকে। এই গুণ না থাকিলে তাহা নামে মাত্র তলোয়ার হইবে।) অতএব, এই বাঞ্ছনীয় ফলের অভাব ঘটিলে সেখানে 'বাঞ্ছনীয় এল্‌ম নাই' বলা শুদ্ধ হইবে। খুব অনুধাবন করুন।

এই মর্মেই কবি বলেন :

علم چه بود آنکه ره بنما یدت + زنگ گمراهی ز دل بزدایدت

অর্থাৎ, উহাই বাঞ্ছনীয় এলম যাহা তোমাকে খোদার রাস্তা প্রদর্শন করে এবং অন্তর হইতে গোম্‌রাহীর মরিচা দূর করিয়া দেয়। কবি আরও বলেন :

این هوسها از سرت بیرون کند + خوف وخشیت در دلت افزون کند

অর্থাৎ, "তোমার মস্তিষ্ক হইতে লোভ-লালসা ও কু-প্রবৃত্তি বাহির করিয়া ফেলিয়া তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় বাড়াইয়া দেয়।"

تو ندانی جز یجوز ولا یجوز + خود ندانی که حوری یا عجوز *

"এলম হাছিল করিয়া, এই বস্তু জায়েয এবং এই বস্তু জায়েয নহে ছাড়া আর কিছুরই তোমার খবর নাই। তুমি ইহাও জান না যে, তুমি নিজে গ্রহণযোগ্যা হুর, না প্রত্যাখ্যানযোগ্যা বৃদ্ধা।" তোমার এলমের যখন এই অবস্থা যে, তুমি জায়েয না জায়েয ছাড়া আর কিছুই জান না এবং উহার কোন ফলাফল তোমার অন্তরে নাই। অতএব, তোমার এই অবস্থার উপরই বিনা দ্বিধায় নিম্নোক্ত বয়েতটির মর্ম প্রয়োগ করা যায় :

اَيُّهَا الْقَوْمُ الَّذِيْ فِي الْمَدْرَسَةْ + كُلُّ مَا حَصَّلْتُمُوْهُ وَسْوَسَةْ

"ছাহেবান! তোমরা মাদ্রাসায় লফ্‌যী বা কিতাবী এলম যাহা হাছিল করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণই ধোকা।"

علم نبود غیر علم عاشقی + ما بقی تلبیس ابلیس شقی *

"আশেকী এলম ছাড়া আর যত এলমই আছে সবকিছুই বদবখ্‌ত্ ইব্‌লিসের ধোকা।" সঙ্গে সঙ্গে আবার এলমে আশেকীর উদ্দেশ্য কি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন :

علم دین فقه ست و تفسیر و حدیث + هر که خواند غیر ازین گردد خبیث

"ফেকাহ্‌, তাফসীর এবং হাদীসই এল্‌মে দ্বীন। উদ্দেশ্যযুক্ত ভাবে যে কেহ এতদ্ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যা অর্জন করে তাহা অপবিত্র।

॥ এল্‌ম ও এশ্‌ক্‌ ॥

এল্‌ম্‌-ই আশেকীর উদ্দেশ্য বলিতে যাইয়া এল্‌মে দ্বীনের ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম যেন আপনারা বুঝিতে পারেন যে, এল্‌মে আশেকী বলিতে এল্‌মে-দ্বীনই উদ্দেশ্য।

কেননা, ঈমানই 'এশ্‌ক্‌, : والذين امنوا اشد حبا لله "আর যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে তাহারাই আল্লাহ্‌ তা'আলাকে অধিক ভালবাসে।" আর ঈমান যখন এশ্‌ক্‌ হইল সুতরাং ঈমান সম্বন্ধীয় এল্‌ম্‌ই এল্‌মে আশেকী। ইহা আমি এই জন্য বলিলাম যে, এল্‌মে আশেকী বলিতে কেহ যেন মানুষের এশ্‌ক মনে না করেন। যদি তাহা গণ্ডীর ভিতরে থাকে, তবে নিন্দনীয় নহে। যাহা দুইটি শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক শর্ত, অনিচ্ছা সত্ত্বে আপনা-আপনি হওয়া। দ্বিতীয় শর্ত, পবিত্রতা ও সাধুতা রক্ষা করা। এই দুই শর্তাধীন মানুষের এশ্‌ক নিন্দনীয় নহে; বরং এক স্তরে তাহা হিতকর বটে। ইহাতে মুরশিদের তা'লীম গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে মানুষের এশ্‌ক্‌ উদ্দেশ্য নহে। কেননা, এই 'এশ্‌কে মাখ্‌লুক' শরীয়তের কাম্য ও বাঞ্ছনীয় নহে। আর এখানে বাঞ্ছনীয় এশ্‌কের কথা হইতেছে। সাধারণ এশ্‌ক সম্বন্ধে একটি হাদীসেও উল্লেখ আছে :

من عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد

"যে ব্যক্তি এশ্‌কে পতিত হইয়াছে এবং উহাকে গোপন রাখিয়াছে ও পবিত্র রহিয়াছে, অতঃপর মরিয়া গিয়াছে সে ব্যক্তি শহীদ।" কিন্তু মুহাদ্দেসীনে কেরাম এই হাদীস সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে 'বানান হাদীস'ও বলিয়াছেন। কিন্তু "ছাহেবে মাকাসেদের" মতে 'বানান' নহে। আর যাঁহারা মাওযু' বলেন, তাঁহারা এই প্রমাণ আনয়ন করেন যে, "কোরআন ও হাদীসে কোথাও এশক্‌ শব্দের উল্লেখ নাই। এই কারণটি ঠিক নহে। কেননা, যেব্যক্তি উপরোক্ত বাক্যটি হাদীস বলিতেছে সে ব্যক্তি কোথায় স্বীকার করিতেছে যে, হাদীসের কিতাবে এই বাক্যটি উল্লেখ নাই?

দ্বিতীয়তঃ, ইহাও সম্ভব যে, উপরোক্ত বাক্যটি আসল হাদীসের অর্থ স্বরূপ রেওয়ায়ত করা হইয়াছে। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কালামে হয়ত এশ্‌ক শব্দ নাই, রেওয়ায়তকারী অর্থ ঐরূপ বুঝিয়া অর্থই রেওয়ায়ত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ হাদীসের অর্থগত রেওয়ায়ত করা জায়েয। তবে সনদ সম্বন্ধে

সন্দেহ থাকিলে অন্য কথা, কিংবা এমনও হইতে পারে যে, ব্যক্তি বিশেষের রুচি ইহাকে 'মাউযু' বলিয়া মনে করে, যদিও তাহার রুচি অপরের উপর দলিল হইতে পারে না। কিন্তু আমি এখন এসম্বন্ধে ঝগড়া করিব না, কেননা, রুচি এবং ব্যক্তিগত বিবেচনা ঝগড়ার বিষয় নহে। পরন্তু কায়দা অনুসারে এই বাক্যটির বিষয়বস্তু ভিত্তিহীন মনে হয় না। কেননা, উহাতে যেই এশ্‌কের কথা উল্লেখ আছে তাহা ইচ্ছাকৃত এশ্‌ক নহে যাহা নিজ হইতে ইচ্ছা করিয়া নিজের মাথায় চাপান হইয়াছে। যেমন সা'দী (রঃ) বলেন।

سوم باب عشق ست و مستی و شور — نه عشقے که بند ند بر خود بزور

"তৃতীয় এশ্‌ক্, মত্ততা ও চেঁচামেচির অধ্যায়, ইহা সেই এশ্‌ক নহে যাহা জবরদস্তী ইচ্ছাপূর্বক নিজের উপর চাপান হয়।" বরং এখানে অনিচ্ছাকৃত আপনা-আপনি উৎপন্ন এশ্‌কের বর্ণনাই উদ্দেশ্য। যাহা উৎপন্নও আপনা-আপনিই হইয়াছে এবং উহার স্থায়িত্বের জন্যও ইচ্ছাকৃত চেষ্টা করা হয় নাই। তৎসঙ্গে পবিত্রতাও বজায় রহিয়াছে। অর্থাৎ, ইচ্ছাপূর্বক মা'শুককে দেখে নাই। ইচ্ছাপূর্বক বসিয়া বসিয়া তাহার ধ্যানও করে নাই এবং ইচ্ছাপূর্বক তাহার কাছে যাতায়াতও করে নাই। কেননা, উক্ত বাক্যে فَعَفَّ (পবিত্রতা অবলম্বন করিয়াছে) শব্দ পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে এবং এসমস্ত ইচ্ছাপূর্বক দেখা, বসিয়া বসিয়া মা'শুকের ধ্যান করা এবং ইচ্ছাপূর্বক যাতায়াত করা পবিত্রতা বিরোধী। এখন শুধু অন্তরের এশ্‌কের সূর বাকী রহিল। বলা বাহুল্য, ইহা এমন একটি রোগ যাহাকে যক্ষ্মা, জ্বর প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এসমস্ত রোগ সম্বন্ধে হাদীস শরীফে শহীদ হওয়ার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ রহিয়াছে। রদ্দুল মুহ্‌তার কিতাবে আল্লামা শামী সয়ুতী হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, অন্যান্য রোগের ন্যায় এশ্‌কের জন্যও যদি শহীদ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে বিচিত্র কি? কেননা, এশ্‌কের যন্ত্রণা যক্ষ্মা প্রভৃতির যন্ত্রণা অপেক্ষা বাস্তবিকই অনেক বেশী। ইহাতে যদি পবিত্রতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়, তবে বাস্তবিকই ইহা বড় সাহসিকতা ও জাওয়াঁমরদীর কাজ। ইহাতে তলোয়ারের আঘাতের চেয়ে অনেক বেশী আঘাত খাইতে হয়। ইহা হইল মানুষের সহিত এশ্‌কের কথা।

॥ কাম্য এল্‌ম ॥

কিন্তু সকল অবস্থায় এল্‌মে আশেকী বলিতে মানুষের প্রতি এশ্‌ক সম্বন্ধীয় এল্‌ম উদ্দেশ্য হইবে না। কেননা, এই এশ্‌কের কোন খাছ এল্‌ম নাই।' যাহা হাছিল করা যাইতে পারে। কেননা, ইহা অনিচ্ছাকৃত এশ্‌ক, স্বেচ্ছায় কখনও উহা হাছিল করা যাইতে পারে না। আর স্বেচ্ছায় হাছিল করিতে পারিলে তাহা তো

নিন্দনীয়ই বটে। অবশ্য আলোচ্য হাদীসে এশ্‌কে এলাহী সম্বন্ধীয় এল্‌মই উদ্দেশ্য যাহা হাদীস, কোরআন এবং ফেকাহ শাস্ত্রে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া অন্যান্য এলম সম্বন্ধে বলা হয়, مَا بَقِيَ تَلْبِيسُ اِبْلِيسَ شَقِيٍّ "অর্থাৎ, আর অবশিষ্ট সমস্তই বদবখ্‌ত্‌ শয়তানের ধোকা।"

অবশিষ্টের মধ্যে আর কি রহিয়াছে ? হয়ত আপনি বলিবেন, এই তর্ক-শাস্ত্র বিজ্ঞান শাস্ত্র ইত্যাদি। না, বন্ধু! যদি অধীন শাস্ত্রগুলাকে অধীনের স্তরেই রাখা যায়, তবে ইহারা যে শাস্ত্রের সেবা করিয়া থাকে ইহারা সেগুলির মতই গণ্য হয়।

اَلتَّابِعُ فِيْ حُكْمِ الْمَتْبُوْعِ

"সেবাকারী সেবিতের হুকুমই প্রাপ্ত হয়।" এই নিয়মানুযায়ী তর্ক, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যন্ত্রবিদ্যাও এলমে দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন, বাদশাহের খাদেম, গোলাম প্রভৃতি পাত্র-মিত্র তাঁহার সঙ্গে হইলে তাহারাও বাদশাহর মতই গণ্য হয়। লোকে বাদশাহের যেমন খাতির করে বাদশাহের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া খাদেম গোলামেরও তদ্রূপই খাতির করিয়া থাকে। কিন্তু শর্ত রহিল এই যে, খাদেম বাদশাহের ফরমানবরদার খাদেম হইতে হইবে। অবাধ্য বা বিদ্রোহী খাদেম হইলে তদ্রূপ খাতিরের যোগ্য হইবে না!

অতএব, তর্ক-বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা যদি দ্বীনী মাস্‌আলা প্রমাণ করা এবং শরীয়তকে বুঝার কাজ লওয়া হয়, তবে এগুলিও এল্‌মে দ্বীন। আর যদি উহার সাহায্যে শরীয়তকে বাতিল করার কাজ লওয়া হয়, তবে উহা নাফরমান ও বিদ্রোহী এবং ইব্‌লীসের ধোকার অন্তর্ভুক্ত।

আরও দেখুন; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, এই খাদ্য প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইয়াছে ? তবে যেখানে আটা, ঘি এবং ডাল প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য হিসাব করা হয়, সেখানে হিসাবের মধ্যে ঘুঁটে এবং খড়ির মূল্যও ধরা হয়। অর্থাৎ চারি আনার খড়ি এবং দুই আনার ঘুঁটেও হিসাব করা হয়। তবে কি কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, "ঘুঁটে এবং খড়িও কি খাওয়ার জিনিস ? ইহা হিসাবে ধরিতেছেন কেন ? কখনও এরূপ প্রশ্ন করা হয় না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেও তখন জ্ঞানী লোক উত্তর দেন যে, ঘুঁটে ও খড়ি খাওয়া যায় না বটে, কিন্তু খাওয়ার খেদমত করিয়া থাকে।

তর্ক ও বিজ্ঞান শাস্ত্রকেও এইরূপই মনে করুন। যদি এগুলিকে দ্বীনের কাজে লাগান হয়, তবে খাদ্য প্রস্তুতে লাকড়ী খড়ির যেই স্থান ধর্মীয় ব্যাপারে তর্ক বিজ্ঞানের সেই স্থান। অর্থাৎ এগুলিকেও ধর্মের সঙ্গেই হিসাব করা হইবে, যেমন খড়িকে খাদ্যের সঙ্গে হিসাব করা হয়। আর যদি উহাদিগকে ধর্মের কাজে লাগান না হয়;

বরং উহাদিগকেই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা হয়, তবে উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ হইবে যেমন কেহ ঘুঁটেই খাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম কাম্য বিদ্যা তাহাই যাহা হাছিল করিলে অন্তরে বাঞ্ছিত ক্রিয়া ও ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কবি এই মর্মেই বলিয়াছেন :

علم چوں بردل زنی یارے شود + علم چوں برتن زنی مارے شود

"এলম যদি অন্তরের মধ্যে ক্রিয়া করে, তবে সাহায্যকারী বন্ধু হয়। আর যদি এলম দেহের উপর ক্রিয়া করে, তবে ধ্বংসকারী সাপে পরিণত হয়।"

॥ গর্ব এবং ফযীলত ॥

অতএব, বলুন আমরা যে, এলমের গর্ব বোধ করিতেছি এবং অন্তর আমাদের খোদাভীতি হইতে শূন্য; এমতাবস্থায় আমাদের এই গর্ব ঠিক না বেঠিক? সঙ্গত না অসঙ্গত? বলি, বন্ধু, প্রথমে অন্তরে খোদাভীতি উৎপন্ন করিয়া লও। হয়ত আপনি বলিবেন, তবে কি খোদাভীতি উৎপন্ন করিবার পরে আমরা এলমের জন্য গর্ব করিতে পারিব? ইহার জওয়াবও এই যে, প্রথমে খোদাভীতি উৎপন্ন করুন, তারপর দেখুন, আপনার খোদাভীতি আপনাকে গর্ব করিবার অনুমতি দেয় কি না? তখন খোদাভীতিই আপনার অহংকার এবং গর্বকে মুছিয়া ফেলিবে। এখন হয়ত আপনি বলিবেন, "ইহা তো এক বিচিত্র চক্র। খোদাভীতি অর্জনের পূর্বে এলমের জন্য এই কারণে গর্ব করিতে পারিলাম না যে, এখনও কাম্য এলম হাছিল হয় নাই। আবার খোদাভীতি অর্জনের পর এই কারণে গর্ব বোধ করিতে পারিলাম না যে, খোদাভীতি গর্ব করার স্পৃহাকেই মিটাইয়া দিয়াছে। এখন অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এলম গর্ব করার বস্তুই নহে।

না বন্ধু! খোদাভীতি হাছিল হওয়ার পর এলম বড়ই গর্বের বস্তু, কিন্তু স্বয়ং এলমের অধিকারীর জন্য নহে; বরং অন্যান্য লোকের জন্য। অর্থাৎ তখন আপনি গর্ব করিবেন না; বরং আমরা আপনার জন্য গর্ব করিব যে, দেখ, আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে এমন আলেম প্রস্তুত হয়। তখন আমরা আপনার জন্য গর্ববোধ করিব। বন্ধু! তখন আমরা আপনার জন্য কি আর গর্ব করিব? মহা মহা মানবগণ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলইহিমুস্‌সালাম আপনাদের জন্য গর্ব বোধ করিবেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে :

تَنَاكَحُوا تَوَالَدُوا فَاِنِّي اُبَاهِي بِكُمُ الْاُمَمَ -

অর্থাৎ, "বিবাহ কর, বাচ্চা পয়দা কর। কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য বিষয়ে অন্যান্য উম্মতদের উপর আমি ফখর করিব।" স্বয়ং হুযূর (দঃ) আপনাদের জন্য ফখর করিবেন যে, এমন এমন লোক আমার উম্মত। ইহা কি ছোট কথা? এখন

আপনারাই বলুন, আপনারা নিজেরা নিজের জন্য গর্ব বোধ করেন তাহাই ভাল ? না আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম আপনাদের জন্য গর্ব করিবেন তাহাই ভাল ? নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি শেষোক্ত অবস্থাই সর্বোচ্চ। অতএব, এখন তো আর এরূপ সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, এল্‌ম গৌরবের বস্তুই নহে। এই বর্ণনায় সেই প্রশ্নেরও জবাব হইয়া গেল যাহা মাওলানা রূমীর এই বয়েতের উপর করা হইয়াছিল যে, মাওলানা রূমী হযরত আলীকে নবীদের গৌরব কেমন করিয়া বলিলেন :

او خدو انداخت بر روے علی + افتخار ہر نبی وہر ولی

"যে ব্যক্তি হযরত আলীর (রাঃ) চেহারা মোবারকের উপর থুথু নিক্ষেপ করিল, যিনি প্রত্যেক নবী ও ওলীর গৌরব।" এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহার অর্থ উহাই যাহা اُبَاهِيْ بِكُمُ الْاُمَمَ "আমি তোমাদের লইয়া অন্যান্য উম্মতদের উপর গর্ব করিব।"

অর্থাৎ, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম হযরত আলীর জন্য গর্ব বোধ করিবেন। ইহাতে হযরত আলী আম্বিয়ায়ে কেরাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার ফযীলত অধিক বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা, ফখর দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের ফখর যাহা বড়রা ছোটদের উপর করিয়া থাকেন অর্থাৎ, তাঁহারা এই ভাবিয়া গর্বিত হন যে, আমার শিষ্য সেবক কিম্বা আমার ফয়েয প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে এমন এমন লোক রহিয়াছে। আর এক প্রকারের ফখর ছোটরা বড়দের উপর করিয়া থাকে। অর্থাৎ, তাহারা এই ভাবিয়া গর্ব বোধ করে যে, আমি অমুকের শিষ্য বা ছাত্র। সুতরাং হযরত আলীকে লইয়া ওলীদের ফখর করা বড়দের লইয়া ছোটদের ফখর করা। আর আম্বিয়ায়ে কেরাম হযরত আলীর জন্য ফখর করার অর্থ ছোটদের লইয়া বড়দের ফখর করা।

ফলকথা, খোদাভীতি অর্জনের পর আমাদের ওস্তাদ ছাহেবান আমাদের জন্য গর্ব বোধ করিবেন। খোদাভীতি অর্জনের পরেও কিন্তু আমরা নিজেরা নিজের জন্য গর্বিত হওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হইব না। কাজেই অর্জনের পূর্বে তো কিছুই না। কেননা, খোদাভীতি হীন এল্‌ম তো এল্‌মই নহে। ইহাতে গর্বের সম্ভাবনাই তো নাই। তুমি নিজেও না। তোমাকে লইয়া অপরেও না। বন্ধুগণ! এল্‌মকে আম্বিয়ায়ে কেরামের 'মীরাস' বলা হইয়া থাকে। তবে এখন দেখিয়া লউন আম্বিয়ায়ে কেরামের মীরাস কোন্ প্রকারের এল্‌ম - میراث پدر خواہی علم پدر آموز "বাপের মীরাস চাহিলে বাপের এল্‌ম শিক্ষা কর।" আম্বিয়ায়ে কেরামের এল্‌মও কি (نعوذ باللہ) এরূপই ছিল যে, কেবল মাস্‌আলা এবং পরিভাষা মুখস্থ করিয়াছিলেন, খোদাভীতির নামও নাই। কখনই না; বরং তাঁহাদের অবস্থা এই ছিল যে, যতই এল্‌ম বৃদ্ধি পাইত ততই খোদার ভয় বৃদ্ধি পাইত। হাদীসে বর্ণিত আছে : اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ "আমি তোমাদের চেয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক আল্লাহ্‌কে জানি এবং সর্বাপেক্ষা অধিক তাঁহাকে ভয় করি।"

অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, শুধু জানার জন্য এল্‌ম কাম্য নহে ; বরং খোদাভীতির উদ্দেশ্যে এল্‌ম কাম্য ও বাঞ্ছনীয়।

॥ কাম্য খোদাভীতি ॥

কিন্তু এখন আমাদের অবস্থা এইরূপ যে, এল্‌ম হাছিল করিয়াই পড়াইতে বসিয়া যাই এবং ইহাকে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি, খোদাভীতি অর্জনের প্রতি মোটেই গুরুত্ব প্রদান করি না। অথচ যাহা উদ্দেশ্য নহে, উহাকে উদ্দেশ্য বানাইয়া লওয়া মাকরূহ্। ফেকাহ্ শাস্ত্রের আলেমগণ এই রহস্যটি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। যেমন, তাঁহারা বলিয়াছেন, একবার ওযু করিয়া তদ্দ্বারা কোন এবাদৎ না করিয়া পুনরায় ওযু করা মাকরূহ্। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবশ্য এরূপ সন্দেহ হয় যে, একটি এবাদত রোধ করা হইল। কিন্তু তাঁহারা এই উম্মতে মোহাম্মদীর (দঃ) হাকীম ছিলেন। বাস্তবিকই তাঁহারা খুব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, লোকটি একটি উদ্দেশ্যবিহীন কাজকে যখন উদ্দেশ্যযুক্ত এবাদতের পুর্বে বার বার করিয়াছে, তখন সে যে কাজ উদ্দেশ্য নহে তাহাকে উদ্দেশ্য বানাইয়া লইয়াছে, আর ইহাই সীমালঙ্ঘন। এইরূপে শুধু পড়া এবং পড়ানকে মূল উদ্দেশ্য মনে করিয়া লওয়া সীমালঙ্ঘনের শামিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আমরা খোদাভীতি অর্জনের ফুরসৎ পাই না। ইহা তো ঠিক সেইরূপ উত্তরই হইল যেমন কোন এক ব্যক্তি নাপিতকে চিঠি দিয়া বলিল : 'অতি সত্বর ইহা অমুকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।' সে অতি দ্রুত দৌড়াইয়া গিয়া চিঠি খানি সে ব্যক্তির হাতে পৌঁছাইল। প্রাপক খুলিয়া দেখিলেন, লেফাফার ভিতরে কিছু সাদা কাগজ। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে তো কিছুই লেখা নাই, শুধু সাদা কাগজ। নাপিত বলিল : "হুযুর! সাহেব লিখিবার ফুরসৎ পান নাই। তাড়াতাড়ি এমনি পাঠাইয়া দিয়াছেন।" তিনি বলিলেন : "তবে মৌখিক কিছু বলিয়া দিয়াছেন কি ?" সে বলিল : "হুযুর! আমি তো প্রথমেই নিবেদন করিয়াছি যে, খুব তাড়াতাড়ি ছিল। কাজেই মুখেও কিছু বলিয়া দিতে পারেন নাই। খুবই তাড়াতাড়ি ছিল। এতটুকু ফুরসৎও ছিল না যে, মুখে কিছু বলিয়া দিতেন।" তিনি বলিলেন : 'তবে বোকা লোকটির বাহক পাঠাইবারই বা কি প্রয়োজন ছিল ?'

আপনার কথার উত্তরও ঠিক এইরূপই হইবে যে, 'খোদাভীতি অর্জন করিবার ফুরসৎ পাইতেছেন না, তবে উদ্দেশ্যবিহীন কাজের জন্য ফুরসৎ করিয়া কি ফল পাইলেন? আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিতাব পড়িয়া লইলেই খোদাভীতি আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে, স্বতন্ত্রভাবে উহা অর্জন করিবার প্রয়োজন হয় না। আমি বলি, শুধু কিতাব পড়িলে যে ভয় হাছিল হয় উহার অবস্থা এইরূপ, যেমন এক চুড়ি বিক্রেতা চুড়ির গাঠুরি মাথায় করিয়া হাটিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে জনৈক গ্রাম্য লোকের

সাক্ষাৎ হইল। সে উক্ত গাঠুরিতে লাঠির খোঁচা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহাতে কি? (গ্রাম্য বর্বরদের অভ্যাসই এইরূপ লাঠির ইশারায় কথা বলা।) চুড়ি বিক্রেতা উত্তর করিল, ইহাতে এমন বস্তু রহিয়াছে যে, আর একটি খোঁচা ইহাতে মারিলে ইহা কিছুই নহে।

কিতাব পড়িয়া যে খোদাভীতি লাভ হয়, উহার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। শয়তানের সামান্য আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় এবং দ্বিতীয় খোঁচায় উহার অস্তিত্বই লোপ পায়। আর প্রকৃত কাম্য খোদাভীতি উহাই যাহা গুনাহ্‌র প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, শয়তানের হাজার আঘাতেও ভাঙ্গে না। এখন তো আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এল্‌ম হাছিল করার পরে স্বতন্ত্ররূপে খোদাভীতি অর্জন করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে—যেন উহা দৃঢ় ও মজবুত হইয়া যায়। কিন্তু আজকাল আলেমগণ সেই খোদাভীতির মূলই উচ্ছেদ করিতেছেন। খান্‌কাহ্‌ওয়ালা পীর ছাহেবদের উপর প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট এবং অকর্মন্য বলিয়া মন্তব্য করেন। আরও বলেন, এখন খান্‌কায় বসিয়া থাকার সময় নহে। এ সমস্ত খান্‌কাহ্‌ এখন বন্ধ করিয়া দিন। সোবহানাল্লাহ্‌! যে সমস্ত বিদ্যালয় প্রকৃত উদ্দেশ্যের তা'লীম দেওয়ার জন্য বানান হইয়াছে তাহা অকেজো। আর যে সমস্ত বিদ্যালয় উদ্দেশ্যবিহীন তা'লীমের জন্য তাহা খুব কাজের।

আমার বর্ণনার সারমর্ম এই যে, যাহাকে তোমরা মূল উদ্দেশ্য মনে করিতেছ অর্থাৎ, পড়া ও পড়ান। তাহা প্রকৃতপক্ষে মূল উদ্দেশ্য নহে। শুধু মূল উদ্দেশ্য লাভ করার পন্থা। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য অন্য বস্তু। অর্থাৎ, এমন এল্‌ম শিক্ষা করা যাহাতে খোদার ভয় মনে উৎপন্ন হয়।

॥ সাধারণ লোকের তা'লীম ॥

এখন আমি একটু নীচে নামিয়া বলিতেছি, আচ্ছা, তুমি যে শিক্ষাকে মূল উদ্দেশ্য মনে করিতেছ। বল ত, তাহার হক্‌ই কি আদায় করিতেছ? আমি জিজ্ঞাসা করি, তা'লীম কাহার উদ্দেশ্যে? তুমি বলিবে তালেবে এল্‌মদের। আমি বলিব, তুমি এই উদ্দেশ্যও পূর্ণ কর নাই। কেননা, তালেবে-এলম দুই শ্রেণীর আছে খাছ্‌ এবং সাধারণ। তোমরা শুধু খাছ্‌ তালেবে এল্‌মদের তা'লীম দিতেছ। সাধারণ লোকেরা কি দোষ করিয়াছে? তাহাদিগকে কেন পড়াও না? তুমি হয়ত বলিবে, জানাব। সাধারণ লোক মীযান মুন্‌শাএব্‌ তুল্য আরবী ব্যাকরণ কেমন করিয়া পড়িবে? তাহারা তো "আলিফ বে"-ও জানে না। আমি বলিব, সাধারণ লোকের মীযান অন্যরূপ। সাধারণ লোককে তাহাদের 'মীযান' পড়াও, অর্থাৎ তাহাদিগকে কলেমা শিক্ষা দাও। পবিত্রতা অপবিত্রতার নিয়ম তালীম দাও, নামায শিখাও এবং প্রয়োজনীয় মাস্‌আলা মাসায়েল শুনাও। তাহাদের মধ্যে যাহারা উর্দু লেখা পড়া জানে

তাহাদিগকে দ্বীনীয়াত সম্বন্ধীয় ছোট ছোট কিতাব পড়াও। কিন্তু উর্দু ভাষায়ই পড়াইবে, বিলাতী ভাষায় বর্ণনা করিও না। কেননা, কোন কোন মৌলবীর উর্দুর মধ্যেও আরবী শব্দ ঢুকাইবার রোগ আছে।

লক্ষ্ণৌ শহরের একজন বুযুর্গ জমিদারের নিকট কয়েকজন গ্রামবাসী আসিল। মৌলবী ছাহেব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন :

امسال تمہارے کشت زار گندم پر تقاطر امطار ہوا یا نہیں

"অর্থাৎ, এ বৎসর তোমাদের গম কৃষির উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষিয়াছে কি না?" গ্রামবাসীরা বড় চতুর হইয়া থাকে। মৌলবী ছাহেবের এই কথা শুনিয়া একজন অন্য জনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, ভাই, মৌলবী ছাহেব এখন কোরআন শরীফ পড়িতেছেন। এখন চল যাই, যখন মানুষের ন্যায় কথা বলিবেন তখন আবার আসিব।

এইরূপ মৌলবী ফখরুল হাসান গঙ্গুহী বর্ণনা করিতেন—দিল্লীর একজন মাস্তেক হেকমতের মুদাররেসকে লোকে ওয়ায করার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি ওয়ায করিতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন : 'আমাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি আমাদিগকে لیس (অস্তিত্ব শূন্যতা) হইতে ایس (অস্তিত্বে) আনয়ন করিয়াছেন। আবার তিনি আমাদিগকে ایس হইতে لیس এ লইয়া যাইবেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি আমাদিগকে পুনরায়, لیس হইতে ایس এ আনয়ন করিবেন। আল্লাহ্‌র বান্দা সারাটি সময় এই لیس এবং ایس-এর মধ্যেই কাটাইয়া দিলেন। অতএব, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বিলাতী ভাষায় ওয়ায করিবেন না; বরং দৈনন্দিন কথাবার্তায় সাধারণ লোককে শরীয়তের মাসআলা বুঝাইয়া দিন।

আফসুস্! মৌলবীরা ওয়ায করা ছাড়িয়া দিয়াছে। আরও বিপদ এই যে, কেহ কেহ মনে করেন ওয়ায করা মূর্খ লোকের কাজ, আলেমদের কাজ হইল ফতুয়া দেওয়া এবং পড়ান। বন্ধুগণ! একটু মুখ সামলাইয়া কথা বলুন। আপনাদের এই কথা অনেক দূর পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। আজ পর্যন্ত যত নবী অতীত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এরূপ ছিলেন যে, কিতাব পড়াইতেন? ইন্‌শাআল্লাহ্ একজন নবীও আপনি এরূপ দেখাইতে পারিবেন না; বরং নবীদের (আঃ) নিয়ম ছিল, তাঁহারা ওয়ায নছীহতকে ধর্ম-প্রচারের পন্থা করিয়া লইয়াছিলেন। আমি বলিতেছি না যে, পড়া এবং পড়ানও অনর্থক। ইহার প্রয়োজনীয়তাও আমি এখনই বর্ণনা করিব, কিন্তু আগে আমি ঐ সমস্ত লোকের জবাব দিতেছি যাহারা ওয়াযকে অনর্থক এবং বেকার মনে করিয়া থাকেন। আমি তাহাদিগকে বলি, হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামের আসল কাজ ইহাই ছিল। আপনাদেরও সেই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত। সাধারণ লোকের তা'লীম এইরূপেই হইতে পারে। সকলে মীযান মুন্‌শা'এব পড়িবার ফুরসৎ পায় না।

কেহ যদি বলে, "ওয়াযে কোন ফল হয় না। কাজেই ওয়ায করা অনর্থক। পক্ষান্তরে পড়াইলে ফল হয়, কাজেই আমরা ওয়াযের পরিবর্তে পড়ানের কাজে মশ্‌গুল হইয়াছি।" তবে ইহার উত্তর এই যে, ফল পৌঁছান আপনার কর্তব্য নহে। আপনি নিজের কর্তব্য পালন করুন, ফল খোদার হাতে। যাহাকে তিনি উপকার বা ফল পৌঁছাইতে চাহিবেন তাহার মধ্যে তিনি এমনি ফল পয়দা করিয়া দিবেন। মাওলানা বলেন ঃ

نوح نہ صد سال دعوت می نمود + دمبدم انکار قومش می فزود

"নূহ (আঃ) নয় শত বৎসর ধরিয়া ধর্ম-প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাঁহার সম্প্রদায়ের নাফরমানী বাড়িয়া গিয়াছে।" হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয় শত বৎসর ধরিয়া নিজের সম্প্রদায়কে ওয়ায নছীহত দ্বারা বুঝাইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের উপর কোনই ফল ফলে নাই, কিন্তু নূহ (আঃ) এত দীর্ঘ সময়েও ঘাব্‌ড়ান নাই। আর আপনি চারি দিনেই ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন ?

এখন আমার ভাইয়েরা এই করিতেছেন যে, যে কাজ তাহাদের কাবুর বাহিরে উহাতে খুবই চেষ্টা করিতেছেন। রাজত্ব লাভের জন্য লম্বা লম্বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। তাহাতে টাকাও ব্যয় করিতেছেন। অথচ উহাতে সফলতা লাভের ধারণা তো দূরের কথা একটু কল্পনাও হয় না। আর ধর্ম সম্বন্ধে কোন চেষ্টাই করে না। ইহাতে চেষ্টা করিলে সফলতা লাভের ওয়াদাও আছে। দুনিয়াতে না হইলেও আখেরাতে সুনিশ্চিত এবং এই কাজ তাহাদের আয়ত্তের মধ্যেও বটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, আমাদের অনেক অজ্ঞ মুসলমান ভাই যাহাদিগকে আমাদের সমাজ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং এ পর্যন্ত তাহাদিগ হইতে অমনোযোগী ছিলাম, শত্রুরা তাহাদের পাছে লাগা রহিয়াছে। তাহাদিগকে ইস্‌লাম হইতে ফিরাইয়া মুরতাদ বানাইবার প্রয়াস পাইতেছে। এখন ধর্মের প্রধান কাজ—তাহাদিগকে যাইয়া বুঝান এবং ওয়ায নছীহতের সাহায্যে ইস্‌লামের বিভিন্নমুখী সৌন্দর্য তাহাদের কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া যাহাতে তাহারা শত্রুদের ধোকা হইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু এই কাজ যেহেতু খাঁটি ধর্মের কাজ, ইহাতে রাজত্ব লাভের কোন আশা নাই। এই কারণে আমাদের বহু ভাই এই কাজকে অনর্থক মনে করিতেছে; বরং অনেকে ক্ষতিকরই বলিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জনাব! এসময়ে ধর্ম প্রচার করা যুক্তি ও মছলেহাত বিরুদ্ধ। আমি বলি, তুমি নিজের মসল্লা অর্থাৎ যুক্তি পিষিয়া ফেল, মসল্লা যত পিষিবে ততই খাদ্য ভাল পাক হইবে। কেমন মসল্লা লইয়া ঘুরিতেছ ? আসল খাদ্য সংগ্রহের প্রতি গুরুত্ব দাও। অনর্থক ও বাজে কাজে লিপ্ত হইও না। এখন ওয়ায নছীহত করিয়া ঐ সমস্ত অজ্ঞ মুসলমানদিগকে ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সমস্ত মুসলমান মিলিয়া মিশিয়া এই কাজে ব্রতী হওয়া কর্তব্য।

॥ এল্‌মের দৌলত ॥

এই কাজ আসলে আলেমদের। কিন্তু আলেমদের অবস্থা এই যে, তাঁহাদের ধন-দৌলত নাই। তাঁহাদের ধন-দৌলতের প্রয়োজনও নাই। হযরত আলী (রাঃ) ইহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন :

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا + لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَالٌ

"আমরা আল্লাহ্ তা'আলার এই বণ্টনে সন্তুষ্ট আছি যে, আমাদিগকে এল্‌ম দেওয়া হউক আর জাহেলদিগকে মাল দেওয়া হউক। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, হযরত আলী (রাঃ) কেমন বণ্টন করিলেন যে, কেবল এল্‌ম লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন? আলেমদের জন্য কিছু মালের ভাগও তো রাখা উচিত ছিল। এই প্রশ্নটি ঠিক সেইরূপ যেমন কোন এক ব্যক্তি আমার ওস্তাদ মারহুমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল (দেওবন্দ দারুল ওলুমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আলিগড় কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা তো সরকারী চাকুরী লাভ করিবে। এই দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়িয়া তালেবে এলমগণ কি করিয়া খাইবে? এই প্রশ্ন শুনিয়া মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোআ করিলেন, যেন দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা-প্রাপ্ত ছেলেদের জীবিকার কোন বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তথা হইতে এল্‌হামের সাহায্যে জওয়াব আসিল, এই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ছাত্র কমপক্ষে মাসিক দশ টাকা হইতে বঞ্চিত থাকিবে না। এই পরিমাণ মাসিক আয় সে অবশ্যই পাইবে। মাওলানা অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নিজের এক মজলিসে এই এল্‌হামের কথা বর্ণনা করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য কমপক্ষে মাসিক দশ টাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব নিয়াছেন। বস্, এখন আর এই মাদ্রাসার ছেলেরা অনাহারে থাকিবে না। ইহা শ্রবণ করিয়া জনৈক মৌলবী ছাহেব বলিয়া উঠিলেন, বাঃ মাওলানা ছাহেব সস্তায়ই রাযী হইয়া গেলেন? এইরূপে হযরত আলীর (রাঃ) কথায়ও কেহ হয়ত এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকিবেন যে, তিনিও সস্তায়ই রাযী হইয়া গেলেন যে, আমাদের জন্য কেবল এল্‌ম আর জাহেলদের জন্য মাল-দৌলত। ইহাতেই আমরা সন্তুষ্ট। বন্ধুগণ! এল্‌মের মূল্য যাহার জানা আছে—সে এই বণ্টনে অবশ্যই রাযী থাকিবে। কেননা, ইহা এমন অমূল্য ধন, যাহার মোকাবেলায় সপ্তখণ্ড বসুন্ধরা কিছুই নহে :

مبیں حقیر گدایان عشق را کیں قوم + شاهان بے کمر و خسروان بے کلاه اند

"এশ্‌কের ভিখারীদিগকে হীন মনে করিও না। কেননা, ইহারা সিংহাসনবিহীন রাজা এবং মুকুটবিহীন রাজ্যপাল।" আমি সত্যই বলিতেছি, এল্‌মের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার খুশী ছাড়াও এমন এক অপূর্ব স্বাদ রহিয়াছে যখন কোন নূতন এলম হাছিল

হয়, তখন এমন অতুলনীয় আনন্দ হয় যাহা রাজ রাজড়াগণের সারা জীবনেও উপভোগ করার ভাগ্য হয় না। এই মর্মেই কবি বলেন :

در سفالیں کاسۂ رندان بخواری منگرید
کاین حریفان خدمت جام جہان بیں کردہ اند

"খোদা-প্রেমে মত্ত ভবঘুরেদের মৃতপাত্রের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাইও না, ইহারা বিশ্বদর্শী পেয়ালার খেদমত করিয়াছেন।" সুতরাং তাঁহাদের হাতে নিকৃষ্ট পেয়ালা দেখিয়া তাঁহাদিগকে হেয় মনে করিও না। যাহা হউক, আলেমদের নিকট এত টাকা পয়সা নাই যে, দুর দুরান্তের পথ সফর করিতে পারেন এবং এত দীর্ঘ কালের জন্য নিজের পরিবার পোষ্যবর্গের খোরপোষের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন।

॥ তাব্‌লীগের উপায় ॥

অতএব, এমতাবস্থায় তাবলীগের উপায় এই যে, দেশের ধনবান মুসলমানগণ সমবেত চেষ্টায় উপযুক্ত পরিমাণ তহবীল সঞ্চয় করিয়া আলেমদিগকে বলিবেন : পাথেয় এবং নিজের পরিবারের খোর-পোষের খরচ গ্রহণ করুন এবং ধর্ম প্রচারের জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করুন। কিন্তু আজকালের অবস্থা তো এইরূপ যে, ধর্মের যে যে কাজ জরূরী তাহাও সমস্ত মৌলবীদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হয়। অধিকন্তু যত দোষ সবই মৌলবীদেরই ঘাড়ে। যেমন আন্‌ওয়ারী বলেন :

ہو بلائے کہ از آسمان آید + گرچہ بر دیگرے قضا باشد
بر زمیں نارسیدہ می پرسد + خانۂ انوری کجا باشد

"আসমান হইতে যে বালা নাযিল হয় তাহা যদিচ অন্য কাহারও জন্য নির্ধারিত হউক। জমিনে না পৌঁছিতেই জিজ্ঞাসা করে, আন্‌ওয়ারীর বাড়ী কোন্‌টা?" আর আমি বলি, বালা আসমান হইতে জমিনে না আসিতেই জিজ্ঞাসা করে خانۂ مولوی کجا باشد "মৌলবীবাড়ী কোন্ খানে?" অর্থাৎ, যত বালা সব মৌলবীর জন্যই। এই তাবলীগ সম্বন্ধেই ব্যাপকভাবে খবরের কাগজে লেখা হয় এবং মুখেও বলা হয় যে, আমাদের ওলামায়ে কেরামের অমনোযোগিতার ফলেই আজ এত মুসলমান 'মুরতাদ' (ধর্মচ্যুত) হইয়া গেল এবং এত মুসলমান শরীয়তের হুকুম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়া গেল। আলেমগণ তাহাদের কোনই খোঁজ খবর লন নাই। যখন তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, 'বাস্তবিক সেই সব মুসলমানদের খবর লওয়া উচিত।' তখন প্রত্যেকেই একথা বলিয়া সরিয়া পড়ে যে, এই কাজ তো মৌলবীদের। আমি বলি, মুসলমানদের সম্বন্ধে বেখবর থাকার দোষ তো আপনারা মৌলবীদের ঘাড়ে চাপাইয়া রাখিলেন। আপনাদেরও কিছু ত্রুটি আছে কি না ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? মৌলবী তো এতটুকুই করিতে পারে যে, তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে পারে।

কিন্তু বলুনত, মৌলবীরা যাইবে কি প্রকারে ? রেলগাড়ীর ভাড়া কোথায় পাইবে এবং যত দিন তাব্‌লীগে নিয়োজিত থাকিবে তত দিন পরিবারের খোর-পোষের খরচ কোথা হইতে দিবে ?

ইহার উপায় শুধু ইহাই হইতে পারে যে, আপনারা টাকা দিন তাঁহারা সফর করুন। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে যে, সফরও করিবে তাঁহারাই, বোঝাও বহন করিবে তাহারাই ? পরিবারের লোকদিগকেও অনাহারে মারিবে তাহারাই। দুঃখের বিষয়, আজকাল সর্বসাধারণ এবং নেতৃস্থানীয় লোকগণ মন্তব্য করা ছাড়া আর কিছুই করেন না। কোথাও কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহারা এতটুকু বলিয়া সরিয়া পড়েন যে, আলেমদের এরূপ করা উচিত, এরূপ করা উচিত। আর যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আলেমগণ ইহা কেমন করিয়া করিবে ? ইহার জন্য টাকার প্রয়োজন। তখন সকলেই নীরব হইয়া যায়।

বন্ধুগণ! কাজের নিয়ম এই—প্রথম চাঁদা দ্বারা ফণ্ড সংগ্রহ করিয়া পরে মৌলবীদিগকে বলুন, তাব্‌লীগের জন্য আমাদের কাছে এত টাকা সঞ্চিত আছে। আপনারা আমাদিগকে কোন মুবাল্লেগ দিন। তখন যদি তাঁহারা কোন মুবাল্লেগ না দেন, তবে অবশ্যই তাঁহাদের ত্রুটি।

॥ চাঁদা এবং আলেম সমাজ ॥

কিন্তু ইহা সম্ভব নহে যে, মৌলবীরা কাজও করিবেন এবং তাঁহারাই টাকার ব্যবস্থা করিবেন। আলেমদের তো কোন কাজের জন্য চাঁদা উসুল করা উচিতও নহে। হে আলেম সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমরা চাঁদা সংগ্রহ করা ছাড়িয়া দাও। তোমাদের মুখে চাঁদা শব্দই শোভা পায় না। তোমাদের মুখে শুধু এতটুকু কথা সুন্দর শুনায় :

لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ط وَلَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

"আমি এই তাব্‌লীগের জন্য তোমাদের নিকট টাকা-পয়সা চাই না এবং ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিকও চাই না। আমার পারিশ্রমিকের দায়িত্ব একমাত্র বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে।"

এই চাঁদার কারণেই মানুষ আজকাল ওলামা হইতে পালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাদের ছুরত দেখিয়াও ইহারা ভয় পায়।

যেমন জনৈক সাব্‌জজ কোন এক নূতন স্থানে বদলী হইয়া গেলেন। তিনি আলেমানা পোশাক পরিধান করিতেন। সৌহৃদ্যের খাতিরে তিনি স্থানীয় কোন

রয়ীস লোকের সহিত দেখা করিতে গেলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে দেখিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে চাকর যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, "সাব্‌জজ সাহেব আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" তখন তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন: "মাফ করুন, আপনার পোশাক দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম কোন মৌলবী ছাহেব চাঁদা চাহিতে আসিয়াছেন।"

বাস্তবিকই আজকাল কোন মৌলবী কোন রয়ীস লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই তিনি মনে করেন যে, সম্ভবতঃ চাঁদা চাহিবার জন্য আসিয়াছে। এই কারণেই আমি বলি, আলেমগণ এ কাজ কখনও করিবেন না; বরং নেতৃস্থানীয় ও জনসাধারণ চাঁদা সংগ্রহ করুন। তদ্দ্বারা মৌলবীদের ধর্মীয় কাজ করাইয়া লউন।

কিন্তু আজকাল মৌলবীদের অবস্থা ডোমের হাতীর মত হইতেছে। আকবর বাদশাহ্ জনৈক ডোমকে একটি হাতী পুরস্কার দিয়াছিলেন। ডোম ঘাব্‌ড়াইয়া গেল, হাতীর খোরাক সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? অবশেষে এক দিন ডোম জানিতে পারিল যে, আকবর বাদশাহ এখনই বাহনে করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেছেন। ইহা শুনিয়া সে কি করিল? হাতীর গলায় ঢোল বাঁধিয়া রাস্তায় ছাড়িয়া দিল। আকবর দেখিলেন, শাহী-হাতী গলায় ঢোল লইয়া রাস্তায় ঘুরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন: "ব্যাপার কি?" ডোমকে ডাকিয়া বলিলেন: "তুমি এই হাতীর গলায় ঢোল ঝুলাইয়াছ কেন?" সে বলিল: "হুযূর! আপনি আমাকে হাতী দান করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমি উহাকে খাওয়ার দেই কোথা হইতে? কাজেই আমি হাতীকে বলিলাম, ভাই! আমি তো গান-বাজনা করিয়া পেট পালিতেছি, তুমিও গলায় ঢোল ঝুলাইয়া গান-বাজনা করিয়া নিজের পেট পালিতে থাক।" আকবর হাসিয়া উঠিলেন এবং ডোমকে হাতীর ভরণ-পোষণের জন্য কিছু দান করিলেন।

আজকাল মৌলবীদেরও এই অবস্থা। মানুষ তাহাদের গলায় ঢোল বাঁধিয়া দিয়াছে। যাও, গাও-বাজাও এবং টাকা সঞ্চয় করিয়া নিজেই সব কাজ কর। স্মরণ রাখিবেন, একই দল দ্বারা দুই কাজ হইতে পারে না। কাজের নিয়ম ইহাই যে, টাকা আপনারা জোগাড় করুন, আর মৌলবীদের হইতে শুধু দ্বীনের কাজ লউন; বরং টাকা সংগ্রহ করিয়া নিজের কাছেই রাখিয়া দিন। আমাদের হাতে টাকা দিবেনও না। কেননা, আজকাল অনেক লোক এমনও আছে যাহারা প্রকৃত পক্ষে মৌলবী নয়, কিন্তু মৌলবীদের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তাহারা মুসলমানদের চাঁদার টাকায় অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মৌলবী সম্প্রদায়ের দুর্নাম করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমার মত এই যে, নেতৃস্থানীয় লোকগণ চাঁদা তুলিয়া নিজের কাছেই রাখিবেন, মৌলবীদের হাতে দিবেন না। কেননা, তাহাতে আলেম সমাজের উপর দোষ আসে। আপনারা কি ইহা পছন্দ করেন যে, আপনাদের আলেম সমাজ বদনামগ্রস্ত হউন।

কখনই না। আপনাদের উচিত আলেমগণ চাঁদা উস্‌ূল করিতে চাহিলেও আপনারা তাঁহাদিগকে বারণ করিবেন এবং বলিবেন, এই কাজ আপনাদের জন্য সঙ্গত নহে। এই কাজ আমরা নিজেরাই করিব।

বরং সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা এই যে, এক এক জন রয়ীস লোক এক এক জন প্রচারকের ভাতার দায়িত্ব গ্রহণ করুন। ইহাতে কোন ঝামেলার প্রয়োজন হইবে না। এক জনে যদি এক জন প্রচারকের ভাতা দিতে সক্ষম না হন, তবে দুই চারি জন মিলিত হইয়া একজন প্রচারক নিযুক্ত করুন এবং তাঁহার হিসাব নিজেদের কাছে রাখুন। ইহা তো হইল টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা।

॥ তাব্‌লীগের নিয়ম ॥

এখন রহিল তাব্‌লীগের নিয়ম ও পন্থা। ইহা আলেমদের মতানুযায়ী হওয়া উচিত। আপনারা টাকা সংগ্রহ করিয়া আলেমদের নিকট পন্থা ও নিয়ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন এবং প্রচারকও তাহাদের মতানুযায়ীই নিযুক্ত করুন। ইহার জন্য একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করুন। আলেমগণ ইহাতে পরামর্শ ও মত প্রদানে অসম্মত হইবেন না। আমি আলেম সমাজকেও বলিতেছি, তাঁহারা যেন ইহাতে অসম্মত না হন। অতঃপর এইরূপে কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। ইন্‌শাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই কৃতকার্য হইতে পারিবেন। অবশ্য প্রথম প্রথম সাধারণ অসুবিধারও সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু অসুবিধা দেখিয়া ঘাব্‌ড়াইবেন না। পদব্রজে ভ্রমণের দরকার নাই ; যানবাহনেই ভ্রমণ করুন। রেলের পথ থাকিলে রেল গাড়ীতেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবেন, অন্যথায় গরুর গাড়ী বা অন্য প্রকার গাড়ীতে যাইবেন। ফিটন বা মোটর গাড়ীর প্রয়োজন নাই। লেমোনেড বা বরফ শরবতেরও দরকার নাই। ধর্ম প্রচারকের পক্ষে এ সমস্ত অনাবশ্যক বিষয়ে জাতীয় টাকা-পয়সা ব্যয় করা উচিত নহে। আপনাদের নীতি এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ঃ

اے دل آں بہ کہ خراب از مئے گلگوں باشی × بے زر و گنج بصد حشمت قارون باشی

در رہ منزل لیلے خطر ہاست بجاں × شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

"হে মন ! ইহাই উত্তম—এশ্‌কে এলাহীর মধ্যে নিজকে বিলাইয়া দাও। ধন ও ধন-ভাণ্ডার ছাড়াই কারূনের অর্থাৎ দুনিয়াদারের চেয়ে শতগুণ জাঁকজমকের অধিকারী হও। লায়লী অর্থাৎ মাহ্‌বুবে হাকীকীর রাস্তায় জানের বিপদ আছে শত শত। এই পথে পা রাখিবার প্রথম শর্ত এই যে, মজনু ঁহও।" মাহ্‌বুবে হাকীকীর সন্তোষ লাভের জন্য আপনার উচিত এশক ও মহব্বতের সহিত কাজ করা। আশেকরা কি কখনও ফিটন্ কিংবা মোটর গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে ? মাহ্‌বুবের খুশীর জন্য তাহাদের নিকট তো কঠিন কঠিন বিপদজনক কাজও খুব সহজ হইয়া যায়। ইহা হইল কাজের নিয়ম।

কিন্তু যে কাজ আরম্ভ করিবেন স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার সহিত হওয়া উচিত। সুতরাং সকলেই ওয়ায়েয এবং মুবাল্লেগ সাজিবেন না। কেননা, ওয়ায়েয হওয়ার মূল উৎস তা'লীম ও শিক্ষা এবং আরবী মাদ্রাসাগুলিই। যদি সকলে ওয়ায়েযই সাজিয়া বসেন এবং মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে বর্তমানের সমস্ত ওয়ায়েযীন যখন মরিয়া যাইবেন, তখন ভবিষ্যতের জন্য ওয়ায়েয কোথা হইতে আসিবে? আজকাল মুসলমানদের মধ্যে ইহাও একটি রোগ। যে কাজ আরম্ভ করা হয় সকলেই সে কাজে লাগিয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা নিষেধ করিয়াছেন। যেমন, একবার জেহাদে যোগ দানের জন্য সকলেই যাত্রা করিল। তখন সে সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হইল।

وما كان المؤمنون لينفروا كافة ط فلولا نفر من كل فرقة منهم

طائفة ليتفقهوا في الدين -

"মুসলমানদের সকলেই এক সঙ্গে জেহাদে যোগদানের উদ্দেশ্যে গমন করা উচিত ছিল না। তাহাদের প্রত্যেক বড় দল হইতে একটি ক্ষুদ্র দল দ্বীনের মাস্‌আলা মাসায়েল শিখিবার জন্যও থাকা উচিত ছিল।"

বন্ধুগণ! ইহাই মধ্যমপন্থী শরীয়ত। প্রত্যেক কাজের জন্য একদল নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। সকলে এক সঙ্গে একই কাজে লাগা উচিত নহে। মোট কথা, এক দল তা'লীম ও শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত হইবে আর একদল ওয়াজ ও ধর্ম প্রচারের কাজে মশ্‌গুল হইবে। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে তাওয়াক্কুল সম্ভব হয়, তবে কাহারও অপেক্ষা করিও না। খোদার উপর নির্ভর করিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়, ইন্‌শা-আল্লাহ্! তিনিই তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন সমাধা করিয়া দিবেন, আর যদি তাওয়াক্কুল সম্ভব না হয়, তবে নিজের জীবিকা উপার্জনের কাজে লিপ্ত হইয়া ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সম্ভব তাব্‌লীগের কাজ কর। যেমন, নিজের মহল্লায় ওয়ায নছীহত কর এবং সময় সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামেও যাইয়া ওয়ায নছীহত কর। আলেম সমাজ আজকাল এই কাজ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা ছিল আম্বিয়াই কেরামের কাজ। আলেমগণ ওয়ায করা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া আজকাল বেশীর ভাগ জাহেলকেই ওয়ায করিতে দেখা যায়। আর প্রকৃত আলেম ওয়ায়েযের সংখ্যা খুব কম। অতএব, তাঁহারা নিজের আসল উদ্দেশ্য ছাড়িয়া যে বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছেন তাহাও পূর্ণরূপে সমাধা করেন না। এই কাজের এক শাখা গ্রহণ করিয়াছেন আর এক শাখা ত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠ্য কিতাব পড়াইতেছেন এবং দ্বিতীয় শাখা সর্বসাধারণকে তা'লীম দেওয়ার কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বন্ধুগণ! আলেম সমাজ সর্বসাধারণকে

তা'লীম না দিলে কি জাহেলরা তা'লীম দিবে? জাহেলরা এই কাজ করিলে সেইরূপই হইবে যেমন হাদীসে আসিয়াছে।

اِتَّخَذُوْا رُءُوْسًا جُهَّالًا فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا

"জাহেলদিগকে তাহারা মান্য ও বরেণ্য করিয়া লইয়াছে, সুতরাং ইহারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করিয়াছে।" কেননা, জাহেলরা পথ প্রদর্শক ও নেতা হইলে লোকে তাহাদেরই নিকট 'ফতুয়া' চাহিবে, তাহাতে এই জাহেল লোকেরাও গোম্‌রাহ্‌ হইবে এবং অপরকেও গোম্‌রাহ্‌ করিবে। এই কারণেই আলেম সমাজের কর্তব্য—মাদ্রাসায় তা'লীম দেওয়ার ন্যায় সর্বসাধারণকে ওয়ায নছীহত করা এবং তাবলীগের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। এই অপেক্ষায় থাকিবেন না যে, আমাদের ওয়াযে ফল হইবে কি না। কেহ শুনে কি না, শ্রোতা দুই একজন না অনেক বেশী।

মাওলানা ইস্‌মাঈল শহীদের (রঃ) ঘটনাঃ একবার তিনি মসজিদে ওয়ায করিলেন। ওয়ায শেষে এক ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া আক্ষেপের সহিত বলিলঃ 'হায় আফ্‌সুস্‌। আমি অনেক দুর হইতে আপনার ওয়ায শুনিতে আসিয়াছিলাম, আর আপনার ওয়ায শেষ হইয়া গেল।' মাওলানা শহীদ (রঃ) বলিলেনঃ 'ভাই, তুমি আফসুস করিও না, আস আমি সম্পূর্ণ ওয়ায তোমাকে পুনরায় শুনাইয়া দিব।' এই বলিয়া তিনি পুর্ণ ওয়ায তাহার সম্মুখে পুনরায় বর্ণনা করিলেন। বন্ধুগণ! খাঁটি নিয়ত থাকিলে এদিকে লক্ষ্য থাকে না যে, শ্রোতা কয়জন। একজন শ্রোতা থাকিলেও গনিমত মনে করিবে।

হযরত মাওলানা আবদুল হাই (রঃ) ছাহেব যিনি ছিলেন হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলবী ছাহেবের অন্যতম খলীফা। সৈয়দ ছাহেব তাঁহাকে ওয়ায করিতে আদেশ করিলেন। তিনি নিবেদন করিলেন, শ্রোতা কোথায়? সৈয়দ ছাহেব বলিলেনঃ 'তুমি দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াও। শ্রোতৃবর্গের দিকে দৃষ্টিই করিও না যাহাতে তুমি বুঝিতেই না পার যে, শ্রোতা আছে কি না'। প্রথম প্রথম তিনি এই প্রকারে ওয়ায করিতে থাকিলেন। পরে অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, দুরদুরান্ত হইতে তাঁহার ওয়ায শুনিবার আগ্রহে এত অধিক সংখ্যক লোক আসিত যে, সভাস্থলে স্থান পাইত না। অতএব, শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অধিক বা কম হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না, কাজ শুরু করিয়া দিন তারপর ফলও হইতে থাকিবে, ইহাতে সেই এলমের পূর্ণতা সাধনের পন্থা যাহা পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

আসল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য তো সেই এলমই বটে যাহা অর্জিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে খোদাভীতি উৎপন্ন হয়। এই এল্‌ম অর্জন করাও প্রত্যেক মানুষের

জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু স্বভাবতঃ পীরের সংসর্গ লাভ ব্যতীত এই এল্‌ম হাছিল হয় না। এই এলম অর্জনের জন্য কিছুকাল নিজের যুক্তি বিবেক পরিহার পূর্বক পীরের জুতা সোজা করিয়া দেওয়া অর্থাৎ নিজকে সম্পূর্ণরূপে পীরের কাছে সমর্পণ করা শর্ত। কবি এই মর্মেই বলেন :

از قال وقیل مدرسه حالے دلم گرفت + یک چند نیز خدمت معشوق می کنم

"মাদ্রাসায় প্রশ্নোত্তর আলোচনা করিতে করিতে এখন আমার মন বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিছুদিন কামেল পীরের খেদমত করিতেছি।"

قال را بگزار و مرد حال شو + پیش مرد کاملے پا مال شو

"অর্থাৎ, তর্ক ছাড়িয়া নিজের মধ্যে হাল পয়দা কর, ইহা তখনই পয়দা হইবে যখন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের পায়ে যাইয়া পড়িয়া থাকিবে।" কিন্তু ইহার কিছু বিশেষ তরতীব আছে। তাহা প্রত্যেক লোকের জন্য পৃথক পৃথক। উহা আমি এই মজলিসে বর্ণনা করিতে পারি না। ইহা পীরের সংসর্গের উপর রাখিয়া দাও। যখন তুমি কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন তিনি নিজেই সেই 'তরতীব' বলিয়া দিবেন।

॥ একটি জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন ॥

এখন আমি একটি তালেবে এল্‌ম সুলভ প্রশ্নের জবাব দিতেছি। এই জবাবটি দশ বার দিন পূর্বে মনে উদয় হইয়াছে। ইতিপূর্বে এদিকে খেয়াল যায় নাই। প্রশ্নটির সারমর্ম এই যে, আমি তো এযাবৎ খোদাভীতিকে এল্‌মের অপরিহার্য অংশ বলিয়া-ছিলাম। এল্‌ম যখন হাছিল হইবে, তখন খোদাভীতি অবশ্যই হইবে এবং খোদাভীতি না হওয়া এলম না থাকার দলিল। কেননা, দুইটি বস্তুর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকিলে একটির অভাবে অপরটির অভাব অবশ্যম্ভাবী হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের শব্দ সমষ্টি হইতে তাহা বুঝা যায় না। কেননা, اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে আলেমগণই ভয় করে।" اِنَّمَا শব্দটি নির্দিষ্টবোধক, তাহাতে অর্থ এই দাঁড়ায়—খোদাভীতি আলেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ জাহেলদের মনে খোদাভীতি হয় না। কেননা, বালাগাৎ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী এখানে বিশেষণকে বিশেষ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন, اِنَّمَا يَقُوْمُ زَيْدٌ বাক্যে দণ্ডায়মান বিশেষণটি যায়েদের জন্য এবং اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ আয়াতে উপদেশ গ্রহণ বুদ্ধিমানদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যায়েদ

কিন্ন আমর, বকর, প্রভৃতি কেহই দণ্ডায়মান নাই। আর নির্বোধ লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে না। এইরূপে এখানে খোদাভীতিকে আলেমদের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং এল্‌মবিহীন লোকের মধ্যে খোদাভীতি নাই বলা হইয়াছে।

ইহার সারমর্ম এই যে, এল্‌ম ভিন্ন খোদাভীতি হয় না। অর্থাৎ, খোদাভীতির জন্য এল্‌ম শর্ত। এল্‌ম খোদাভীতির কারণ নহে। শর্ত পাওয়া গেলে 'মাশ্‌রূত' অর্থাৎ যাহার জন্য শর্ত তাহার অস্তিত্ব জরূরী নহে। তবে শর্ত না পাওয়া গেলে যাহার কারণ তাহার অস্তিত্ব অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কারণের অভাবে যাহার কারণ তাহার অস্তিত্ব না থাকা জরূরী নহে। অন্য কোন কারণে উহার অস্তিত্ব হইতে পারে। কেননা, একটি কাজের বিভিন্ন কারণ হইতে পারে। অতএব, অর্থ এই দাঁড়ায়—যেখানে খোদাভীতি আছে সেখানে এল্‌ম অবশ্যম্ভাবী কিন্তু ইহা অনিবার্য নহে যে, যেখানে এল্‌ম হইবে সেখানে খোদাভীতি অবশ্যই হইবে। অতএব, আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হইল না যে, এল্‌ম হইলে খোদাভীতিও অবশ্যই হইবে ; বরং ইহা প্রমাণিত হইল যে, খোদাভীতি হইলে এল্‌ম নিশ্চয় থাকিতে হইবে। কেননা, মাশ্‌রূতের অস্তিত্ব হইলে শর্তের অস্তিত্ব তৎপূর্বে অবশ্যই হইতে হইবে। অথচ এই আয়াত দ্বারা এলেমের ফযীলত এইরূপে প্রমাণ করা হয় যে, 'এল্‌ম দ্বারা খোদাভীতি উৎপন্ন হয় বলিয়া এল্‌ম শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।" এখন আবার উহার বিপরীত ব্যাখ্যা করা হইল "এল্‌ম ভিন্ন খোদাভীতি উৎপন্ন হয় না বলিয়া এলম শিক্ষা করা জরূরী।" সুতরাং যে ব্যাখ্যা দ্বারা এলেমের ফযীলত প্রমাণ করা হয় তাহা ঠিক রহিল না।

এই প্রশ্নটি দীর্ঘ দিন ধরিয়া মনে বিরাজমান ছিল, কিন্তু মাত্র দশ বার দিন পূর্বে ইহার উত্তর মনে উদিত হইয়াছে। জানি না এই প্রশ্নটি এতদিন ধরিয়া মনের মধ্যে কেন রহিল ? হয়ত জবাবের দিকে লক্ষ্য হয় নাই কিংবা সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক এখন জবাব মনে উদিত হইয়াছে।

উহার সারমর্ম এই, আরবের প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী কোরআন নাযিল হইয়াছে। তর্ক-বিজ্ঞানের বিধান অনুযায়ী নাযিল হয় নাই। ইহার অর্থ এই নহে যে, কোরআন শরীফের তর্কবিজ্ঞান সুলভ বাক্য আদৌ নাই, কখনই নহে। কেননা, বিজ্ঞানের বাক্যগুলির সহিত কোরআনের বাক্যগুলির কোন বিরোধ নাই ; বরং অর্থ এই যে, কোরআন কোন বাক্য দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝাইবার জন্য আরবের প্রচলিত ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। তর্ক-বিজ্ঞানের পরিভাষার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। অতএব, কোন বাক্য তর্কবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে কোন বিশেষ অর্থ বুঝাইতে পারে এবং প্রচলিত ভাষানুসারে অন্য অর্থ বুঝাইতে পারে। এমতাবস্থায় প্রচলিত ভাষানুরূপ অর্থ উদ্দেশ্য হইবে এবং তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুরূপ অর্থ হইবে না। সুতরাং

আয়াতের প্রতি যে প্রশ্নটি উত্থিত হইতেছে তাহা প্রচলিত আরবী অনুযায়ী নহে, তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুরূপ হইতেছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যদিও বাহ্যতঃ এই আয়াত দ্বারা তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে বুঝা যায় যে, খোদাভীতির জন্য এল্‌ম্ জরূরী, এল্‌মের জন্য খোদাভীতি জরূরী নহে ; কিন্তু প্রচলিত ভাষার নিয়মে এই উপায়ে ইহাও প্রকাশ পায় যে, এলম হইলে খোদাভীতি অনিবার্য হয়। আর একটি আয়াতে ইহার নযীর দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا *

"সৎব্যবহার দ্বারা অসদ্ব্যবহারের প্রতিরোধ কর। অতঃপর যাহার সহিত তোমার শত্রুতা ছিল একেবারেই তোমার অকপট বন্ধু হইয়া যাইবে। আর ইহা ঐ সমস্ত লোকই লাভ করিতে পারে যাহারা ধৈর্যশীল।" অর্থাৎ দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করিতে পারে একমাত্র ধৈর্যশীল লোকেরা। এখানেও সেই সংযোজন যাহা اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ, "আলেমরাই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে।" আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। কেননা نفى এর পরে حرف استثناء আসিলে তাহা নির্দিষ্টতার অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু আয়াতের অর্থে সকলেই একথা মনে করে যে, এই গুণটির মধ্যে ছবরের এক বিশেষ অধিকার আছে এবং ছবরের কারণেই এই গুণটি হাছিল হইয়া থাকে। অন্যথায় তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে অর্থ এই হয় যে, ছবর ব্যতীত এই গুণ লাভ করা যায় না। যেন এই গুণ লাভ করার জন্য ছবর শর্ত এবং শর্তের অস্তিত্বের দ্বারা মাশ্‌রূতের (যাহার জন্য শর্ত) অস্তিত্ব অবধারিত ও অনিবার্য হয় না। অতএব, একথা জরূরী নহে যে, যাহার মধ্যে ছবর আছে তাহার মধ্যে এই গুণটিও থাকিবে। অতএব, প্রমাণিত হইল না যে, ছবর থাকিলে এই গুণটি হাছিল হইবেই। কিন্তু প্রচলিত ভাষার নিয়মানুযায়ী এই আয়াতে একথাই বুঝা যাইতেছে যে, এই গুণটির মধ্যে ছবরের এক বিশেষ অধিকার আছে। যেমন আমাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় আমরা বলিয়া থাকি, মিঞা ওযূ সে-ই করিবে যে নামায পড়িবে। ইহাতে প্রত্যেকে বুঝে যে, নামায পড়ার মধ্যে ওযুর খাছ সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যদি নামায না পড়িত, তবে ওযূই কেন করিবে। অতএব, বুঝা যায়, সে নামায পড়িবে। অথচ ওযূ নামাযের জন্য শর্ত, কারণ নহে। সুতরাং প্রচলিত ভাষার নিয়ম এবং তর্ক-বিজ্ঞানের নিয়মের পার্থক্য বুঝিয়া লওয়ার পর এখন একথা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এই আয়াত দ্বারা ইহাও বলা হইয়াছে যে, এল্‌মের জন্য খোদাভীতি অনিবার্য। সুতরাং খোদাভীতির অভাবে

এল্‌মের অস্তিত্বও লোপ পাইতেছে। এখন সারকথা এই যে, যেখানে খোদাভীতি নাই সেখানে এল্‌মও নাই।

এখন আর একটি কথা বলিতেছি, প্রশ্নের জবাব তো হইয়া গেল, যাহার অন্তরে এই প্রশ্নটি আপনাআপনি উদয় হয় নাই তিনি নিজের বোধ শক্তিকে ইহা বুঝিবার জন্য কষ্ট দিবেন না। যাহাদের মনে এই প্রশ্নটির উদয় হইয়াছে, কেবল তাহাদের জন্যই আমি জবাবটি বর্ণনা করিয়াছি। ইহা বর্ণনা করার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল আলেমদের সংশোধন করা। তাঁহারা যেন এই আয়াতে এলমকে খোদাভীতির জন্য শর্ত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত না থাকেন এবং এরূপ না ভাবেন যে, এলমের জন্য খোদাভীতি অনিবার্য নহে। অতএব, এল্‌ম খোদাভীতি ছাড়াও হইতে পারে। কাজেই আমাদের মধ্যে যদিও খোদাভীতি নাই তথাপি আমরা আলেম এবং এলমের ফযীলত আমরা লাভ করিয়াছি ; বরং তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, কোরআন শরীফ প্রচলিত ভাষার নিয়মানুযায়ী নাযিল হইয়াছে এবং আরবী ভাষার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই আয়াতে এল্‌মের অস্তিত্বের জন্য খোদাভীতির অস্তিত্ব থাকা অনিবার্য বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। কাজেই খোদাভীতি না থাকিলে কাম্য এল্‌মও নাই বুঝিতে হইবে।

এখন বাকী রহিল জাহেলদের কথা। তাহারা ভাষার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আয়াতের অর্থ ইহাই বুঝে যে, এল্‌লের জন্য খোদাভীতি অনিবার্য, অর্থাৎ আলেম লোক খোদাকে ভয় করিবেই। আবার তাহারা দেখিতে পায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এল্‌ম আছে কিন্তু খোদাভীতি নাই। তখন কোরআনের উপর তাহাদের সন্দেহ হয় যে, কোরআনের এই বিধানটি ঠিক নহে। ইহার একটি জবাব ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে যে, এখানে আয়াতে এল্‌ম বলিতে পূর্ণাঙ্গ এল্‌ম উদ্দেশ্য যাহা অন্তরে স্থান করিয়া লয়। শুধু শাব্দিক এল্‌ম নহে, কেননা, উহা মূল উদ্দেশ্য নহে।

॥ এল্‌মের প্রকার ॥

দ্বিতীয় আরও একটি উত্তর আছে। তাহা বড়ই কাজের কথা। বিশেষ করিয়া তরীকত-পন্থীদের জন্য। তাহা এই যে, এলম দুই প্রকার। এতদুভয় প্রকারের এলমই খোদাভীতির মধ্যে প্রযোজ্য। এক প্রকারের এল্‌ম 'আক্‌লী' আর এক প্রকারের এল্‌ম 'হালী'। আক্‌লীকে কখন কখন এ'তেকাদীও বলা হয়। আর হালীকে স্বভাবগত এল্‌ম বলা হয়। যেখানে এলম এ'তেকাদী, সেখানে খোদাভীতিও এ'তে-কাদী। (অর্থাৎ, যদি বিশ্বাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিয়া আমলে উহার নিদর্শন প্রকাশ না পায়, তবে খোদাভীতিও বিশ্বাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কাজে উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যাইবে না) আর যেখানে এল্‌ম হালী ; সেখানে খোদাভীতিও হালী। ইহাই কবি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, علم گر بر دل زنی یارے شود

"এল্‌ম যদি অন্তরের মধ্যে ক্রিয়া বিস্তার করে, তবে তাহা সহায়ক হইয়া থাকে।" এখন এমন কেহই রহিল না যাহার মধ্যে এল্‌ম আছে কিন্তু খোদাভীতি নাই। যাহাকে আলেম মনে করিয়া খোদাভীতি হইতে শূন্য দেখা যায়, তাহার মধ্যে হা-লী খোদাভীতি (স্বভাবগত ভয়) নাই। বিশ্বাস সংক্রান্ত খোদাভীতি হইতে সেও শূন্য নহে। অতএব, যেমন তাহার এল্‌ম এ'তেকাদ বা বিশ্বাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ তাহার খোদাভীতিও তদ্রূপ বিশ্বাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইহাতে এই সন্দেহেরও অবসান ঘটিল যে, এই আয়াতে খোদাভীতিকে আলেমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। অথচ অনেক জাহেলের মধ্যেও বেশ খোদাভীতি রহিয়াছে। উত্তর পরিষ্কার। অর্থাৎ, যাহাদিগকে জাহেল মনে করা হইতেছে বিশ্বাস সংক্রান্ত এল্‌ম হইতে তাহারাও খালি নহে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল প্রতাপশালী হওয়া, মহা শক্তিমান ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী হওয়ার বিশ্বাস তাহাদেরও আছে। ইহাকেই এল্‌মে এ'তেকাদী বলে। তবে সে এল্‌ম হইতে শূন্য হইল কেমন করিয়া ?

এখন বিশ্বাসগত খোদাভীতির অর্থ বুঝিয়া লউন। মন্দের সম্ভাবনা এবং আযাবের সম্ভাবনায় বিশ্বাস থাকাকেই এ'তেকাদী ভয় বলা হয়। অতএব, এমন কোন্ মুসলমান আছে. যে নিজের সম্বন্ধে এরূপ ভয় না রাখে যে, হয়ত আমার আযাব হইতে পারে, মূল ঈমানের জন্য অবশ্য এতটুকু ভয়ই যথেষ্ট। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ঈমানের জন্য এতটুকু ভয় যথেষ্ট নহে ; বরং ইহার জন্য হা-লী খোদাভীতি (স্বভাবগত ভয়) থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, অবস্থায়ও খোদাভীতির নিদর্শন থাকিতে হইবে। ইহার ফলে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও প্রতাপ অন্তরে বিরাজমান থাকে। জাহান্নামের আযাব প্রতি মুহূর্তে চোখের সম্মুখে হাযির থাকে। এই পূর্ণ মাত্রার খোদাভীতি সম্বন্ধেই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন : لَا يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ "যেনাকারী যখন যেনা করে তখন মুমেন অবস্থায় সে যেনা করে না।" অর্থাৎ, যেনা করার অবস্থায় যেনাকারীর ঈমান থাকে না। এখানে শুধু বিশ্বাস সংক্রান্ত ঈমান উদ্দেশ্য নহে যাহাতে খোদাভীতি কেবল বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ ; বরং এখানে পূর্ণাঙ্গ ঈমান উদ্দেশ্য, যাহার সহিত খোদাভীতি সমস্ত অবস্থায় ও কাজে প্রকাশ পায়। ইহাতে ইস্‌লাম বিরোধী শত্রুদের প্রশ্নের জবাবও হইয়া গেল। তাহারা বলে, হাদীসটির দ্বারা তো বুঝা যায় যে, মুমেন লোক যেনা করিতে পারে না অথচ আমরা বহু মুসলমান যেনাকার দেখিয়াছি। ইহার উত্তর এই যে, এখানে সেই মুমেন উদ্দেশ্য নহে যাহাদের ঈমান শুধু বিশ্বাস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ : বরং মুমেনে হা-লী উদ্দেশ্য (যাহার মধ্যে ঈমান অবস্থা এবং কাজেও প্রকাশ পায়)

ফলকথা, এই আয়াতে আলেমদেরও সংশোধন করা হইল, সাধারণ লোকদেরও সংশোধন করা হইল এবং আমার বর্ণনায় তরীকত পন্থীদের কতিপয় সন্দেহের নিরসন

হইয়া গেল আর ইসলামের শত্রুদের সন্দেহেরও উত্তর হইয়া গেল। সারকথা এই যে, কোরআনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের অর্থ—এল্ম থাকিলে খোদাভীতি অনিবার্য। আর শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে এই অর্থ হয়—খোদাভীতি থাকিলে এল্ম অনিবার্য, যেন উভয় দিক হইতে পরস্পর অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

যদি কাহারও এল্‌ম থাকে, তবে ইন্‌শাআল্লাহ্ খোদাভীতি উৎপন্ন হইয়া যাইবে। আর কাহারও মধ্যে খোদাভীতি থাকিলে উহা তাহাকে এল্‌মের প্রতি আকৃষ্ট করিবে। অতএব, এই পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এইরূপ হইল, যেমন কোন কবি বলিয়াছেন :

بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف + گر بکشد زہے طرب ور بکشم زہے شرف

"অদৃষ্ট ভাল হইলে তাহার আঁচল হাতে আসিয়া যাইবে। অতঃপর সে টানিয়া নিলেও উদ্দেশ্য সফল হইবে, আমি টানিয়া লইলেও উদ্দেশ্য সফল হইবে; সুতরাং উভয় অবস্থাতেই উদ্দেশ্য সফল হইবে।" খোদা তা'আলার ইচ্ছা, তিনি এল্ম আগে দান করিতে পারেন এবং তাঁহার ভয় পরে দান করিতে পারেন, কিংবা ইহার বিপরীতও করিতে পারেন। এখানে একটি হাকীকত (গূঢ় বিষয়) এমন আছে যে, উহার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় বস্তু এক সঙ্গেও করিয়া দিতে পারেন। কেননা, দুইটি বস্তু অস্তিত্বের দিক দিয়া অগ্রবর্তী ও পরবর্তী তখনই হয় যখন ইহাদের একটির কারণে অপরটি অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। এমনও কোন সময় হইয়া থাকে যে, কোন এক তৃতীয় বস্তুর কারণে উভয় বস্তুর অস্তিত্ব হয়। তখন উভয় বস্তুই এক সঙ্গে অস্তিত্বে আসিবে। অগ্রবর্তী এবং পরবর্তী থাকে না। এখানেও একটি তৃতীয় বস্তু এইরূপ আছে যাহা এল্‌ম এবং খোদাভীতি উভয়েরই কারণ হইতে পারে। তাহা কি? আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের জোশ্ এবং আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী। যদি তাঁহার রহমতের জোশ্ এদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তদবস্থায় এল্ম এবং খোদাভীতি এক সঙ্গে পাওয়া যাইবে। অতএব, এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন অনুগ্রহ পূর্বক উভয় বস্তু এক সঙ্গে দান করেন। বস্ এখন শেষ করিতেছি।

॥ খোদাভীতির প্রয়োজনীয়তা ॥

আয়াতের শুধু একটি অংশ বাকী রহিয়াছে। উহা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত কথা বলিয়া দিতেছি যে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল প্রতাপশালী খুব ক্ষমাকারী।"

ইতিপূর্বে এল্‌মের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, বলিয়াছেন যে, আলেমগণ আল্লাহ্‌কে ভয় করেন। এখন এই বাক্যে ভয় করার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিতেছেন। বলিতেছেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল প্রতাপশালী। ইহাতে ভয় প্রদর্শন করা হইল। অতঃপর ভয় করার ফল

বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি খুবই ক্ষমাশীল। তাঁহাকে যাহারা ভয় করে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। ইহাতে বলিয়া দিয়াছেন যে, খোদাভীতির প্রয়োজনীয়তা এই জন্যও আছে যে, তদ্দ্বারা ক্ষমা পাওয়া যায়। ইহাতে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। অথবা অন্য কথায় বলুন, عزيز শব্দে দেখাইয়াছেন যে, তিনি ক্ষতিও করিতে পারেন। আর غفور শব্দে বলিয়াছেন : তিনি হিতও সাধন করিতে পারেন। এই দুইটি বস্তু দ্বারা খোদাভীতির প্রয়োজনীয়তা এইরূপে প্রদান করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা এই কারণেও প্রয়োজন—যেহেতু ক্ষতি ও হিতসাধন উভয়টি তাঁহারই হাতে। এমন না হয় যে, তিনি তোমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং হিত হইতে বঞ্চিত করিয়া দেন। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকিও না। ইহাতেও ভীতিপ্রদর্শন এবং উৎসাহ প্রদান উভয়ই রহিয়াছে। এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সুষ্ঠু বোধ শক্তি এবং সরল ভাবে কাজ করিবার তাওফীক দান করেন।

آمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه
اجمعين وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين -

—(*)—

বর্ণনা পদ্ধতির তা'লীম

(تعليم البيان)

১৩৩০ হিজরী, রজব মাসের ১১ তারিখে, থানাভোয়ান্ শহরে এমদাদুল ওলুম মাদ্রাসায় দাঁড়াইয়া, হযরত থানভী (রঃ) বর্ণনা প্রণালী সম্বন্ধে, এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিট ব্যাপী এই ওয়ায করিয়াছিলেন। মৌলবী সাঈদ আহমদ সাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

০

আজ আমাদের মধ্যে যেই এল্ম রহিয়াছে ইহার বদৌলতে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে দাখিল হইতে পারি। ইহা বয়ানের নেয়ামতের সাহায্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের পূর্ববর্তী নেককার ওলামায়ে কেরাম যদি নানাবিধ এলম প্রকাশ ও একত্রিত না করিয়া যাইতেন, তবে আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না। এইরূপে আমরাও যদি এই সংক্রামক সওয়াব হাছিল করিতে চাই, তবে ইহার উপায় একমাত্র এই যে, আমরা লেখা ও বক্তৃতায় দক্ষতা অর্জন করি এবং দ্বীনী এল্মসমূহ অন্যান্য লোকদের নিকট পৌঁছাই।

০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۗ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

॥ সূচনা ও প্রয়োজনীয়তা ॥

ইহা সকলেই জানেন যে, এখন একটি খাছ ও মুবারক মজলিসের উদ্বোধন করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য শুধু তালেবে এলমদের মধ্যে বক্তৃতার অভ্যাস পয়দা করা, যেন তাহাদের মধ্যে এল্‌ম হাছেল করার উদ্দেশ্য সফলে ত্রুটী না থাকে এবং তাহাদের লেখাপড়া তাহাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে। অন্যান্য লোক-দেরকেও যেন পৌঁছাইতে পারে। সে সম্বন্ধে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই এখন এই আয়াতটি তেলাওয়াত করা হইয়াছে। আমি অদ্যকার বর্ণনার জন্য পূর্ব হইতেই এই আয়াতটি নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে কারী ছাহেবও এই রুকূ'টিই শুনাইলেন। কারী ছাহেব তেলাওয়াত আরম্ভ করিতেই আমার ধারণা হইল, উভয়ের নির্বাচনের এই সামঞ্জস্য অদ্যকার মজলিস আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মাকবুল হওয়ারই লক্ষণ।

শবেকদর সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছে—একই ধরণের কতকগুলি স্বপ্নে একথা প্রকাশ পাইতেছে যে, শবে কদর (রমযান শরীফের) এই শেষ দশ দিনের মধ্যেই আছে। সুতরাং প্রবল ধারণাও ইহারই অনুকূল। ইহা হইতে তত্ত্ববিদগণ ইহাই আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ঐক্য ভাবে কয়েকটি অন্তরে কোন বিষয় উদিত হওয়ার দ্বারা একথারই ধারণা প্রসূত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত উদিত বিষয়টি ঠিক এবং যথার্থ। যদিও আমরাই বা কি? এবং আমাদের উদিত বিষয় বস্তুই বা কি? কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র উদিত বিষয়ের ফলও আমরা তাহাই বলিব যাহা বড় বড় ব্যাপারে বড় বড় উদিত বিষয়ের ফল হইয়া থাকে।

এখন একই সঙ্গে আমার ও কারী ছাহেবের অন্তরে এই কথা আসা যে, ঐ আয়াত তেলাওয়াত করা উচিত। বলা বাহুল্য আমরা উভয়ে অবশ্য "আল্‌হামদু লিল্লাহ্" অন্ততঃ মুসলমান এবং আমাদের মজলিসও ক্ষুদ্রই। ইহাতে লক্ষণ এই পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের অদ্যকার মজলিস ইনশাআল্লাহ ফায়েদাহীন নহে; বরং আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা কবুল করিবেন। কিন্তু কেবল এই লক্ষণের উপর যথেষ্ট মনে করা এবং নির্ভর করা উচিত হইবে না; বরং ইহা কবুল হওয়ার জন্য তদবীরও করিতে হইবে। তাহা হইল সুন্নতের পায়রবী। তৎসঙ্গে দোআও করিতে হইবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ ওয়ায শেষে তাহা করা হইবে। দোআয় ইহাও প্রার্থনা করিতে হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে যেন ফলপ্রসূ করেন এবং যেন সুন্নতে নববীর সহিত ইহার সামঞ্জস্য থাকে। শরীয়তের সীমা যেন ছাড়াইয়া না যায়। প্রত্যেক বিষয়ে দোআই বড় জিনিষ। তবে মনে আনন্দ-দায়ক লক্ষণও যদি পাওয়া যায়, তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা এক প্রকারে শুভ-সংবাদ প্রদানকারী এবং ইহা অতি নিম্নস্তরের খোশ-খবরী। ইহার

পরবর্তী স্তর চেষ্টা ও তদবীরের। আর সর্বোচ্চ স্তর হইল দোআর, তৎসঙ্গে তদবীর হওয়া আবশ্যক যেন প্রত্যেক বিষয়ে সফলতার কার্যকরীকরণে সর্বশেষ অংশ 'দোআ' হয়। সুতরাং উপকার লাভে দোআরও বড় অধিকার রহিয়াছে। এই কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমে মধ্যস্থলে বলিলাম, এখন আমি আমার আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেছি।

॥ মহান রহমত ॥

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াতগুলিতে নিজের কতিপয় খাছ খাছ কাজের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সরাসরি তাঁহার রহমত। আবার নিজের পবিত্র নামও রহমতের বিশেষণেই উল্লেখ করিয়াছেন, এই আয়াতগুলিতে তিনটি রহমতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনটিই বড় বড় রহমত। তিনটি রহমতের উল্লেখই الرحمن নামের সহিত আরম্ভ করা হইয়াছে। কেননা, তিনটি বাক্যেই الرحمن শব্দটি উদ্দেশ্য এবং তৎপরবর্তী কথাগুলি স্ব স্ব বাক্যে বিধেয়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ বলিয়াছেন :

الرحمن علم القران - الرحمن خلق الانسان - الرحمن علمه البيان -

ইহাতে বুঝা যায়, তিনটি নেয়ামতের উদ্দেশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত প্রকাশ করা। ইহার নযীর এইরূপ মনে করুন, যেমন, কোন হাকীম কাহাকেও লক্ষ করিয়া বলেন : "দয়ালু হাকীম আপনাকে পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, দয়ালু হাকীম আপনাকে অফিসার বানাইয়াছেন। দয়ালু হাকীম আপনাকে উন্নতি দান করিয়াছেন।" এইরূপে এসমস্ত নেয়ামতের উদ্দেশ্যও আল্লাহ তা'আলার রহমত, আর রহমতও মহান এবং বিরাট। কেননা رحمن শব্দটি 'আতিশয্য জ্ঞাপকরূপ। অতএব, তরজমার সারাংশ এই হয় :

১। "যিনি অতিশয় দয়ালু, তিনি কোরআন তা'লীম দিয়াছেন," ইহা প্রথম নেয়ামত।

২। "তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন," ইহা দ্বিতীয় নেয়ামত।

৩। "তিনি মানুষকে বর্ণনা শক্তি দান করিয়াছেন," ইহা তৃতীয় নেয়ামত।

এই তিনটি নেয়ামতের মধ্যে আমার অদ্যকার বক্তব্যের সম্পর্ক তৃতীয় বাক্যটি। কিন্তু বাকী নেয়ামত দুইটি যেমন, তৃতীয়টির পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্রূপ সেই দুইটির অস্তিত্বও তৃতীয়টির পূর্ববর্তী—ইহাদের অগ্রবর্তিতা অনুভবনীয়ই হউক, কিংবা উপলব্ধি করার বিষয়ই হউক। অতএব, সেই নেয়ামত সম্বন্ধীয় আয়াত দুইটিকেও তেলাওয়াত করা হইল। বস্তুতঃ সৃষ্টির নিয়মানুসারে একটি নেয়ামত অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টি পূর্ববর্তী ও নির্ভরশীল হওয়া প্রকাশ্যেই দেখা যায় এবং যাবতীয় কার্যের জন্য আগে মানুষের সৃষ্টি শর্ত। কেননা, মানুষ সৃষ্ট না হইলে তাহাকে বয়ানের তা'লীম

দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব, তা'লীম দেওয়া ও গ্রহণ করা নির্ভর করে নিজের অস্তিত্বের উপর এবং অস্তিত্ব নির্ভর করে সৃষ্টির উপর।

ইহা হইতে প্রকাশ্যে বুঝা যায়, একথা উল্লেখ করারও প্রয়োজন ছিল না। কেননা, ইহা সকলেই জানে যে, সৃষ্ট না হইলে বয়ান করিতে পারিতাম না। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ইহাকে উল্লেখ করার মধ্যে একটি রহস্য আছে। তাহা এই যে, মানুষ সৃষ্টিরূপ নেয়ামতটিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই বুঝাই-তেছেন যে, যে নেয়ামত অন্য কোন নেয়ামতের জন্য উছিলা, তাহা এক পর্যায়ে স্বতন্ত্র এবং উদ্দেশ্যমূলক নেয়ামত বটে। উহাকে শুধু উছিলার পর্যায়ে ফেলিয়া রাখা যায় না। অর্থাৎ কোন নেয়ামত যেহেতু অন্যান্য নেয়ামতের জন্য উছিলা স্বরূপ হইয়া থাকে, কাজেই সেদিকে অনেক সময় মনোযোগই হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে উহার উল্লেখ করিয়া তিনি যেন বলিয়া দিতেছেন যে, ইহা খুব বড় নেয়ামত। ইহাও স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্যণীয় ও উল্লেখযোগ্য। শুধু বয়ান তা'লীম দেওয়াই একমাত্র নেয়ামত নহে। যদি এই সৃষ্টিরূপ নেয়ামতটি উল্লেখ করা না হইত, তবে শুধু শব্দের দ্বারা বুঝা যাইত না যে, ইহা একটি উদ্দেশ্যমূলক নেয়ামত। অতএব, উহা উল্লেখ করিয়া এই বিষয়টির প্রতি সচেতন করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উহা অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি শুধু অন্য নেয়ামতের উছিলাই নহে স্বতন্ত্র একটি বড় নেয়ামতও বটে। কেননা, মানুষ সৃষ্টি করা শুধু তা'লীমে বয়ানের উছিলা নহে ; বরং সৃষ্টি করার মধ্যে আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। যাহা হউক, তা'লীমে-বয়ানরূপ নেয়ামতটি যে মানুষ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়।

এখন রহিল দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ তা'লীমে-কোরআন নেয়ামতটি তা'লীমে-বয়ানের উপর অগ্রবর্তী হওয়া। ইহা অতি সূক্ষ্ম কথা, এমন কি, আলেমগণও অনেক সময় এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, তা'লীমে বয়ান শরীয়তের নিয়মানুসারে তা'লীমে কোরআনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোরআন ছাড়া যদিও বাহ্যিকভাবে বয়ানের অস্তিত্ব হইয়া যায়, কিন্তু সেই অস্তিত্ব সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য তা'লীমে-কোরআনের পরে হইবে। কেননা, ওয়াযে ও বর্ণনায় যদি তা'লীমাতে কোরআনিয়ার প্রতি লক্ষ না রাখা হয়, তবে উক্ত বয়ান ও ওয়ায শরীয়ত অনুযায়ী বাতিল এবং না হওয়ার শামিল। যেমন, আজকাল অনেকেই কোরআনের তা'লীম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছে। সাধারণ লোকদিগকে বহুতই দেখা যায় যে, অধিকাংশ কাজে তাহারা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে এবং শরীয়ত বিধানের প্রতি একটুও লক্ষ করে না। কিন্তু আমি এইরূপে তালেবে এল্‌মদিগকেও তাহাদের কথায় এবং কাজে শরীয়তের পথ ছাড়িয়া অনেক দুর অগ্রসর দেখিতেছি। কোরআনের তা'লীমকে তাহারাও অনেক বেশী ছাড়িয়া দিয়াছে। এই কারণেই ওলামায়ে হক্ তালেবে-এল্‌মদিগকে এরূপ সভাসমিতির অনুমতি প্রদান

করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহারা আশঙ্কা করেন—ইহারা সভা সমিতির কার্য নির্বাহ করার কাজে শরীয়তের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে।

॥ সুন্দর বয়ান ॥

যেমন, আমি এখন কোন কোন নও-জওয়ান আরবী ছাত্রকেও দেখিতেছি যে, তাহারা এ সমস্ত মজলিসেও শরীয়তের অনেক বিষয়ই ছাড়িয়া যাইতেছে। কোন কোন সময় সত্যের বিরোধী বিষয় বর্ণনা করে। কোন কোন সময় ইয়োরোপের ভক্তবৃন্দের পদ্ধতি অবলম্বন করে। তদুপরি যুলুম এই যে, তাহাদের মুরব্বি ওস্তাদ সাহেবান তাহাদিগকে এই পদ্ধতি অবলম্বনে বাধা দিতেছেন না; বরং তাহাদের ওয়াযের পুঁজিতে ইহাকে সহায়ক ও শক্তি উৎপাদক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

ইহার কারণ এই যে, এল্‌মের তো অভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং গিল্টি করার প্রয়োজন হইতেছে। যেহেতু খাঁটি জিনিষ তহবীলে নাই। কাজেই মেকী লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে। যাহার নিকট খাঁটি বস্তু থাকিবে তাহার গিল্টি করার প্রয়োজন কেন হইবে? খাঁটি বিষয়বস্তুওয়ালা বক্তার গিল্টি ও চাকচিক্যহীন বয়ানে যদিও শব্দের ঘটা ও চাকচিক্য নাই কিন্তু তাহাতে বাতেনী সৌন্দর্য থাকে। পক্ষান্তরে গিল্টি করা তাক্‌রীরে যদিও বাহ্যিক চাকচিক্য থাকে কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সেই বাহিরের চাকচিক্য লোপ পাইয়া কেবল শব্দগুলিই অবশিষ্ট থাকে। অতএব, চিন্তার দ্বারা উভয় প্রকারের তাকরীরের পরীক্ষা হইয়া যায়। এই মর্মেই হাফেয (রঃ) বলেনঃ

خوش بود گر محک تجربه آید بمیان + تا سیه روشود هرکه دروغش باشد

"অর্থাৎ, উত্তম ব্যবস্থা এই যে, আমাকে এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরীক্ষার কষ্টি পাথরে ঘষিয়া দেখা হউক। যাহার মধ্যে ভেজাল প্রমাণ হইবে তাহার মুখ কাল হইয়া যাইবে।" কেননা, ইহাতে যদিও বর্তমানে চাকচিক্য দেখা যাইতেছে কষ্টি পাথরে ঘষিলে সবকিছুই লোপ পাইবে। আর যাহা খাঁটি তাহা তথায় যাইয়াও চাকচিক্যের সহিতই থাকিবে; বরং উহার উজ্জ্বলতা দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। ফলকথা, যাহার নিকট এল্‌মের পুঁজি আছে তাহার কোন প্রকার গিল্টি করার প্রয়োজন হয় না। আর যাহার নিকট এই পুঁজি নাই, সেই সর্বপ্রকারের গিল্টির দ্বারা কার্যোদ্ধার করে, তবুও সেই সৌন্দর্য পয়দা হয় না। এই সৌন্দর্যকে লক্ষ করিয়াই হাফেয (রঃ) বলিতেছেনঃ

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ + قبول خاطر وحسن سخن خدا داد است

دلفریبان نباتی همه زیور بستند + دلبر ماست که با حسن خدا داد امد

আরও বলেন, "হে দুর্বল রচনাকারী! হাফেযের প্রতি কি হিংসা পোষণ করিবে। জনপ্রিয়তা এবং বাক্যের সৌন্দর্য খোদা প্রদত্ত বস্তু।" "মনোহারিণী বালিকারা সকলেই অলংকার পরিয়া অপরূপ সাজে সজ্জিত হইয়াছে। আর আমার প্রেয়সী' খোদা প্রদত্ত সৌন্দর্য লইয়া আসিয়াছে।"

আমি হক্‌পন্থী মহাপুরুষদিগকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের সরল সাদাসিধা শব্দগুলিতে এমন সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে যে, তাহা বড় বড় রূপক ও উপমিতিযুক্ত ভাষার মধ্যে থাকে না। ইহারা যত সজ্জিত ও চাতুর্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া থাকে উহাদের সৌন্দর্য কেবল প্রথম দৃষ্টি পর্যন্তই। যতই জোর দৃষ্টি দিতে থাকিবেন ততই উহার নমনীয়তা দুর্বল হইয়া উহা যে কেবল কতকগুলি শব্দের সমাবেশ তাহা প্রকাশ হইতে থাকিবে। কেননা, সেখানে এল্‌মের মূলধন নাই। পক্ষান্তরে হক্কানী আলেমদের তাকরীরে তাহাদের সাদাসিধা শব্দগুলির অবস্থা এইরূপ—

يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا + إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا

"যতই নযর বেশী করিবে ততই তোমার সম্মুখে তাহার চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।"

॥ বয়ানের ফল ॥

একজন ডাক বিভাগীয় পরিদর্শকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি একজন সত্যান্বেষী লোক ছিলেন। সত্যান্বেষী লোকের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে গূঢ়তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। তিনি জনৈক লোক সম্বন্ধে যিনি এই সাংবাদিক জগতে একজন বিখ্যাত লোক, বলিতেছিলেন যে, আমি তাঁহার সঙ্গ লাভের ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে করিলাম, তাঁহার মত তত্ত্ববিদ আর কেহ নাই। কিন্তু যখন হইতে আমি আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের ওয়ায শুনিয়াছি, যাঁহারা তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাও করিতে পারেন না, বড় বড় বুলিও আওড়াইতে পারেন না, তখন হইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আসল এল্‌ম কি জিনিষ।

তিনি আরও বলিতেন, আমি গভীর চিন্তা করিয়া আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক ও নূতন ধরণের লোকদের তাকরীরের মধ্যে যে প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই যে, তাহাদের তাক্‌রীর প্রথম দৃষ্টিতে নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। সত্য তাহাতেই সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহাতে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে উহার গূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইতে থাকে। উহা দুর্বল, শক্তিহীন, অসত্য এবং গিল্টি বলিয়া বোধ হইতে থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের তাক্‌রীর প্রথম দৃষ্টিতে রংবিহীন ফেকাশে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যতই উহাতে গভীর ভাবে চিন্তা করা হয়, ততই উহাদের শক্তি এবং সত্যের আনুকূল্য বুঝা যাইতে থাকে এবং অন্তরে উহার খুব গভীর ক্রিয়া হইতে থাকে। ফলে ঐ সমস্ত গিল্টি করা তাক্‌রীরের প্রভাব ও ক্রিয়া অন্তর হইতে মুছিয়া যাইতে থাকে।

॥ বর্ণনা পদ্ধতি ॥

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় যে, আজকাল আলেমদের উপর নানাবিধ প্রশ্নবানের মধ্যে এই প্রশ্নও করা হয় যে, আলেমরা বক্তৃতা করিতে পারে না কেন? ইহার উত্তর হইল, আমাদের কাছে যখন কোরআন ও হাদীসের এবং উহাদের বিভিন্নমুখী তা'লীমাতের মূলধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন আমাদের কোন বাহ্যিক চাকচিক্যে কি প্রয়োজন? কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন:

زعشق نا تمام ما جمال یار مستغنی ست + بآب ورنگ وخال وخط چه حاجت روئے زیبارا

"বন্ধুর নিখুঁত সৌন্দর্য আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ এশ্‌কের মুখাপেক্ষী নহে। যে চেহারা স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিকারী তাহাতে পাউডার লাগাইয়া এবং তিলক চিহ্ন ও বিচিত্র দাগ কাটিয়া সুন্দর করার প্রয়োজন হয় না।" অর্থাৎ, তাকরীরের ঢং লিখিবার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই। আমি তো পরিষ্কার বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি বক্তৃতায় ঢং অবলম্বন করে, সে প্রথমেই আমাদের অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করিয়া থাকে। আমরা তো সেই প্রণালীই পছন্দ করি হাদীসে যাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে—نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ "আমরা সাদাসিধা উম্মত।" হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পছন্দ ইহাই ছিল যে, তাঁহার উম্মত যেন সাদাসিধা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে। এই জন্যই তিনি এখানে 'نَحْنُ' অর্থাৎ 'আমরা' শব্দটি বলিয়া সমস্ত উম্মতকে শামিল করিয়াছেন। ইহাই নবীর পায়রবী ও আনুগত্যের প্রাণবস্তু, অর্থাৎ, কথার মধ্যে সম্পূর্ণ সাদাসিধা হওয়া। أُمِّيَّةٌ শব্দটি أُمّ আর্থাৎ 'মা' এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের জীবন তেমনি সাদাসিধা থাকিবে মাতৃ-উদর হইতে জন্মগ্রহণ করার পর শৈশবে আমরা যেমন সাদাসিধা ও সরল ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না; বরং কাজে ও ব্যবহারে সরলতা বিদ্যমান ছিল। ইহাই শিশুদের গুণ যাহার কারণে প্রত্যেকে শিশুকে ভালবাসে। অন্যথায় শিশুরা শৈশবে যেমন মলমূত্রে ডুবিয়া অপবিত্র হইয়া থাকে তদবস্থায় স্বভাবতঃ সকলেরই তাহাদের প্রতি ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল। আর যে সমস্ত বৃদ্ধ লোকের মধ্যে এই শিশুসুলভ সরলতা বিদ্যমান থাকে, আমরা দেখিতেছি, বড় বড় সুন্দরীরা তাহাদের প্রতি কোরবান হইতেছে। অতএব, উম্মী হওয়ার আসল অর্থ এই সরলতা ও সাদাসিধা স্বভাব। আর লেখাপড়া না জানা যাহা উম্মী শব্দের বিখ্যাত অর্থ তাহাও এই সরলতারই একটি শাখা। অতএব, ওয়ায এবং তাকরীরের মধ্যেও কৃত্রিমতা ও গিল্‌টি না থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং গিল্‌টি ও কৃত্রিমতার আবরণ হইতে পবিত্র থাকা আবশ্যক। অবশ্য ওয়াযের মধ্যে সাদাসিধা বিষয়-বস্তুর সহিত বর্ণনা-ভঙ্গী খুব পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এখন এই প্রণালী একেবারেই ছুটিয়া যাইতেছে।

॥ ভাষার বিশেষত্ব ॥

আমরা আলেমদিগকে দেখিতেছি, প্রথমতঃ তাহাদের মধ্যে ভাষার প্রচলিত ভাবভঙ্গী ও নিয়ম-কানুন আসা-যাওয়া করে, অথচ শরীয়তের কথা বাদ দিলেও আরো একটা কথা দেখিতে হইবে যে, আমাদের মাতৃভাষা উর্দু এবং ইহার কিছু বিশেষত্বও আছে। যেমন, দুনিয়ার প্রত্যেকটি ভাষারই কিছু কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে। এখন নূতন ভাবধারা অবলম্বন পূর্বক ইংরেজী ভাষার বৈশিষ্ট্যকে উর্দু ভাষার মধ্যে ঢুকান হইতেছে এবং উহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ ইংরেজী ভাষার বিশেষত্বগুলি এই ভাষার সহিত মোটেই খাপ খায় না। উহার ফলে উর্দু ভাষা একেবারে নিরস এবং বিকৃত হইয়া যায়। এই শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক নিজদিগকে উর্দু ভাষার রক্ষক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। অথচ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহারা উর্দু ভাষার অস্তিত্ব লোপকারী। কেননা, প্রত্যেক ভাষার একটা থাকে মূলবস্তু আর একটা থাকে বাহ্যিক আকার। আর এতদুভয়ের সমষ্টির নাম উর্দু ভাষা, শুধু মূলবস্তুর নাম নহে। অতএব, উর্দু ভাষার রূপ যদি বাকী না থাকে, তবে ইহা উর্দু ভাষা কিরূপে থাকিবে ?

অতএব, আমরা যদি উর্দু ভাষার রক্ষকই হই, তবে আমাদের উচিত উহার বিশেষত্বগুলি কায়েম রাখা। আমাদের কথাবার্তা এরূপ হওয়া উচিত যেন অপর কেহ শুনিলে মনে করে যে, আমরা ইংরেজীর একটি হরফও জানি না এবং ইংরেজী ভাষার সহিত আমাদের কোন বিষয়ে সামঞ্জস্যও নাই। ইহা হইতেও আশ্চর্যের কথা এই যে, আজকাল আরবী পড়ুয়া ছাত্রদের তাকরীরেও ইংরেজী শব্দ অনেক ঢুকিয়া পড়িতেছে। অথচ তাহাদের তাক্‌রীরের মধ্যে অন্য কোন ভাষার শব্দ আসিলে সে স্থলে আরবী ভাষার শব্দ স্থান পাওয়া উচিত ছিল। কেননা, প্রথমতঃ ইহারা আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, আরবী আমাদের ধর্মীয় ভাষা এবং এই হিসাবেই আরবী ভাষাই আলেমদের আসল ভাষা। উর্দু ভাষা তো অল্প দিন হয় আমাদের ভাষা হইয়াছে। নতুবা আমাদের আসল এবং পৈতৃক ভাষা আরবীই বটে। কেননা, আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরব হইতেই এদেশে আসিয়া হিন্দুস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

অনেক সময়ে একথা ভাবিয়া আমার খুবই আফসুস হয় যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ নিজেদের বংশ-তালিকা পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ভাষার সংরক্ষণ করেন নাই। অথচ ইহা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল না, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেই যেই দেশে বিজয় পতাকা উড়াইয়াছেন, অধিকাংশ দেশেই সারা দেশবাসী তাঁহাদের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত সেই ভাষাই প্রচলিত আছে। অথচ ছাহাবায়ে কেরাম তজ্জন্য বিশেষ কোন চেষ্টাও হয়ত করেন নাই। যেমন,

মিশরকেই দেখুন। ছাহাবায়ে কেরামের বদৌলতে সমগ্র মিশরের ভাষা আরবী। যদিও সমগ্র মিশরের ধর্ম ইসলাম নহে। যাহা হউক, যদি বলেন, 'গায়ের-ছাহাবীর মধ্যে ছাহাবীদের ন্যায় বরকত ছিল না এবং সেই কারণেই সমস্ত বিজিত সম্প্রদায় তাঁহাদের ভাষা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের ভাষা তো রক্ষা করিতে পারিতেন? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হিন্দুস্থানে আসিয়া তাঁহারা নিজেদের ভাষা চালু করা তো দুরের কথা নিজেদের ঘরেও উহাকে রক্ষা করেন নাই।

॥ মিশ্রণ ও সাদৃশ্যতা ॥

চিন্তা করিলে ইহার কারণ এই বুঝা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশই এদেশে একাকী পদার্পণ করিয়াছেন এবং এদেশে বসতি স্থাপন করিয়া এদেশের নওমুসলিম মহিলাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন। কাজেই সন্তানদের মধ্যে মাতৃভাষার প্রভাবই অধিক পড়িয়াছে, আর ইহার ফলেই এই উর্দু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মাতৃপ্রভাবের কারণেই আজ মুসলমানদের মধ্যে 'তীজাহ্' প্রভৃতি কুসংস্কার অবশিষ্ট রহিয়াছে। অর্থাৎ, যেহেতু হিন্দী মেয়েলোকদের মধ্যে নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের রসম অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং সেই পূর্বদিন আসিলে তাহারা হয়ত নিজ নিজ স্বামীকে বলিয়া থাকিবে এরূপ দিনে আমরা এরূপ অনুষ্ঠান করিতাম, বহিরাগত মুসলমানগণ বাহ্যদৃষ্টিতে উহাতে কোন দোষ না দেখিয়া স্ব স্ব স্ত্রীর মন রক্ষার্থে সামান্য পরিবর্তনের পর উহার অনুমতি দিয়া থাকিবেন। যেমন, যেখানে উক্ত অনুষ্ঠানে শ্লোক পাঠ করা হইত সেখানে সূরা-ফাতেহা পড়িতে বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু তখন তাহা শুধু সাময়িক ভাবে ছিল, এখন মানুষ উহাকে অকাট্য ফরয বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আলেমগণ উহা নিষেধ করিলে তাহাদিগকে 'ওহাবী' এবং আরও কতকিছু আখ্যা দিতে আরম্ভ করিতেছে।

ফলকথা, এই সাময়িক মাতৃ প্রভাবের বদৌলতে হিন্দুস্তানে আরবী ভাষা প্রচলিত হইতে পারে নাই। কেননা, আব্বাজান হয়ত আরবীই বলিতেন, আর আম্মাজান বলিতেন হিন্দী। শিশুরা বেশীর ভাগ মায়ের কাছেই থাকিত। এই কারণে কিছু আরবী এবং কিছু হিন্দী মিলিত হইয়া এক সমষ্টি উৎপন্ন হইয়া গেল। আর যদি বাড়ীতে আরবী বলিতেন, আর বাহিরে আসিয়া মানুষের মুখে হিন্দী ভাষা শ্রবণ করিতেন, তবে উভয় ভাষাই বাকী থাকিত। যেমন আমরা হিন্দস্তানী এবং ইংরেজদিগকে দেখিতেছি, তাহারা নিজ নিজ ভাষাও বলে এবং উর্দুও বলে। ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের ঘরে উরদু এবং ইংরেজী বলিয়া থাকে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেহেতু এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন নাই কিংবা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং আমাদের ভাষা মিশিয়া গিয়াছে। মিশ্রিত হওয়া সম্বন্ধে একটি ঘটনা মনে পড়িল।

মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব বলিতেন, আমি মক্কা শরীফে হিন্দী আরবী মিশ্রিত একটি বালককে দেখিয়াছি। সে انا بازار جاؤں 'আমি বাজারে যাইব' বলিয়া কাঁদিতেছিল। (انا শব্দটি আরবী আর بازار جاؤں হিন্দী) ফলকথা, মায়ের হিন্দী হওয়া ভাষার আরবীত্বকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে এবং আসল ভাষা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যদি কেহ বলেন, "আমরা তো মাতৃভাষাকে আসল মনে করিয়া থাকি।" আমি বলিব, যখন বংশের স্থায়িত্ব বাপের দ্বারা, তবে বাপের ভাষাকে আসল ভাষা কেন বলা হইবে না ?

মোট কথা, আমাদের আসল ভাষা যখন আরবী, তখন উর্দু ভাষার সহিত অন্য কোন ভাষার সংমিশ্রণ করিতে হইলে, উপরোক্ত ভিত্তিতে উর্দু ভাষাকে আরবী ভাষার অধীন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমরা করিয়া দিয়াছি ইংরেজীর অধীন যাহার প্রভাবে আজ উর্দু ভাষা উর্দুত্ব হইতেই প্রায় বাহির হইয়া যাইতে চলিয়াছে। আসল উর্দু ভাষা তাহাই, যাহা "চাহার দরবেশ" এবং গালেবের "উর্দু-ই মুআল্লা" কিতাব দুইটিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি উর্দু ভাষায় মিশ্রণ করিতে হয়, তবে আরবী শব্দেরই মিশ্রণ হওয়া উচিত। কেননা, আরবী শব্দের মিশ্রণে উর্দু ভাষার মাধুর্য দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া যায়। দেখুন, ফারসী এবারতের ফাঁকে কোথাও যদি একটি বাক্য আরবী আসিয়া পড়ে, তবে মনে হয়, যেন ফুল ছড়ান হইয়াছে।

সারকথা এই যে, ইংরেজী শব্দের মিশ্রণে আমাদের ভাষায় যে নূতনত্ব উৎপন্ন হইয়াছে উহা অবশ্য পরিহার্য। এই নূতন পদ্ধতির মধ্যে উপরোক্ত ত্রুটি ছাড়া একটি বড় দোষ ইহাও আছে যে, ইহা দ্বারা ধোকা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন প্রণালীতে এই আশঙ্কা নাই। শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গীতে এখানে আরও একটি কথা আছে যে, ইংরেজী অবলম্বন করা একটি ফাসেক সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা। এই সাদৃশ্য রাখা হারাম। হাদীস শরীফে আছে : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সহিত সাদৃশ্যতা রক্ষা করিয়া চলে, সে উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণ্য হইবে।" কেননা, সাদৃশ্যতা শব্দটি ব্যাপক। পোশাক এবং চালচলন পদ্ধতি সবকিছুই ইহার অন্তর্ভুক্ত। যদিও কেহ আমার এ কথায় মৌলবীদিগকে গোঁড়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি তজ্জন্য আদৌ পারোয়া করি না। কেননা, আমি কোন এক স্থানে তাহাদেরই স্বীকৃত প্রমাণের সাহায্যে তাঁহাদের নিন্দনীয়তা প্রমাণ করিয়া দিয়াছি। অবশ্য হাদীস যাঁহারা মানেন, তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে আমি এখানে হাদীস পাঠ করিয়াছি। এখন আমি আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতেছি—হাদীসটি আপনাদের বিরুদ্ধেও প্রমাণ। কেননা, মুসলমান আপনারাও। মোটকথা, ওয়ায ও তাকরীরের মধ্যে আজকাল এই দোষ ঢুকিয়াছে যদ্দরুন শরীঅত বিধি

পরিত্যক্ত হওয়ায় এসমস্ত ওয়ায বা বয়ান করা আর না করা সমান বিবেচিত হইবে। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, ওয়ায ও বয়ানের বাহ্যিক অস্তিত্ব যেমন মানুষ সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ উহার শরীয়ত সম্মত অস্তিত্ব তা'লীমে কোরআনের উপর নির্ভরশীল এবং ইহাই উক্ত আয়াতসমূহের সারমর্ম যাহা আমি প্রথমে পাঠ করিয়াছি। আর যেহেতু আজকাল তাক্‌রীরের মধ্যে এ সমস্ত দোষ ব্যাপকভাবে জন্মিয়াছে। সুতরাং মনেও ইহাই চায় যে, ওয়াযের ধারা এমন আয়াতে অবলম্বন করা হউক যেন কোরআন দ্বারাই উক্ত দোষসমূহ না-জায়েয হওয়াও প্রমাণিত হইয়া যায়।

অতএব, 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌' এই আয়াতটি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে তা'লীমের বয়ানের শরীয়তানুগ শর্তও উল্লেখ রহিয়াছে যে, "আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন।" কেননা, এই শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য হইল 'আমল'। ওয়ায ও বয়ানের মধ্যে যদি শরীয়তের সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য করা না হইল, তবে কোরআন অনুযায়ী আমল করা হইল না। আর কোরআন অনুযায়ী আমল না হইলে শরীয়তের বিধান অনুরূপ আমল হইল না। কেননা কোরআন শরীফ 'মতনের' ন্যায় আর এল্‌মে শরীয়ত সম্পূর্ণই উহার শরাহ্‌ বা ব্যাখ্যা এবং কোরআনেরই অর্থ। কোন কোনটি কোরআনের শব্দ দ্বারাই বুঝা যায়, কোনটি কোরআনের শব্দের ইঙ্গিতে বুঝা যায়, কিংবা কোনটি শব্দের চাহিদা অনুযায়ী বুঝা যায়, আবার কোন অর্থ আংশিক এবং কোন অর্থ পুরাপুরি বুঝা যায়।

যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উ'দ (রাঃ)-এর নিকট একজন স্ত্রীলোক আসিয়া বলিতে লাগিল : "আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, (কপালের প্রশস্ততাকারিগণের সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে) কপালের চুল উৎপাটনকারীকে আপনি লা'নত করিয়া থাকেন।" তিনি বলিলেন: "কোরআন যাহাকে লা'নত করে, আমি কেন তাহাকে লা'নত করিব না ?" স্ত্রীলোকটি বলিল : 'আমি তো সমগ্র কোরআনই পাঠ করিয়াছি উহাতে তো একথা নাই।' তিনি বলিলেন : "তুমি যদি কোরআন পড়িতে, তবে অবশ্যই সেকথা পাইতে।" অর্থাৎ মনোযোগ দিয়া পড়িলে উহাতেই পাইতে। কেননা, হুযুর (দঃ) এ সমস্ত কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর কোরআন বলিতেছে : 'রাসূল তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন, উহা পালন কর।' সুতরাং এইরূপে হুযুরের এই আদেশও কোরআনের আদেশ হইল। অতএব, দেখুন, হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) হুযুর (দঃ)-এর আদেশকেও কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

খোদ কোরআনেও বর্ণিত আছে :

فَاِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۚ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ؕ "আমার পক্ষ হইতে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর

উহার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আমার দায়িত্ব। অতএব, হুযূর (দঃ) কোরআনের অস্পষ্ট কথাগুলিকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। আর হাদীসের কোন স্থানে অস্পষ্টতা থাকিলে তাহা মুজ্‌তাহেদীনে কেরাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এমনকি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিলাম" কথাটিও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল। এই পূর্ণতা প্রকাশের পর যেহেতু আর কোন প্রয়োজন বাকী থাকে নাই—কাজেই আল্লাহ্র হেকমতে ৪র্থ শতাব্দীর পরে (মৌলিক) এজ্‌তেহাদের ক্ষমতাও শেষ হইয়া গিয়াছে। কেননা, এখন আর উহার প্রয়োজনই বাকী রহে নাই।

॥ কুদরতের বিচিত্র মহিমা ॥

খোদা তা'আলার বিচিত্র ক্ষমতা। যখন কাহারও কোন বস্তুর প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি তাহা পয়দা করিয়া দেন। আবার যখন পয়দা করার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়, তখন সেই সৃষ্টি করার ধারা বন্ধ করিয়া দেন। যেমন, তিনি হযরত আদম (আঃ)কে মাটি দ্বারা পয়দা করেন। যখন তাঁহাকে পয়দা করা সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন তাঁহারই পাঁজরের হাড় দ্বারা হযরত হাওয়া (আঃ)কে পয়দা করিলেন। এইরূপে যখন একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক সৃষ্টি হইয়া গেল, তখন সেই পদ্ধতির সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। এখন স্বামী-স্ত্রী মিলনেই সমস্ত মানুষ সৃষ্ট হইতে লাগিল। তবে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ভিন্ন হযরত ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টি ছিল অলৌকিক ব্যাপার। এইরূপে অন্যান্য বিষয়ও এইরূপেই হইতেছে।

আমি খবরের কাগজে এক ডাক্তারের উক্তি পাঠ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, কাটা যাইতে যাইতে বৃক্ষের সংখ্যা কম হইয়া যাওয়ায় বৃষ্টি কম হইতেছে। সুতরাং অধিক বৃষ্টি হওয়ার এক উপায় করা যাইতে পারে যেখানে বৃক্ষ কমিয়া গিয়াছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা হউক।" আল্লাহ্ জানেন, ডাক্তার ইহার কারণ কি বুঝিয়াছেন। কিন্তু ইহার রহস্য এই যে, গাছ না থাকিলে বৃষ্টির বেশী প্রয়োজন থাকে না আর যেখানে গাছ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, সেখানে প্রচুর বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তবে বাকী থাকে কৃষির প্রয়োজন। আজ-কাল উহার কাজ নহর হইতে পানি সিঞ্চন বা সরবরাহ করিয়া চালাইয়া নেওয়া হয়। অতএব, কৃষির সহিত বৃষ্টির সম্পর্ক কম হইয়া গিয়াছে। মোটকথা, দর্শন শাস্ত্র একথা স্বীকার করে, আমরা তো স্বীকার করিই। وَاٰتٰكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ "যতকিছু তোমরা প্রার্থনা করিয়াছ তাহা তোমাদিগকে তিনি দান করিয়াছেন।" আয়াতেও একথার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে অর্থাৎ, তোমাদের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে দানও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে হযরত

মুজতাহেদীনে কেরামের প্রয়োজন যত দিন ছিল, এজ্তেহাদের ক্ষমতা ততদিন পয়দা হইতেছিল, আর সেই প্রয়োজন শেষ হইবামাত্র সেই ক্ষমতাও ফুরাইয়া গেল।

॥ স্মরণ শক্তি ॥

এইরূপে স্মরণ শক্তির প্রয়োজন যত দিন ছিল, তত দিন পর্যন্ত এই ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হইত। এমন কি, হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) একশত বয়েত যুক্ত 'কাসীদাহ্' একবার শ্রবণ করিলেই মুখস্থ হইয়া যাইত।

হযরত ইমাম তিরমিযী (রঃ) যখন অন্ধ হইয়া গেলেন, তখন একবার ঘটনাক্রমে তিনি সফরে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় পৌঁছিয়া তিনি উষ্ট্রের উপর বসিয়া বসিয়া মাথা নীচু করিলেন। উষ্ট্র চালক উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন: 'এখানে একটি গাছ আছে, ইহার ডালের সহিত মাথার টক্কর লাগে।' উষ্ট্র চালক বলিল: 'এখানে তো কোন গাছ নাই'। তিনি উষ্ট্রকে সেখানেই থামাইয়া দিলেন এবং বলিলেন: 'আমার স্মরণ শক্তি যদি এতই দুর্বল হইয়া থাকে, তবে আমি আজ হইতে হাদীস বর্ণনা করা ছাড়িয়া দিব।' তিনি নিকটস্থ গ্রামে মানুষ পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অধিকাংশ লোকেই সেখানে কোন গাছ থাকার কথা অস্বীকার করিল; কিন্তু গ্রামের কোন কোন বয়ঃবৃদ্ধ লোক বলিল, দীর্ঘ কাল পূর্বে এখানে একটি গাছ ছিল, প্রায় বার বৎসর পূর্বে উহাকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। বৃক্ষের অস্তিত্ব প্রমাণ হওয়ার পর তিনি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে আবু দাউদ শরীফেও একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এক রাবী বলেন, "আমি একজন বেদুইন লোক হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল পরে আমার মনে হইল, লোকটির স্মরণশক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। এমন না হয় যে, লোকটি আমার কাছে ভুল হাদীস বর্ণনা করিয়াছে। অতঃপর রাবী তাহার নিকটে যাইয়া সেই হাদীসটি জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিল এবং বলিল, তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? আমার স্মরণ শক্তি এত প্রবল যে, আমি এ পর্যন্ত সত্তর হজ্জ করিয়াছি এবং প্রত্যেক বৎসর নূতন নূতন উটে আরোহণ করিয়া হজ্জ করিতে গিয়াছি। আমার স্মরণ আছে যে, আমি অমুক বৎসর অমুক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া হজ্জ করিয়াছিলাম।

ইমাম বোখারী কোন এক স্থানে (বাগদাদে) গেলে তথায় আলেমগণ তাঁহার স্মরণ শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহিলেন এবং একশতটি হাদীস তাঁহার সামনে উলটপালট করিয়া পড়িলেন। তিনি প্রত্যেক হাদীসে বলিতে লাগিলেন, لا اعرف। "আমি এইরূপ জানি না।" যখন তাঁহারা শেষ করিলেন, তখন তিনি সবগুলি হাদীস তাহাদের শব্দে পুনরাবৃত্তি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে শুদ্ধ করিয়া দিতে লাগিলেন যে, প্রথম হাদীসটি এইরূপ দ্বিতীয় হাদীসটি এইরূপ ইত্যাদি।

কিন্তু হাদীসের সংকলন সমাপ্ত হইলে পর এত স্মরণ শক্তির প্রয়োজন রহিল না। অতএব, তখন হইতে লোকের স্মরণ শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। মোটকথা, ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হওয়ার পর এজ্‌তেহাদের ক্ষমতা লোপ পাইল।

॥ বর্ণনা শক্তি ॥

এজ্‌তেহাদ দ্বারা যে ধর্মের পূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে উহার সারমর্ম হইল এই যে, হাদীস যেরূপ কোরআনের বর্ণনাকারী তদ্রূপ মুজতাহেদীনে কেরামের কেয়াস কোরআন এবং হাদীস উভয়েরই বর্ণনাকারী। সুতরাং মুজতাহেদীনের কেয়াস প্রসূত মাসায়েল এবং হুযুর (দঃ)-এর বাণীসমূহ সবই কোরআনের এল্‌ম। কাজেই এল্‌মে কোরআন বলিতে গোটা শরীয়তের এলমই বুঝাইবে এবং কোরআন পরিত্যাগ করার অর্থ হইবে শরীয়ত ত্যাগ করা। একথাটি প্রমাণ করার জন্য উহা অপেক্ষা আরও একটি পরিষ্কার ঘটনা মনে পড়িল। হুযুর (দঃ) একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : اَقْضِىْ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ 'আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করিব' এবং পরে দেখা গিয়াছে সেই মোকদ্দমার ফয়সালা হাদীস অনুযায়ী-ই করা হইয়াছিল।

সকল কথার সারমর্ম এই হইল যে, শরীয়ত অনুযায়ী বর্ণনা করা হইলেই তাহা কোরআন অনুরূপ বর্ণনা হইবে। আর বর্ণনা বলিতে উহার মধ্যে মুখের বর্ণনা এবং হাতের লেখা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। একথার পরিপ্রেক্ষিতেই কোরআন পাকের একস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন: عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ অর্থাৎ, বর্ণনা কখনও অঙ্গুলির সাহায্যে হয় কখনও বা মুখের সাহায্যে হয়। উভয় প্রকারের বর্ণনাকেই বর্ণনা বলা হইবে। এক বর্ণনা শিক্ষা দেওয়া পার্থিব ফায়দার হিসাবে নেয়ামতও, কিন্তু এখন তাহা আলোচনা করিব না। এখন বর্ণনা সংক্রান্ত ধর্মীয় বিশেষ বিশেষ ফায়দার কথাই উল্লেখ করিব যাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত ফায়দার পরিপ্রেক্ষিতে এই বর্ণনা শক্তি একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেয়ামতও বটে। তাহা এই যে, আজ আমাদের মধ্যে যেই এলম বিদ্যমান আছে উহার বদৌলতে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণের দলে দাখিল হইতে পারি। ইহা একমাত্র 'বয়ান' রূপ নেয়ামতের বদৌলতেই হইতে পারে। কেননা, আমাদের পুণ্যবান পুর্ব-পুরুষগণ যদি এল্‌মকে বর্ণনা ও সঙ্কলিত করিয়া না যাইতেন, তবে আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না। এইরূপে আমরা যদি আগত সংক্রামক ফায়দার সওয়াব লাভ করিতে চাই, তবে তাহারও উপায় এই যে, আমরা লেখনী শক্তি এবং বর্ণনা-শক্তিতে পূর্ণ অভিজ্ঞতা পয়দা করি এবং উহার সাহায্যে দ্বীনি এল্‌ম অন্যান্যদের নিকট পৌঁছাই। আমি অনেক আলেম দেখিয়াছি, যাঁহারা লেখাও জানে না, তাকরীরও

জানে না। অতএব, তাঁহাদের দ্বারা অতি অল্প লোকই উপকৃত হইতে পারে। আবার লেখা-শক্তির তুলনায় বক্তৃতা শক্তিতে অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অধিক। কেননা, লেখার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কিছু সংখ্যক লোক উপকৃত হইতে পারে। অর্থাৎ, শুধু তালেবে এল্‌ম সম্প্রদায় এবং লেখা-পড়া জানা লোকেরা উপকার লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে তাক্‌রীরের ফায়দা ব্যাপক। তাহাতে বিশেষ শ্রেণীর লোকগণ তো উপকৃত হয়ই, সাধারণ স্তরের মানুষও তাহাতে উপকৃত হইয়া থাকে। অতএব, বিশেষ ও সাধারণ ফায়দার পরিপ্রেক্ষিতে বয়ানের ভাষা দুই প্রকার। এক প্রকার শিক্ষকতা, ইহা দ্বারা কেবল তালেবে এল্‌মগণ উপকার লাভ করিয়া থাকে। আর এক প্রকার ওয়ায-নছীহত। ইহার দ্বারা সাধারণ শ্রেণীর মানুষও উপকৃত হইতে পারে।

॥ বর্ণনা প্রণালী ॥

এতদুভয় প্রকারের বর্ণনা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের ফায়দা তখনই হইতে পারে, যদি বর্ণনাকারীর মধ্যে বর্ণনা-শক্তি প্রয়োজনীয় পরিমাণে থাকে। অতএব, আমাদের তালেবে এলমদিগকে এখন হইতেই উভয় প্রকারের পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা ও অভ্যাস করিতে হইবে। অর্থাৎ, ওয়ায করিতে হইলে এমনভাবে করিবে যেন সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে। আর পড়াইতে বসিলেও এমনভাবে তাক্‌রীর করিতে হইবে যেন তালেবে এল্‌মগণ ভালরূপে বুঝিতে পারে।

অতঃপর পাঠ্য তালিকায় দুই প্রকারের কিতাব আছে। এক প্রকার 'আলিয়াত' অর্থাৎ, মুল উদ্দেশ্য কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ্ বুঝিবার জন্য অস্ত্রস্বরূপ যে সমস্ত কিতাব পড়া আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রকার 'মাকাছেদ্' অর্থাৎ, যাহা হাছিল করা মুল উদ্দেশ্য। আনুষঙ্গিক হাতিয়ার জাতীয় কিতাবগুলি পড়াইবার সময় লক্ষ্যস্থল শুধু তালেবে এল্‌মগণই হইয়া থাকে। কেননা, তাহা কেবল তালেবে এল্‌মগণই পড়ে এবং বুঝে। আর মুল উদ্দেশ্যের তথা কোরআন হাদীস এবং ফেকহার কিতাবগুলি পড়াইবার সময় তাক্‌রীরের লক্ষ্যস্থল তালেবে-এল্‌মরাও হয়, সময় সময় সাধারণ শ্রেণীর লোকেরাও হয়। সুতরাং মশ্‌ক্ অর্থাৎ অভ্যাস করিবার সময়ও একথার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। অর্থাৎ, যাহারা শুধু হাতিয়ার শ্রেণীর কিতাবে মশ্‌গুল, মশ্‌কের মজলিসে তাহাদের দ্বারা এইরূপে তাক্‌রীর করাইতে হইবে যে, প্রথমে কিতাবের মতন বা এবারত পড়িয়া পরে উহার বিষয়বস্তুগুলি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবে। ইহার চেয়ে অধিক বাড়াইবে না। (এরূপ প্রাথমিক অবস্থার শিক্ষার্থীদিগকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অবলম্বনে ওয়ায করিতে দিলে তাহাতে কয়েকটি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ, তাহার জানাশুনার পরিসর কম বলিয়া বিষয়টিকে বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করিতে

পারিবে না। সংশোধন করিতে গেলে কত করা যাইবে ? না করিলেও সে নিজেও অজ্ঞ থাকিয়া যাইবে এবং শ্রোতৃবর্গও ভুলের মধ্যে পতিত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, সে নিজের দৈনন্দিন সবক ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র এই ওয়াযের মযমুন সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকিবে। তৃতীয়তঃ, তাহার কিতাব পড়া বাদ পড়িলে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে ওয়াযের পেশা অবলম্বন করিবে এবং মূর্খ ওয়ায়েয সাজিয়া সমাজের বিনাশ করিবে। এরূপ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে তাক্‌রীর বাড়ান যেমন ক্ষতিকর তদ্রূপ লেখার ক্ষেত্রেও। যেমন, আজকাল ছাত্রদের মধ্যে এরূপ অভ্যাসও হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এরূপ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরাও লেখার অভ্যাস করিবার জন্য খবরের কাগজে প্রবন্ধ পাঠাইয়া থাকে।) যাহা হউক, এইরূপ অভ্যাস করাইলে কেবল ছাত্রদের তাক্‌রীরই পরিষ্কার হইবে না ; বরং আরও একটি ফায়দা ইহাও হইবে যে, তাহারা ইহাতে পড়াইবার প্রণালী শিখিতে পারিবে। আমাদের ওস্তাদ ছাহেবান এবং বুযুর্গানে দ্বীনের পড়াইবার প্রণালী এরূপই ছিল যে, তাঁহারা কেবল কিতাবই ভালরূপে বুঝাইয়া দিতেন। অতিরিক্ত কিছু বলিতেন না, হাঁ তবে কোন অত্যন্ত জরূরী বিষয় হইলে তাহা বলিয়া দিতেন।

পড়াইবার সময় এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার যে, শিক্ষক যে বিষয় অবগত নহেন তাহা পরিষ্কার বলিয়া দিবেন। হযরত মাওলানা মামলুক আলী ছাহেব হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে ফায়দা এই যে, মুদাররেসের উপর ছাত্রদের সর্বদা দৃঢ় নির্ভর থাকে এবং সে মনে করে, "আমাকে যাহাকিছু শিখান হইতেছে সবই শুদ্ধ এবং খাঁটি। আর যেখানে এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা হয় না ; বরং বানাইয়া গড়াইয়া বলা হয় এবং অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার এই হটকারিতা উপলব্ধি করিয়া ফেলে। অতএব, সেখানে বিপদ দাঁড়ায়। তর্ক-বিতর্কে সবক নষ্ট হয় এবং এই বদভ্যাস ছেলেরাও শিখিয়া লয়। কেহ কেহ বলেন, ভুল স্বীকার করিলে তালেবে এল্‌মরা বিগড়াইয়া যায়, অথচ ইহা শুধু অনর্থক কথা ; তাহারা বরং আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। যেমন, আমি উপরে বলিয়াছি যে, ইহাতে মুদাররেসের উপরে ছেলেদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। মোটকথা, এই শিক্ষা প্রণালী তাক্‌রীরের সময়ও খেয়াল রাখিবেন। সূক্ষ্ম-তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং ভাব সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ বাদ দিবেন। কেননা, এ সমস্ত তাক্‌রীর, যাহা ছেলেদিগকে অভ্যাস করান হইবে, শুধু পড়াইবার প্রণালী শিখাইবার জন্যই করান হইবে। স্বভাবের জোশ এবং উত্তেজনা দেখাইবার জন্য নহে। আর পড়াইবার সময় যে সমস্ত বাহুল্য বর্ণনা করা হয়, তাহা এই কারণেই হিতকর নহে যে, ইহা কাহারও মনে থাকে না, সময় নষ্ট হওয়ার কথা তো পৃথক আছেই।

যেমন মৌলবী ছিদ্দীক আহ্‌মদ গঙ্গুহী ছাহেব বলিতেন, "আমি যখন দিল্লী মাদ্রাসায় মুদাররেস হইয়া গেলাম, তখন বেলায়েতী (পাঠান) তালেবে এল্‌মদের

অধ্যাপনার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল এবং সুল্লাম পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম : "তোমরা সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের সহিত পড়িবে, না সাদাসিধা পড়িবে ?" তাহারা বলিল : 'আমরা তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাথেই পড়িব।' আমি রাত্রে বহু হাশিয়া ও শরাহ্র কিতাব দেখিয়া সকাল বেলা খুবই তাহ্কীকের সহিত পড়াইলাম। দ্বিতীয় দিনে আমি তাহাদিগকে এই প্রশ্নই করিলাম যে, তোমরা তাহ্কীকের সহিত পড়িবে না সাদাসিধা পড়িবে, ? তাহারা বলিল, আমরা তাহ্কীকের সাথেই পড়িব। আমি বলিলাম : 'যদি তাহ্কীকের সহিত চাও, তবে গতকল্য আমি যাহাকিছু তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছি, উহা আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাও, যাহাতে আমি বুঝিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে তাহ্কীকের সহিত পড়িবার যোগ্যতা আছে কি না। শুনিয়া সকলে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। একজনও পুনরাবৃত্তি করিতে পারিল না। তখন আমি বলিলাম, শুন! তোমরা আমার নিকট এ সমস্ত বিষয়ের তাকরীর শুনিয়াও পুনরাবৃত্তি করিতে পারিলে না। আর যদিও আমার ওস্তাদ এই সবকটি পড়াইবার সময় এ সমস্ত তাক্রীর করেন নাই বা আমাকে এ সমস্ত বিষয় বলিয়া দেন নাই অথচ আমি তোমাদের সম্মুখে তাক্রীর করিয়া দিলাম, ইহার কারণ কি ? বুঝা গেল, প্রতিভার প্রয়োজন, তাহা শুধু কিতাব পড়িলেই অর্জিত হইয়া থাকে। এ সমস্ত অতিরিক্ত তাক্রীরে কোনই ফায়দা হয় না। অতএব, কিতাব পড়। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল।

আর শুধু কিতাব বুঝাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট বলিয়া মনে করার উদ্দেশ্য এই যে, শিক্ষকের পক্ষে বক্তৃতার ঢং অবলম্বন করা খুবই ক্ষতিকর। আমি একজন তালেবে এল্মকে দেখিয়াছি, সে জনৈক প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে 'মীযান' পড়াইতেছিল এবং উহার হাম্দ ও নাআতের মধ্যে নির্দিষ্টতা সূচক ال-এর বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিতেছে। আমি বলিলাম, মৌলবী ছাহেব! এই বেচারার পড়ার পথ কেন বন্ধ করিতেছ ? বেচারা তোমার বর্ণিত এ সমস্ত বিষয়কে 'মীযান' কিতাবের অংশ মনে করিবে এবং কঠিন মনে করিয়া 'মীযান'-ই ত্যাগ করিবে। আমি সর্বদা এই নিয়মেই পড়াইয়া থাকি যে, শুধু মূল কিতাব ভালরূপে বুঝাইয়া দেই। অতিরিক্ত কিছুই কোনো সময় বর্ণনা করি না এবং বুঝানও এমন ভাবে বুঝাইয়া থাকি যে, অতি কঠিন সবকও তালেবে এল্মগণ কোন সময় কঠিন বলিয়া মনে করে নাই।

'সদ্রা' কিতাবে 'মুসান্নাত্ বিততাক্রীরের' মাস্আলা বড় কঠিন বলিয়া বিখ্যাত। কানপুর শহরে মৌলবী ফযলে হকনামে একজন তালেবে এলম আমার নিকট 'সদরা' কিতাব পড়িতেন। যে দিন এই সবক আসিল, তখন আমি কোন গুরুত্ব না দিয়া সাধারণ ভাবে উহা বর্ণনা করিয়া দিলাম। তিনি উহা ভালরূপে বুঝিয়া লইলে আমি বলিলাম, ইহা সেই সবক যাহা 'মুসান্নাত বিত্তাক্রীর' নামে মশহুর। ইহা শুনিয়া

তিনি খুব বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, ইহা তো কঠিন কিছুই নহে। অবশেষে বার্ষিক পরীক্ষায় পরীক্ষক এই স্থানটুকুই প্রশ্ন করিলেন। মৌলবী ফযলে হক মরহুম সেই প্রশ্নের যে উত্তর লিখিলেন, পরীক্ষকরাও তাহা দেখিয়া বাঃ বাঃ করিতে লাগিলেন। (জামেউল উলুম মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে সেই উত্তরটি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।) কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন, এই মুশ্‌কিল স্থানটুকুর এমন সুন্দর তাক্‌রীর আর কখনও দেখি নাই। অতএব, আমি বলি, খুব চেষ্টা এজন্য থাকা উচিত যাহাতে কিতাবকে পানির মত সরল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়, নিজের বাহাদুরী প্রকাশের চেষ্টা থাকা উচিত নহে, এই তো বলিলাম, "হাতিয়ার" বা সহায়ক শ্রেণীর কিতাব পড়াইবার প্রণালী।

এখন বাকী রহিল "মাকাসেদ" অর্থাৎ, এল্‌মে দ্বীনের কিতাব, তাহা যেহেতু কোন কোন সময় সাধারণ লোকের সম্মুখেও বয়ান করিতে হয় এবং কোন কোন সময় খাছ তালেবে এল্‌মদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতে হয়; সুতরাং দ্বীনী এল্‌ম সম্বন্ধে উভয় প্রণালীর তাকরীরেরই অভ্যাস করা আবশ্যক। ইহার দুইটি উপায় আছে। হয়ত প্রত্যেক জলসার অর্ধেক সময় খাছ প্রণালীর জন্য আর অর্ধেক সময় সাধারণ প্রণালীর জন্য রাখা হউক। অথবা এরূপ করা যাইতে পারে যে, একদিন খাছ প্রণালী অনুযায়ী তাক্‌রীর হইবে আর একদিন সাধারণ প্রণালী অনুযায়ী তাক্‌রীর হইবে। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্! এখন ইহা সম্বন্ধে সমস্ত জরুরী কথাগুলির বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। কেবল এতটুকু কথা বাকী রহিয়াছে যে, মজলিসটির নাম কি রাখা হইবে। অতএব, আমার মতে ইহার নাম "তালীমুল বয়ান" রাখাই উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

॥ নূতন খামখেয়ালী ॥

আজকাল মানুষের ইহাও একটি নূতন খামখেয়ালী খুব প্রসার লাভ করিয়াছে যে, কোন কাজ আরম্ভ করিলে উহার জন্য কোন নূতন ও অভূতপূর্ব নাম আবিষ্কার করিতে হইবে। এই খামখেয়ালীর দরুনই 'নোদওয়াহ্' একটি বড় ভুল করিয়া বসিয়াছে; অর্থাৎ নূতন নাম তালাশ করিতে যাইয়া আলেমদের মজলিসের নাম "নোদওয়াহ্" বিবেচনা করা হইয়াছে। অথচ ইহা জাহেলদের নেতা, আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন, আবু জাহ্‌লের সেই মজলিসের নাম ছিল যাহার ভিত্তি শুধু এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, উহাতে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর ক্ষতি করা এবং তাঁহার ধর্মের প্রচার বন্ধ করার উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ ও চিন্তা করা। বিচিত্র নহে যে, আজ 'নোদওয়াতে' যে পবিত্র নূর বর্ষিত হইতেছে (?) তাহা এই নামেরই প্রভাবে বটে। (কিন্তু নোদওয়াহ্ যে বড় বড় ওলামা উৎপন্ন করিয়াছে, তাঁহারা এই আশঙ্কা দূর করিয়া দিয়াছেন।)

এখন বয়ানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি হাদীস বর্ণনা করা ভাল মনে করি। হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন :

مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوبَ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ۞

দেখুন, তৎকালে এই প্রকারের কোন সমিতিও ছিল না, মজলিস বা সভার এরূপ পদ্ধতিও ছিল না, কিন্তু হুযুর (দঃ) ইহার শৃঙ্খলা বিধানের তা'লীম তখনই দিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি বিভিন্ন পদ্ধতির কথা এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে যে, উহার সাহায্যে মানুষের হৃদয় বশ করিবে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কোন নফল কিংবা ফরয এবাদৎ কবুল করিবেন না।" এই হাদীসটি যে কোন কাজে অসদুদ্দেশ্য থাকিলে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য খুবই যথেষ্ট এবং ইহাতে এলমে বয়ানের উপর এলমে কোরআনকে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্য আরও অধিক পরিষ্কার হইয়া গেল, যাহা আমি পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছি।

আমি সে সমস্ত তালেবে এল্‌মকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যাহারা বক্তৃতার নূতন পদ্ধতি নিজেদের তাক্‌রীরের মধ্যে অবলম্বন করিতেছে যাহার উদ্দেশ্য বেশীর ভাগ ইহাই যে, তাহাতে সম্মান, মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা লাভ হইবে। এই কারণেই তাহারা চেষ্টা করে যেন শব্দগুলি জঁাকাল এবং বাক্য বিন্যাস চাতুর্যপূর্ণ হয়। অথচ ইহাতে ছাই মাটিও লাভ হয় না।

এই শ্রেণীর তাকরীরের অস্তিত্ব শুধু ততটুকুই হয় যেমন ঘটনা মশ্‌হুর আছে যে, এক চুড়ি বিক্রেতা চুড়ির গাঠুরী লইয়া যাইতেছিল। জনৈক গ্রাম্য লোক উহাতে লাঠির আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ইহাতে কি ? সে উত্তর করিল, আর একটি আঘাত করিলে ইহা কিছুই নহে।

পক্ষান্তরে পুরাতন পদ্ধতির তাকরীরে যদি পঞ্চাশটি আঘাতও কর তথাপি উহা নিজের অবস্থায়ই থাকিবে কোন পরিবর্তন হইবে না। উহার ক্ষমতায় বা ক্রিয়ায় একটুও কম্পন আসে না ; বরং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নিতান্ত বে-পরোয়াভাবে এবং স্বাধীনভাবে তাকরীর করাও নিন্দনীয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে :

اَلْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ ۞

"লজ্জা এবং থামিয়া থামিয়া কথা বলা ঈমানের দুইটি শাখা। আর বাজে বকা ও অনর্গল বলিয়া যাওয়া মোনাফেকীর দুইটি শাখা।"

এই হাদীসে হুযুর (দঃ) حياء অর্থাৎ, লজ্জাকে بذاء অর্থাৎ, আজে বাজে বাক্য এবং عي কে বয়ানের মোকাবেলায় উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, حياء লজ্জা ও عي

অর্থাৎ, থামিয়া থামিয়া কথা বলাকে একই সঙ্গে ঈমানের শাখাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আর بذاء অর্থাৎ, আজেবাজে বকা ও অনর্গল বলিয়া যাওয়াকে মোনাফেকীর শাখা বলিয়াছেন। এই ধরণে বুঝা যায় যে, থামিয়া থামিয়া বলা বলিতে এখানে তিনি লজ্জার কারণে থামিয়া থামিয়া বলাই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। আর লজ্জা শব্দটি ব্যাপক তাহা মানুষের লজ্জাই হউক কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি লজ্জাই হউক। কিন্তু এখানে আল্লাহ্র প্রতি লজ্জাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, প্রতিটি শব্দে বিবেচনা করে যে, পাছে শরীয়তের খেলাফ কোন কথা মুখ দিয়া বাহির না হয়। এই হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, যে তাক্‌রীর শরীয়তের সীমা ছাড়াইয়া যায়, তাহা দ্বীনী ওয়াযের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, আয়াতে যে, বয়ান বা ওয়াযের কথা উল্লেখ রহিয়াছে তাহা নেয়ামতরূপে উল্লেখ হইয়াছে। আর হাদীসে সেই বয়ানকে মোনাফেকীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যাহার উদ্দেশ্য বেপরোয়া বাজে বকা এবং কোরআন ও হাদীসে বিরোধ হইতে পারে না। অতএব, বুঝা গেল যে, যে বয়ান নিন্দনীয় তাহা নেয়ামত হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ বয়ান হইতে দূরে থাকার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

এখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ পালনের তাওফীক আমাদিগকে দান করেন।

آمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْن -

—)❋(—

এল্‌ম্ ও আ'মলের ফযীলত

(فضل العلم و العمل)

হিজরী ১৩৩০ সনের ২৬শে রজব তারিখে সাহারানপুর মুযাহেরুল উলূম মাদ্রাসার দারুত্তোলাবায় প্রায় এক হাজার লোকের মজলিসে দাঁড়াইয়া হযরত থানবী (রঃ) এল্‌ম্ ও আমলের মরতবা সম্বন্ধে পৌনে তিন ঘণ্টা ব্যাপী এই ওয়ায করিয়াছিলেন। মাওলানা সাঈদ আহমদ থানবী তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

০

নাফরমানীর সহিত আরাম এবং ইয্‌যৎ নাই। ফরমাঁবরদারীর সহিত কষ্ট এবং অপমান নাই। অতএব, আমরা যদি ইয্‌যতের প্রত্যাশী হই, তবে আল্লাহ্ তা'আলার ফরমাঁবরদারী করা আবশ্যক। আমরা যখন হইতে ইহা ছাড়িয়া দিয়াছি তখন হইতেই আমাদের মর্যাদা ও শান্তি লোপ পাইতে চলিয়াছে।

০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -

اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

॥ একটি বিশেষ নির্দেশ ॥

এখন যে আয়াতটি তেলাওয়াত করিলাম, যদিও তাহাতে বিশেষ স্থান সম্পর্কে একটি বিশেষ মষ্‌মূন বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ, এখানে একটি বিশেষ কাজের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে কোন একটি বিশেষ অবস্থায়; কিন্তু উহার বিনিময়ে যে ফলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহার ভিত্তির উপর দৃষ্টি করিলে একটি সাধারণ নিয়ম উৎপন্ন হয়। তাহা মনে জাগরূক রাখা প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, বিশেষ করিয়া এই যুগে। যখন ব্যাপকভাবে মানুষের মত বিভিন্ন এবং মতাবলম্বী লোকের মধ্যে প্রত্যেকের মত পৃথক পৃথক। এই কারণেই এখন আমি এই আয়াতটি অবলম্বন করিয়াছি। তরজমার দ্বারা সেই খাছ বিষয়টি এবং একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে সেই ভিত্তি জানা যাইবে। অতঃপর উহা হইতে যে সাধারণ নিয়মটি আবিষ্কৃত হয় উহার বর্ণনা করিয়া দিব।

আয়াতের তরজমা এই—"হে মুসলমানগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিসের মধ্যে স্থান সংকুলন করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান সংকুলন করিয়া দিও, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য জায়গা বিস্তৃত করিয়া দিবেন। আর যদি তোমাদিগকে বলা হয় যে, উঠিয়া যাও, তখন তোমরা উঠিয়া যাইও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে মোমেন এবং আলেমদের বহু দরজা উন্নত করিয়া দিবেন।" অর্থাৎ, যখন কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে মজলিসের এন্তেযামকারীর পক্ষ হইতে এরূপ নির্দেশ প্রদান করা হয়, তখন তদনুযায়ী আমল করিও। এই "এন্তেযাম-কারী" শব্দটি ব্যাপক, নবী হউক কিংবা নবী ছাড়া অন্য কেউ হউক; যে কেহ মজলিসের এন্তেযামকারী হউক না কেন। এই কারণেই قيل "যদি বলা হয়" বলা হইয়াছে। নির্দেশ প্রদানকারীকে নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। আল্লাহ্‌তা'আলা তোমাদের সর্altবিধ আমলের খবর রাখেন। অর্থাৎ, তিনি ঐসমস্ত কাজের আভ্যন্তরীণ খবরও রাখেন। তাফ্‌সীরকারগণ خبير "খাবীর" শব্দের তাফ্‌সীরে সেই আভ্যন্তরীণ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই হইল আয়াতের তরজমা।

তরজমার সাথেই ভাল মনে হয় যে, আয়াতটির শানে-নুযূলও জানিয়া লওয়া হউক। কেননা, মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে উহা দ্বারা সাহায্য হইবে এবং তাফ্‌সীরও সহজবোধ্য হইয়া যাইবে।

॥ কারণ ও যুক্তি ॥

এই আয়াতটির শানে-নুযূল এই যে, হুযুর (দঃ) কোন এক মজলিসে অবস্থিত ছিলেন। অনেক ছাহাবী (রাঃ)ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে তথায় বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী কয়েকজন ছাহাবী (রাঃ) তশ্‌রীফ আনিলেন। তাঁহাদের

ফযীলত অনেক বেশী। তখন মজলিসে স্থানের কিছু অভাব ছিল। হুযুর (দঃ) হাজিরান মজলিসকে আদেশ দিলেন ঃ "গায়ে গায়ে মিলিয়া বস," অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, হুযুর (দঃ) বলিলেন ঃ "তোমরা উঠিয়া যাও। তোমাদের অন্য কোন কাজে যাইয়া মশ্‌গুল হও," অথবা "উঠিয়া অন্যত্র বস," এই উভয় রেওয়ায়তের মধ্যে কোন বিরোধ নাই ; বরং পূর্ণ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিলে উভয় হাদীসের সমষ্টিগত অর্থই বুঝায়। সম্ভবতঃ তিনি কতক লোককে উঠিয়া যাইতে এবং অবশিষ্ট লোককে গায়ে গায়ে মিশিয়া বসিতে বলিয়াছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম তো হুযূরের মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকিতেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত হুযুর (দঃ)-এর নির্দেশ পালন করিলেন। কিন্তু মোনাফেকেরা এরূপ সুযোগের জন্যই সর্বদা ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত। ইহাতে তাহারা প্রতিবাদ করিল। তাহারা যেন হুযূরের দোষ বাহির করিবার এক সুবর্ণ সুযোগ পাইল। অথচ ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, এই ব্যবস্থায় হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরম সৌজন্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা, তিনি বিশিষ্ট ও সাধারণ নির্বিশেষে সকল সত্যান্বেষীর প্রতিই কেমন সুন্দর লক্ষ্য রাখিয়াছেন। স্থানাভাবের জন্য কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। কিন্তু দোষান্বেষীর চোখে গুণও দোষরূপেই প্রকাশ পায় ঃ

چشم بد اندیش کہ برکندہ باد + عیب نماید ہنرش در نظر

"দোষান্বেষীর চক্ষু উপ্‌ড়াইয়া ফেলা উচিত। কেননা, তাহার দৃষ্টিতে গুণও দোষ বলিয়াই প্রকাশ পায়।"

মোনাফেকেরা প্রশ্ন করার সুযোগ পাইল। বলিল, ইহা কেমন কথা! নবাগতদের খাতিরে পূর্ব হইতে উপবিষ্ট লোকদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইবে? আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রশ্নের উত্তরে এই আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন। আয়াতটির সারমর্ম এই ঃ "প্রশ্নটি এই কারণে অর্থহীন যে, হুযূরের উভয় নির্দেশই সঙ্গত এবং সুন্দর ছিল। সুন্দরকে অসুন্দর বলা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নহে। আর হুযুরের নির্দেশের সৌন্দর্য এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাও ঠিক সেই হুকুমই করিরাছেন যাহা হুযুর করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাহা হুকুম করেন তাহা কখনও মন্দ হইতে পারে না। যৌক্তিক প্রমাণেও না, কিতাবী প্রমাণেও না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও মন্দ কাজের হুকুম করেন না।" হুযূরের দেওয়া নির্দেশটি যখন আল্লাহ্ তা'আলাও দিয়াছেন, কাজেই তাহা ভাল ও সুন্দর। কেননা, ইহা এমন সত্তার নির্দেশ যাঁহার সমান জ্ঞানী কেহই নহে। আবার প্রত্যেকটি হুকুমের এক একটি উদ্দেশ্যমূলক ফলও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে উক্ত নির্দেশের সৌন্দর্য আরও অধিক প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন, হুকুম ও উহার ফল এতদুভয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا

"যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করিয়া দিও।"

একটি হুকুম সংক্রান্ত আদেশবাচকরূপ এই আয়াতেই উল্লেখ আছে। অতঃপর বলেন, يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ইহা উক্ত হুকুমের ফল, ইহার সারমর্ম এই যে, যদি তোমরা এই নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তে তোমাদের স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন। এই পর্যন্ত প্রথম হুকুমটি এবং উহার ফল বর্ণিত হইয়াছে।

সম্মুখে সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে দ্বিতীয় হুকুমটি বর্ণনা করিতেছেন : وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا "আর যদি তোমাদিগকে বলা হয়, উঠিয়া যাও, তবে তোমারা উঠিয়া যাইও।" নির্দেশ দুইটি সুন্দর ও সঙ্গত হওয়ার কিতাবী প্রমাণ তো এই আয়াতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার যৌক্তিক সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ এই যে, মজলিসের কর্তা যখন উপযুক্ত লোক হন এবং এরূপ নির্দেশ দেন, তবে বুঝিতে হইবে তাহা কোন মঙ্গলের জন্য দিয়া থাকিবেন। অতএব, উহা পালন করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। এখানে আমি হুযূরকে খাছ না করিয়া সকল সভাপতির কথা এইজন্য বলিয়াছি যে, কোরআনেও قِيلَ শব্দ আসিয়াছে। উহা সকল সভাপতির উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতএব, এরূপ সন্দেহ কেহ করিতে পারেন না যে, "এই ঘটনাটি হুযূর (দঃ) এর সহিত খাছ।" কেননা, নির্দেশটি যদিও হুযূরই (দঃ) দিয়াছিলেন ; কিন্তু হুযূর (দঃ) যেরূপ প্রয়োজনের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এইরূপে যিনি পূর্ণ যোগ্যতা সহকারে হুযূরের নায়েব বা প্রতিনিধি হন, তিনিও এরূপ প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতে পারেন এবং তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা সেইরূপই ওয়াজেব হইবে যেমন হুযূর (দঃ)-এর নির্দেশ পালন করা ওয়াজেব হইয়াছিল। সুতরাং হুযূরের কোন যোগ্য প্রতিনিধিও যদি তদ্রূপ উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন, তবে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার নির্দেশ মান্য করিতে কোন প্রকার লজ্জা বা সংকোচ করা উচিত হইবে না। কেননা, সাময়িক সুবিধা বা প্রয়োজনের জন্য এরূপ করিতে হয়।

॥ লাভবান হওয়ার উপায় ॥

ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, এ সমস্ত হুকুমের সারকথা হইল পালাক্রমে উপকৃত হওয়া। পালাক্রমে কাজ শরীয়ত বিধানেও প্রশংসনীয়। অর্থাৎ, যদি কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বহুলোক শরীক থাকে এবং উহা সফল করিতে সকল প্রার্থীর স্থান এক মজলিসে সংকুলান না হয়, তবে শরীয়ত উহার জন্য পালাক্রমে কাজ সমাধা করার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বিবেকও এরূপক্ষেত্রে একথারই অনুকূলে বলে যে, সমস্ত

প্রার্থীর পূর্ণ জ্ঞানলাভের ইহাই একমাত্র উপায় যে, পরস্পর একমত হইয়া পালাক্রমে জ্ঞানলাভ করুক। আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন।

যেমন, একটি মাত্র কূপ। শহরের প্রত্যেকটি অধিবাসীই এই কূপের পানির মুখাপেক্ষী। কিন্তু সকলে এক সঙ্গে এই কূপ হইতে পানি ভরিতে পারে না। এমতাবস্থায় সকলে এই কূপ হইতে পানি পাওয়ার ইহাই একমাত্র উপায় হইতে পারে যে, একের পর এক করিয়া সকলে পানি গ্রহণ করিবে। এক সঙ্গে চারি জনের এই অধিকার নাই যে, তাহারা কূপের উপর শক্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে আর কাহাকেও স্থান দিবে না।

ইহা এমন এক দৃষ্টান্ত যাহার সমর্থনে কাহারও মতভেদ নাই। অতএব, পার্থিব কাজে স্বার্থ লাভের ব্যাপারে পালাক্রমে কাজ করা সর্বজনস্বীকৃত, এইরূপ ধর্মীয় স্বার্থের বেলায়ও সকলের লাভবান হওয়ার ইহাই উপায়। পালাক্রমে সকলেই লাভবান হইবে।

এই দৃষ্টান্তটির প্রায় কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। তাহা তত পরিষ্কার না হইলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী। কোন মাদ্রাসায় যদি একজন মাত্র মুদাররেস হন এবং শিক্ষা লাভের জন্য মাদ্রাসার প্রত্যেকটি ছাত্রই তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট হইতে উপকার লাভের প্রত্যাশী। কেহ বোখারী শরীফ পড়িতে চায়, কেহ মুসলিম শরীফ, কেহ মান্তেক, কেহ দর্শন ইত্যাদি। এখন যদি বোখারীর ছাত্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে আর কাহাকেও স্থান না দেয়, তবে অন্যান্য ছাত্রদের শিক্ষা লাভের কোন উপায়ই নাই। এই কারণেই বোখারীর ছাত্রদের এরূপ বেষ্টন করিয়া রাখার অধিকার নাই; বরং অন্যান্য জমা'আতের ছাত্রদের জন্যও সময় দেওয়া আবশ্যক।

এসমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন যে, পার্থিব এবং ধর্মীয় স্বার্থে যদি প্রত্যাশীদের একত্র সমাবেশ সম্ভব না হয়, তবে পালা করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ নিতান্ত যুক্তি সঙ্গত ছিল। কেননা, تَفَسَّحُوْا এবং اُنْشُزُوْا নির্দেশ দুইটি ব্যাপক। কতক লোকও হইতে পারে বা সকলেও হইতে পারে। অতএব, যদি সকলকে উঠিয়া যাইতে বলিয়া থাকেন, তবে সকলের পক্ষেই উঠিয়া যাওয়া ওয়াজেব। এখানে এরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে না যে, এই মজলিসের ভিত্তি ছিল সকলকে ফায়দা পৌঁছানের উপর। সকলকে উঠাইয়া দিলে তো সকলেই বঞ্চিত হইয়া গেল। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, ইহাতেও সকলেই উপকৃত হইতে পারে যে, হয়ত নির্জনে থাকিয়া হুযুর (দঃ) সর্বসাধারণের মঙ্গলজনক কোন চিন্তা করিবেন, কিংবা বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন, যাহাতে পুনরায় সকলের হিতসাধনের জন্য নূতন উদ্যম লাভ করিতে পারেন। ইহাতেও তো

সকলেরই মঙ্গল হইল। এইরূপে অন্য কোন সভাপতিও যদি এরূপ প্রয়োজনের সম্মুখীন হন যে, কোন মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে মজলিসের কতক লোককে কিংবা সকল লোককে উঠিয়া যাইতে বলেন, তবে তিনিও এরূপ বলিতে পারেন যে, এখন তোমরা উঠিয়া যাও। নির্দেশদাতা তেমন নির্দেশ প্রদানের উপযুক্ত হইলে উহাকে মঙ্গল-জনকই মনে করিতে হইবে এবং তাহা পালন করাও ওয়াজেব হইবে।

সুতরাং মোনাফেকদের এই অভিযোগের ভিত্তি শুধু ব্যক্তিগত হিংসার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা শুধু ঘৃণা ও লজ্জার খাতিরেই হুযূরের নির্দেশ মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল। বস্তুতঃ এমনও কতক স্বভাব আছে যাহারা এরূপ নির্দেশকে নিজেদের জন্য অপমানকর মনে করিয়া থাকে।

এখন আমার নিজস্ব একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। প্রথম বয়সে অর্থাৎ, যখন আমি সবে মাত্র বালেগ হইয়াছি, তখন একবার আমাদের মসজিদে নামাযের ইমামতি করিবার জন্য দাঁড়াইলাম। কাতারের মধ্যে ডান দিকে মানুষ অধিক হইয়া গিয়াছিল এবং বাম দিকে ছিল কম। আমি ডান দিকের একজন লোককে বলিলাম, আপনি বামদিকে আসুন। ইহা শুনিয়া তিনি এত রাগান্বিত হইলেন যে, চেহারা লাল হইয়া গেল। মুখে কিছু বলিলেন না বটে ; কিন্তু চেহারায় রাগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। অথচ ইহা কোন রাগের কথা ছিল না। কাতারের শৃঙ্খলা করাকে শরীয়তেও নিতান্ত জরুরী বলা হইয়াছে।

তাঁহার এই আচরণ আমারও অপছন্দ হইয়াছিল। অবশেষে আমি তাঁহার নিকটস্থ একজন লোককে বলিলাম। ভাই আপনিই এদিকে আসিয়া পড়ুন। কেননা, তাহার তো মানহানি হইবে। ইহাতে তো তিনি এত রাগান্বিত হইলেন যে, কাতার হইতে সরিয়া গিয়া একেবারে মসজিদ ছাড়িয়াই চলিয়া গেলেন। অতএব, বলিতেছি কতক স্বভাব এমনও আছে যাহারা অপরের নির্দেশ পালন করাকে অপমানকর মনে করে। তদ্রূপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিলে এবং তাহাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। এই কারণেই এই আয়াতটি দ্বারা এই আইন স্থায়ীভাবে জারী করিয়া দেওয়া হইল। অন্যথায় বাহ্য দৃষ্টিতে এরূপ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল না। কেননা, ইহা এমন পরিষ্কার কথা যাহা দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। সুস্থ স্বভাব ইহাই কামনা করে। কিন্তু এই ধরণের স্বভাবের কারণেই এরূপ আইন স্থির করিয়া দিয়াছেন যেন ওয়াজেব মনে করিয়া পালন করিতে হয় এবং উহার নির্দেশও দিয়াছেন। নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথে উৎসাহও দিয়াছেন যেন কেহ ভয়ে পালন করে এবং কেহ আগ্রহে পালন করে। কেননা, স্বভাবও দুই প্রকারেরই হইয়া থাকে। কোন কোন স্বভাবের উপর ভয়ের ক্রিয়া অধিক হয় আর কতক স্বভাবের উপর উৎসাহ প্রদানের ক্রিয়া অধিক হয়, যেমন আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখিতে

পাইতেছি। কোরআনের মজা সেই ব্যক্তি অধিক পায় যাহার দৃষ্টি দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রতি থাকে এবং তাহাতে সে গভীর ভাবে চিন্তাও করে। যেমন, যদি সেই বড় মিঞার ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর না হইত, তবে এই হুকুমটি শরীয়তের বিধিবদ্ধ হওয়ার হেকমত বুঝিবার মজা উপভোগ করিতে পারিতাম না। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কেমন সুন্দর ও উত্তম শৃঙ্খলা করা হইয়াছে! সামান্য বিষয়ও ছাড়েন নাই;

মোটকথা, এই ধরণের ঘটনা পাছেও ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও ঘটিবে। কাজেই এই আইনটি স্থায়ীভাবে জারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই আইন মান্য করার ফল ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "আমি তোমাদের জন্য বেহেশ্‌তে স্থান প্রশস্ত করিয়া দিব।" আর দ্বিতীয় আদেশ এই করিয়াছেন—"যদি উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন, তবে উঠিয়া যাইও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও আলেমদের মরতবা উচ্চ করিয়া দিবেন।" এই হইল হুকুমের সারমর্ম। এই তাকরীরে আপনারা আয়াতের শানে-নুযুলও জানিতে পারিলেন এবং আয়াতের সারমর্মও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাতে হুকুম এবং উহা পালনের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

এখন আমি সেই কথা বর্ণনা করিতেছি যাহা এখন বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য। আমি বলিয়াছিলাম—এই হুকুমের ফলের একটি ভিত্তিস্থল আছে। উহাতে চিন্তা করিলে আপনারা সেই ব্যাপক নিয়মটি জানিতে পারিবেন। যাহা সর্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখা একান্ত আবশ্যক। অতএব, লক্ষ্য করুন এখানে একটি হুকুম تَفَسَّحُوْا (স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও) এবং উহার ফল يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ, বেহেশ্‌তে তোমাদের স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। আর দ্বিতীয় হুকুমটি فَانْشُزُوْا অর্থাৎ, "উঠিয়া যাও।" আর উহার ফল বলা হইয়াছে, يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও আলেমদের মরতবা উচ্চ করিয়া দিবেন।" ইহার মধ্যে চিন্তা করার বিষয় এই যে, সভাপতির নির্দেশানুসারে মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দিলে বেহেশ্‌তে স্থান প্রশস্ত কেন করিয়া দেওয়া হইবে? আর মজলিস হইতে উঠিয়া গেলে মরতবা উচ্চ কেন হইবে? যাহার কিছু মাত্র জ্ঞান আছে, সে তো কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়াই এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবে, "ইহার ভিত্তি এই যে, সে খোদা ও রাসূলের হুকুম মান্য করিয়াছে। কেননা, হুযূরের হুকুম খোদার হুকুম। আর ধর্মীয় নেতার হুকুমও খোদা ও রাসূলেরই হুকুম। কেননা, আল্লাহ্ই বলিয়াছেন, 'ধর্মীয় নেতার আনুগত্য করিও।' অতএব, আমরা যদি ধর্মীয় মজলিসের নেতার নির্দেশ পালন করি, তবে খোদারই হুকুম পালন করিলাম। মোটকথা, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ফল এই দাঁড়াইবে যে, মজলিসের নেতার নির্দেশ পালনকারী খোদা ও রাসূলেরই নির্দেশ পালনকারী। কাজেই সে এই ফল লাভ করিয়াছে।

অতএব, এখন এই বিষয়টি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, খোদা ও রাসূলের ফরমাঁবরদারী করিলে এই দুইটি ফল পাওয়া যায়। এতদসঙ্গে আরও বিষয় যদি আসিয়া পড়ে, তবে ইহার পরিপূরক হিসাবেই ইহার সম্প্রসারণের জন্য আসিবে। কিংবা কোন কোনটি ইহার উপর বর্তিবে।

॥ নব্য শিক্ষার অপকারিতা ॥

একটি কথা এই রহিল যে, এখন আমি এই বিষয়টি অবলম্বন করিলাম কেন? এ সম্বন্ধে আমি প্রথমে বলিয়াছি আজকাল এই বিষয়টির বিশেষ প্রয়োজন। কেননা, এই যুগে মানুষের খেয়াল ও মত বিভিন্নরূপ। সম্পদের অন্বেষণ এবং মান-মর্যাদার কামনারই খুব চর্চা। যাহার দিকে দৃষ্টি করিবেন তাহাকেই দেখিবেন ইহাতে মগ্ন। এই ধন-সম্পদ এবং মান মর্যাদা লাভের জন্য নানাবিধ তদ্‌বীরও নিজেদের তরফ হইতে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। ঐ সমস্ত তদ্‌বীরে এ দিকে লক্ষ্য করা হয় না যে, কোন্ তদবীর হালাল আর কোন্ তদবীর হারাম। অধিকাংশ খেয়াল এদিকেই আকৃষ্ট রহিয়াছে যে, আসল বস্তু ধন-দৌলত ও মান-সম্মান। ইহা প্রচুর পরিমাণে লাভ করাকেই উন্নতি বলা হয়। ইহার জন্যই চেষ্টা করা হয়। সেই চেষ্টা শরীয়ত অনুরূপ হউক বা উহার বিরোধী হউক সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ধন-সম্পদ অর্জনের এমন সব উপায় অবলম্বন করা হয়, যাহার বদৌলতে শরীয়ত হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

যেমন, তাহারা মনে করে, আধুনিক শিক্ষা পুর্ণরূপে অর্জন করা উচিত এবং ইহাতে বড় বড় ডিগ্রী লাভ করিতে হইবে তাহাতে যেমনই কুফল ফলুক না কেন, এ বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। আজকাল আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলেমদেরে প্রশ্ন করা হইয়া থাকে যে, তাহারা আধুনিক শিক্ষার বিরোধী এবং উহাকে না জায়েয বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, যদি আধুনিক শিক্ষার এ সমস্ত কুফল না হইত যাহা আজকাল দেখা যাইতেছে, তবে আলেমগণ কখনও ইহার বিরোধিতা করিতেন না। কিন্তু এখন দেখুন, কি অবস্থা হইতেছে, আধুনিক শিক্ষিত যত আছেন দুই একজন ছাড়া আর সকলেরই অবস্থা এই যে, রোযা নামায কিংবা শরীয়তের অন্য কোন বিধানের সহিত তাহাদের সম্পর্কই নাই; বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে শরীয়তের বিরুদ্ধেই চলিতেছে। তদুপরি বলিয়া থাকে—ইহাতে ইসলামের উন্নতি হইতেছে।

বন্ধুগণ! যখন তাহাদের মধ্যে ইসলামের কিছুই রহিল না, তখন ইস্‌লামের উন্নতি হইল কোথায়? অবশ্য ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার উন্নতি হইয়াছে। ইসলাম তো টাকা-পয়সা এবং পদমর্যাদাকে বলা হয় না। খোদার শোক্‌র! হুযুর (দঃ) ইস্‌লামকে ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী রাখিয়া যান নাই এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও ইহার

ব্যাখ্যার প্রতি খুব গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। বিচিত্র নহে যে, এই যুগের উদ্দেশ্যেই এত গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার বিবরণ এই যে, অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম ভয়ে অনেক কথা হুযূর (দঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা একবার জিব্রায়ীল (আঃ)কে মানুষের আকৃতিতে হুযূর (দঃ)-এর নিকট পাঠাইলেন। তিনি এক সাধারণ মজলিসে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং উপস্থিত সকলকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে হুযূরকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, উক্ত প্রশ্নসমূহের মধ্যে একটি প্রশ্ন ইহাও ছিল—مَا الْاِسْلَامُ। "ইসলাম কি ?" হুযূর উত্তর করিলেন :

اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ

وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَاَنْ تَحُجَّ الْبَيْتَ -

"মনে মুখে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। আর নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, রমযান মাসের রোযা রাখা ও বয়তুল্লা শরীফের হজ্জ করা।" অতএব, হুযূর (দঃ)-এর ব্যাখ্যায় যখন ইস্‌লামের স্বরূপ জানা গেল, তখন ইস্‌লামের উন্নতি তো ইহাই হইবে যে, বর্ণিত নির্দেশসমূহ পালনে উন্নতি হয়, নামাযে উন্নতি হয়, রোযায় উন্নতি হয়। টমটম কিংবা প্রাসাদ তুল্য বাড়ী হইলে ইহাকে ইস্‌লামের উন্নতি বলা যাইবে না। মোটকথা, যখন হুযুর (দঃ) ইস্‌লামের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন কে সেই ব্যক্তি—যে বড় বড় পদ লাভ করা এবং ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা লাভ করাকে ইস্‌লাসের উন্নতি বলিবে ?

॥ ধন ও মানের উন্নতি ॥

মুসলমান যদি নিজের ধর্মীয় অবস্থার উপরই কায়েম থাকিত তথাপি ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদাকে ইস্‌লামের উন্নতি বলা যাইত না ; বরং মুসলমানদের উন্নতি বলা যাইত। কিন্তু যখন তাহারা ইস্‌লামের উপরে কায়েম নাই, তখন ইহাকে মুসলমানের আর্থিক উন্নতি বলা যাইবে না ; বরং কাফেরের আর্থিক উন্নতি বলা হইবে। অর্থাৎ যখন নামায, রোযা, ইস্‌লামী বিশ্বাস সব কিছুই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, এখন যদি ধন এবং মানের উন্নতিও হয়, তবে ইহাকে মুসলমানের উন্নতি বলা যাইবে না ; বরং কাফেরের উন্নতি বলা যাইবে। এই আর্থিক উন্নতিকে এমনিভাবে কল্পনা ও কামনার কেন্দ্রস্থল করিয়া রাখিয়াছে যে, হালাল হারামেরও কিছু মাত্র বাছ-বিছার নাই। সুদেই হউক আর ঘুষেই হউক ধন উপার্জন করা চাই। শরীয়তকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইলেও আপত্তি নাই, কিন্তু ধন হাতছাড়া হইতে পারিবে না। তাহাদের

মধ্যে কেহ কেহ এরূপ বলিয়া ফেলিয়াছে যে, এখন হারাম-হালালের প্রতি লক্ষ্য করার সময় নহে। এখন এমন সময় উপস্থিত, যেই প্রকারেই হউক টাকা সঞ্চয় কর। চিন্তা করুন, মুসলমান এরূপ মত প্রকাশ করিতেছে। তবে আলেমদের দোষ কি যদি তাহারা আধুনিক শিক্ষা হইতে বারণ করে ?

এইরূপে পদ-মর্যাদার উন্নতির বেলায়ও এই বিচার নাই যে, উহা লাভ করিবার পন্থা হালাল না হারাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন উপায়ে পদ-মর্যাদা লাভ করা হয় যাহা শরীয়তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি মজার কথা এই যে, পদের দ্বারা কাজও অপবিত্রই লওয়া হয়। কখন কখন পদ-মর্যাদাকে যুলুম ও অত্যাচারের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। আর সেই যুলুমকেই নিজের সরদারী ও কর্তৃত্বের শান মনে করিয়া থাকে। যেমন কেহ কেহ বলে : لَا رِيَاسَةَ اِلَّا بِالسِّيَاسَةِ "অর্থাৎ, শাসন ছাড়া সরদারী ও কর্তৃত্ব থাকে না।" এই বাক্যটি মূলে সত্যও বটে ; কিন্তু শাসনের অর্থ তাহা নহে যাহা ইহারা বুঝিয়াছে অর্থাৎ, যুলুম করা ; বরং শাসনের অর্থ সংশোধন। আর সংশোধন বলে, হুকুম জারী করাকে। যেমন, অন্য একটি আয়াতে বর্ণিত আছে— وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا "তোমরা সংশোধনের পরে যমিনে ফ্যাসাদ বিস্তার করিও না।" ইহার যথেষ্ট ব্যাখ্যা কোন একস্থানে এক স্বতন্ত্র ওয়াযে বর্ণনা করা হইয়াছে। ফলকথা, ধন ও পদ-মর্যাদাকে মানুষ মূল উদ্দেশ্যের স্তরে কামনার কেন্দ্রস্থল করিয়া লইয়াছে। এই রোগটি এখন বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই এখন এ বিষয়ে বয়ান করার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে দুইটি নির্দেশের দুইটি বিচিত্র ফল বর্ণনা করিয়াছেন যাহা এ যুগের উদ্দেশ্যের খুবই উপযোগী।

॥ মান এবং অপমানের কারণ ॥

يَفْسَحِ শব্দের অর্থ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া। ইহার সামঞ্জস্য আর্থিক উন্নতি ও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত। আর يَرْفَعِ শব্দের অর্থ মর্যাদা উচ্চ করিয়া দেওয়া। ইহার সামঞ্জস্য পদ-মর্যাদার উন্নতির সহিত। যেন আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই বলিয়াছেন যে, প্রশস্ততা এবং উন্নতি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ফরমাঁবরদারীর দ্বারাই হইতে পারে। অথচ আমরা বুঝিতেছি যে, শরীয়তের বিরোধিতা করিলেই স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে। পক্ষান্তরে শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিলে নাজায়েয চাকুরী ছাড়িতে হইবে, হারাম মাল হইতে দূরে থাকিতে হইবে, বস্ পাঁচ টাকা মাসিক আয়ের মোল্লা থাকিয়া যাইব। অতঃপর প্ল্যাটফরমেও যাইতে পারিব না, বিনা টিকেটে গাড়ীতেও ভ্রমণ করিতে পারিব না, কোন সম্মানও পাইব না, যেন দুনিয়ার সমস্ত ইয্‌যৎ প্ল্যাটফরমে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতএব, খোদা তা'আলা বলেন,

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান শুধু ফরমাঁবরদারী এবং এবাদতের দ্বারাই হাছিল হইতে পারে। আর যেহেতু ধন-দৌলতের পরিণতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আবার স্থানের প্রশস্ততাও এক নেয়ামত। কাজেই আমরা যদি এই বিষয়টিকে একটু সম্প্রসারিত করিয়া দেই, তবে কোন ক্ষতি নাই। অতএব, আমরা বলিব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ আর্থিক উন্নতি এবং মরতবা অর্থাৎ, পদমর্যাদার উন্নতি উভয় বস্তুই এবাদতের উপর নির্ভরশীল। এবাদৎ না হইলে আর্থিক উন্নতিও নাই, পদ-মর্যাদার উন্নতিও নাই; বরং অপমান এবং সঙ্কীর্ণতাই হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة اعمى *

"আমার যেকের হইতে যে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়াছে। সে সংকীর্ণ জীবিকা প্রাপ্ত হয়। আর কিয়ামতের দিন আমি তাহাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করিব।" এই আয়াতে হাশর-কিয়ামতের মুকাবেলায় সংকীর্ণ জীবিকা উল্লেখ করায় একথার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, এই সংকীর্ণ জীবিকা কিয়ামতের পুর্বে হইবে। তাহা কেয়ামতের পূর্ববর্তী আলমে বরযখেও হইতে পারে কিংবা দুনিয়াতেও হইতে পারে। অতএব, আয়াতে যখন খাছ করিয়া কোন আলমের কথা বলা হয় নাই, তখন ইহা উভয় জগতের জন্য ব্যাপক বলিতে হইবে। কেবল আলমে বরযখের সহিত খাছ করা হইবে না। বিশেষ করিয়া ঘটনাবলী যখন সাক্ষ্য দিতেছে যে, পাপের কারণে দুনিয়াতেও সংকীর্ণতা হইয়া থাকে। একটু পরেই আমি তাহাও বলিতেছি।

সারকথা, এবাদৎ না করিলে দুই প্রকারের শাস্তি হইবে। কিয়ামতের ময়দানে অন্ধ অবস্থায় উঠান হইবে। আর আলমে বরযখে ও দুনিয়াতে সংকীর্ণ জীবিকার সহিত দিনাতিপাত হইবে। অতএব, সচ্ছলতা ও আরাম শুধু এবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। অন্যথায় আলমে বরযখের সংকীর্ণতা তো আছেই। তাহা ছাড়া দুনিয়াতেও সংকীর্ণতা ভোগ করিতে হইবে।

॥ আরাম ও এবাদতের সম্পর্ক ॥

এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, আমরা তো দেখিতেছি, যাহারা এবাদৎ করে না তাহারাই তো অধিক সচ্ছল জীবন যাপন করিতেছে। ইহার উত্তর এই যে, আপনি যাহাকে সচ্ছলতা মনে করিতেছেন, ইহা শুধু বাহিরে দেখা যাইতেছে। অন্যথায় প্রকৃত অবস্থা দেখিলে বুঝিবেন, আসলে ইহা সচ্ছলতা নহে, নিতান্ত সংকীর্ণতা। এই জন্য আল্লাহ্ পাক বলেন:

ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا *

“তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে। আল্লাহ্ ইহাই চায় যে, এসমস্ত বস্তুর দ্বারা তাহাদিগকে ইহলোকেই শাস্তি দান করিবেন।” অতএব, মনে রাখিবেন, এবাদৎ না হইলে এসমস্ত ধন-দৌলত খোলস মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এরূপ ব্যক্তির অন্তরে সীমাহীন অশান্তি এবং সংকীর্ণতা বিরাজমান। কোন সময়েই সে অনাবিল শান্তি পায় না। কেননা, অনেক ঘটনাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়া থাকে। সন্তান আছে তাহারা মরেও, রোগাও থাকে। স্বয়ং মালদার ব্যক্তিও বহু মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া যায়, সময় সময় মাল চুরিও হয়। উহাতে আবার কখন কখন লোকসানও হয়, নানাবিধ কষ্টও ভোগ করিতে হয়। আর যেহেতু আরামপ্রিয়তা অত্যধিক বাড়িয়া যায় এবং অনেক ব্যাপার স্বভাবের বিরুদ্ধেও আসিয়া পড়ে। ইহা হ্রাস করার উপায়ও থাকে না (কেননা, আসল উপায় একমাত্র আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক)। সুতরাং তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। ইহার চেয়ে আরও পরিষ্কার করার জন্য আমি একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। মনে করুন, দুই ব্যক্তির দুইটি জোয়ান ছেলে মরিয়া গেল। উভয়েই সকল অবস্থার দিক দিয়া সমান, কিন্তু প্রভেদ শুধু এতটুকু যে, তাহাদের একজন খোদার ফরমাঁবরদার আর একজন খোদার নাফরমান এবং দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামে ও গাফলতে ডুবিয়া আছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, পুত্র-বিয়োগের শোক কাহার হৃদয়ে অধিক লাগিবে ? এই শোক কাহার হৃদয়ে অধিক স্থায়ী হইবে ?

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র অনুগত ব্যক্তির মনে অধিক শোক চিন্তা হইবে না। কেননা, সে মনে করিবে, هر چه آں خسرو كند شيريں بود “সেই মহান বাদশাহ্ যাহা কিছু করেন তাহাই আমার জন্য মধুর।” সে আরও জানে, আজই তাহার মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। কোন উপায়ে ইহার অন্যথা হইতে পারিত না। আর ইহাও সে বুঝে—এই পুত্র বিয়োগের জন্য পরকালেও আমি সওয়াব পাইব, এখনও সওয়াব পাইলাম। এ সমস্ত কল্পনার সাহায্যে তাহার হৃদয়ে অতি সত্বর সান্ত্বনা আসিয়া যায়। পক্ষান্তরে সেই নাফরমান বান্দা জীবন ভরিয়া শোক-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে। কোন সময় খেয়াল হইবে, আফসুস। অমুক হাকীম সাহেবকে ডাকিতে বিলম্ব হওয়ায় ছেলেটি মারা গেল। কোন সময় চিন্তা করিবে—অমুক ব্যবস্থা-পত্র অনুসারে ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে অবশ্যই রোগ আরোগ্য হইয়া যাইত।

ফলকথা, এই প্রকারের ধারাবাহিক চিন্তা তাহার জীবনের জন্য শিকড় বাঁধিয়া যায় এবং সারা জীবনের জন্য এক ধুন্ লাগিয়া যায়। অতএব, তাহার নিকট সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বাহ্যিক উপকরণ যদিও সবকিছুই বিদ্যমান, কিন্তু উক্ত উপকরণ তাহার মনের প্রফুল্লতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের পুঁজি নহে। কেননা, তাহার হৃদয় দুঃখে-শোকে সংকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উহা যেন তাহার হৃদয়ের জন্য এক কঠিন শাস্তি। এই রহস্যের

কারণেই আপনি কোন সংসারাসক্ত লোকের মনে কোন সময় শান্তি দেখিবেন না। ইহার কারণ এই যে, নাফরমানী করিয়া মনের শান্তি ভাগ্যে জুটিতে পারে না। অবশ্য আল্লাহুর ফরমাঁবরদার হইলে সে শান্তিতে থাকিবে যদিও সে আমীর না হউক। আর আমীর হইলেও তথাপি তাহার শান্তির কারণ তাহার তালুক মুলুক বা ধন-সম্পদ হইবে না ; বরং এবাদৎই তাহার শান্তির মূল কারণ হইবে। অতএব, শান্তির মূল কারণ এবাদৎ-বন্দেগী। এখন আর উক্ত সন্দেহ কাহারও মনে থাকিতে পারে না।

॥ সম্মান ও এবাদতের সম্পর্ক ॥

এইরূপে ইয্‌যতও এবাদৎ-বন্দেগীর দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু এসম্বন্ধেও মানুষ বড় ভুলের মধ্যে রহিয়াছে। কেননা, মানুষ আল্লাহুর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া উচ্চ মর্যাদা কামনা করে। মোটকথা, আল্লাহুর আনুগত্যে যদিও ধন-দৌলত অধিক হয় না, কিন্তু ধন্‌-দৌলতের মূল উদ্দেশ্য হাছিল হয়। অর্থাৎ, উপকারিতা ও সফলতা এবং ইয্‌যতের বা পদ-মর্যাদার মূল উদ্দেশ্য হাছিল হয় অর্থাৎ অনিষ্ট বা ক্ষতি হইতে রক্ষিত থাকে। কেননা, টাকা-পয়সা তো উপকার লাভের এবং স্বার্থ ভোগের জন্যই হইয়া থাকে। উহার সাহায্যে মানুষের কাজ-কর্ম খুব চলে। যেমন, টাকা পয়সার দ্বারা খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য খরিদ করা হয়। অতএব ধনের দ্বারা উহার উপকারিতা ভোগই উদ্দেশ্য। আর পদ-মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্য ক্ষতি ও অনিষ্ট প্রতিরোধ করা ; অর্থাৎ, উহার ফল এবং উহার উদ্দেশ্য এই ক্ষতিরই প্রতিরোধ। কেননা, জ্ঞানীদের মতে পদ-মর্যাদা শুধু এই উদ্দেশ্যে লাভ করা হয় যেন উহার সাহায্যে বহুবিধ আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কেননা, যদি সম্মানী লোক না হয়, তবে তাহাকে যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া ফেলে, যাহার মনে চায় ধরিয়া নিয়া বেগার খাটায়। পক্ষান্তরে সম্মানী লোককে কেহ বিরক্ত করে না, কেহ কষ্ট দেয় না। অতএব, ইয্‌যতের রূহ—ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা করা। আবার উভয়ের রূহ শান্তি। এই শান্তি এবাদতের দ্বারা-ই সম্ভব হয়। বাহ্যিক উপকরণ যাহাকিছুই হউক না কেন।

দেখিয়া লউন, এই শান্তি খোদা ও রাসূলের ফরমাঁবরদার লোকেরাই লাভ করিয়া থাকে, না— বিরোধী ও নাফরমান লোকেরা? পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, খোদা ও রাসূলের নাফরমান একটি লোকও শান্তিতে পাইবেন না। ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার সন্ধান পাইবেন যে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নাফরমান লোক সর্বক্ষণ কোন না কোন এক প্রকারের অশান্তির মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে। মোটকথা, মাল ও পদ-মর্যাদার যাহা প্রাণ তাহা এবাদতের দ্বারাই লাভ করা যায়। সুতরাং দুনিয়ার শান্তি লাভ করার উপায়ও এবাদৎই বটে। এই তাকরীরের পরে পদ-মর্যাদা ও ধন-প্রার্থীদিগকে বলা হইবে :

ترسم نه رسی به کعبه اے اعرابی + کیں ره که تو میروی به ترکستان ست

"আমার আশঙ্কা, হে বেদুইন! তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছিতে পারিবে না, কেননা, যেপথে তুমি চলিতেছ ইহা তুর্কীস্তানের পথ।"

॥ দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা ॥

যে পথে তুমি দুনিয়ার শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছ। এই পথই সেই শান্তির নহে। এই আয়াতে উহাই বলা হইয়াছে যে, সচ্ছলতা এবং পদ-মর্যাদা খোদা ও রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। এই মাসআলাটি বর্ণনা করাই আমার এখন উদ্দেশ্য ছিল এবং আলহামদুলিল্লাহ্ প্রয়োজনীয় পরিমাণ উহার বর্ণনা হইয়াও গিয়াছে। এসম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায় যে ভুলের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে তাহার সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্য কেহ বলিতে পারেন, এই আয়াতে তো উল্লেখ করা হইয়াছে বেহেশতের সচ্ছলতার কথা, আর আমাদের প্রয়োজন দুনিয়ার সচ্ছলতা। তাহা এবাদতের দ্বারা হাছিল হইবে এমন কথা তো আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে না। বেহেশ্‌তের শান্তি লাভের অপেক্ষায় কতকাল বসিয়া থাকিব ?

ইহার একটি উত্তর এই যে, আয়াতে কোথাও বেহেশ্‌তের নাম উল্লেখ নাই। অতএব, আমরা ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে বাধা কি আসিবে ? বিশেষতঃ, আমরা যখন স্বচক্ষে দেখিতেছি, যেমন উপরোক্ত বর্ণনায় বুঝা গিয়াছে। আর যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, এই প্রতিশ্রুতি বেহেশ্‌ত সম্বন্ধেই বটে, তবে বেহেশ্‌তের মোকাবেলায় দুনিয়া কি বস্তু ? বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি যখন হইয়া গিয়াছে, তখন দুনিয়ার প্রতি কি আর আগ্রহ থাকা উচিত ? মনে করুন, কোন ব্যক্তিকে যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তোমাকে একটি টাকা দেওয়া হইবে, তখন কি তাহার মনে আর পয়সার কামনা বাকী থাকে ?

এই দৃষ্টান্তের পরে লক্ষ্য করুন, দুনিয়া ও বেহেশ্‌তের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? হাদীসে আসিয়াছে—আখেরাতের সামনে দুনিয়ার অস্তিত্ব এইরূপ—যেমন, সমুদ্রের সামনে সূচাগ্রের এক ফোটা পানি। যদি অবিভাজ্য কোন অংশের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকে, তবে সূচাগ্রের পানি বিন্দুটিকে তাহাই বলা যায়। অতএব, সমুদ্রের পানির সহিত এই সূচাগ্র বিন্দু পানির যে সম্পর্ক, আখেরাতের সহিত দুনিয়ার সম্পর্কও ঠিক তদ্রূপ। দুনিয়াতে যদি ধন-সম্পদ এবং মান-মর্যাদা লাভ নাও হয় এবং এই আয়াতে তাহা উদ্দেশ্য না হয়, তবে ক্ষতি কি ? ইহা সর্বশেষ জবাব। অন্যথায় আমার দাবী এই যে, দুনিয়াতেও এবাদতের দ্বারা সচ্ছলতা লাভ হয়। খুব বেশী হইলে এতটুকু হইবে যে, আয়াতটিকে তোমার তফসীর অনুযায়ী বেহেশ্‌তের সচ্ছলতার সহিত

খাছ করা হইলে—তাহা মানিয়া লওয়ার পর—এই আয়াত দ্বারা দুনিয়ার সচ্ছলতা প্রমাণিত হইবে না, তাহাতেও ক্ষতি নাই। আমি অন্য আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া দিব। যেমন, আল্লাহ্ পাক বলেন :

ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء والارض *

"যদি তাহারা ঈমান আনিত এবং খোদাকে ভয় করিত, তবে আমি তাহাদের জন্য আসমান হইতে এবং যমিন হইতে বরকতসমূহের দ্বার খুলিয়া দিতাম।"

আর এক আয়াতে বলিতেছেন :

ولو انهم اقاموا التورة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم

لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ٥

"আর যদি তাহারা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং যাহাকিছু তাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে নাযিল করা হইয়াছে কায়েম রাখিত, তবে তাহারা তাহাদের উপর হইতে এবং তাহাদের পায়ের নিম্ন হইতে খাদ্য পাইত।" এতদ্ভিন্ন আরও অনেক আয়াত আছে। অতএব, যদি কোন আয়াতে বেহেশ্‌তের সচ্ছলতা বুঝায় আর অন্য আয়াতে দুনিয়ার সচ্ছলতা বুঝায়, তবে ক্ষতি কি? এ সমস্ত আলোচনা দুনিয়া-পূজকদের রুচি অনুযায়ীই করা হইল। নতুবা আসল কথা এই যে, দুনিয়ার প্রতি মুসলমানদের যে পরিমাণ আগ্রহ ও আকর্ষণ রহিয়াছে তাহা অবাঞ্ছনীয়। তাহাদের লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত একমাত্র আখেরাত। কেননা, আখেরাতের সচ্ছলতার মোকাবেলায় দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য এবং আখেরাতের আযাবের তুলনায় দুনিয়ার আযাব কিছুই নহে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দুনিয়াতে সারাজীবন নেয়ামতে ডুবিয়া ছিল এমন এক ব্যক্তিকে দোযখে একবার ডুব দেওয়াইয়া বলা হইবে : هل رأيت نعيما قط "তুমি কি কখনও কোন নেয়ামত দেখিয়াছ?" সে জবাব দিবে : "আমি কখনও দেখি নাই।" আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সারাজীবন কষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহাকে বেহেশতে ঢুকাইয়াই জিজ্ঞাসা করা হইবে: "তুমি কি কখনও কোন কষ্ট দেখিয়াছ?" সে জবাব দিবে: "না, কখনও না।"

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। মনে করুন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতেছে যে, তাহাকে খুব প্রহার করা হইতেছে এবং চতুর্দিক হইতে সাপ বিচ্ছু তাহাকে দংশন করিতেছে। কিন্তু জাগিয়া সে কি দেখিতেছে? শাহী তখ্‌তের উপর আরামে বসিয়া আছে। কেহ তাহার মাথায় চামর হেলাইতেছে। কেহ আতর গোলাব মালিশ করিতেছে। কেহ পান আনিয়াছে। চতুর্দিকে সারি সারি লোক করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় উক্তস্বপ্নের কোন প্রতিক্রিয়া তাহার হৃদয়ে

অবশিষ্ট থাকিতে পারে কি ? কথনও না ; বরং সেই স্বপ্নের কথা আপনাআপনি মনে আসিলেও, আনন্দ-মগ্ন মন তাহা ভুলাইয়া দিবে।

পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল, সে শাহী তখ্‌তে সমাসীন, সমস্ত লোক তাহার সামনে করজোড়ে দণ্ডায়মান। মানুষ তাহার সম্মুখে নিজ নিজ অভাব-অভিযোগের কথা পেশ করিতেছে। সে উহা পূর্ণ করিয়া দিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু চক্ষু খুলিতেই দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি তাহার মাথায় জুতা মারিতেছে এবং বহু সাপ-বিচ্ছু তাহাকে জড়াইয়া রহিয়াছে। আর একটি কুকুর তাহার মুখে প্রস্রাব করিতেছে। কেহ কি বলিতে পারে যে, এই সমস্ত বিপদ স্বচক্ষে দেখার পরেও স্বপ্নের কোন আনন্দ তাহার অন্তরে থাকিতে পারে ? কখনও না। অতএব, দুনিয়ার দৃষ্টান্তও আখেরাতের মোকাবেলায় ঠিক এইরূপ মনে করিবেন। যেমন, জাগ্রত অবস্থার মুকাবেলায় স্বপ্নের দৃষ্টান্ত। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন :

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانۂ + گفت یا خوابیست یا بادیست یا افسانۂ

باز گفتم حال آں کس گو کہ دل دروی بہ بست + گفت یا غولیست یا دیویست یا دیوانۂ

"জনৈক জ্ঞানবান লোকের নিকট দুনিয়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলেন, হয়ত স্বপ্ন, কিবা বায়ু অথবা গল্প। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে তাহার অবস্থা কি বলুন ? বলিলেন, হয়ত বহুরূপী জ্বিন, কিংবা ভুত, অথবা পাগল।" অতএব, দুনিয়ার দৃষ্টান্ত স্বপ্নেরই মত। দুনিয়াতে যদি সারাজীবন আনন্দ ও খুশীর সহিত জীবন যাপন করিল, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গেরেফতার হইয়া গেল, তবে দুনিয়ার এই সুখময় জীবন কি কাজে আসিবে ?

॥ দুনিয়ার অবস্থার দৃষ্টান্ত ॥

দুনিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। গল্পটি বাহ্যতঃ অর্থহীনেরই মত। কিন্তু আমার বক্তব্য বিষয়ের সহিত পুরাপুরি মিল রহিয়াছে। এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল প্রত্যহ ঘুমন্ত অবস্থায় প্রস্রাব করিত এবং তাহার বিবী অপবিত্র বিছানা ও কাপড়-চোপড় ধুইত। একদিন বিবী বলিল, হতভাগা। আমি তো প্রস্রাব ধুইতে ধুইতে প্রাণান্ত হইলাম। বল তো, তোমার উপর কোন্ বালা সওয়ার হয়। যাহার কারণে তুমি এরূপ করিয়া থাক ? সে বলিল, আমি রোজ স্বপ্নে দেখি—শয়তান আসিয়া আমাকে বলে, চল, তোমাকে ভ্রমণ করাইয়া আনি। আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে সে বলে, প্রথমে পেশাব করিয়া লও। তখন আমি পেশাব করিতে বসিয়া মনে হয়, যেন পেশাবখানায়ই পেশাব করিতেছি, অথচ পরে দেখি বিছানায় প্রস্রাব করিয়াছি।

এই স্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া বিবী বলিল, আমরা গরীব মানুষ, আর শয়তান জ্বিন জাতির বাদশাহ্। তাহাকে বলিও, আমাদিগকে যেন কোন স্থান হইতে কিছু

টাকা আনিয়া দেয়। স্বামী শয়তানের নিকট তাহা বলিবে বলিয়া ওয়াদা করিল। রাত্রে সে শয়ন করিলে যখন পুনরায় শয়তান আসিল, তখন সে শয়তানকে বলিল, বন্ধু! আমি বিনা পয়সায় চলিব না। কোন স্থান হইতে কিছু টাকা আনিয়া দাও। শয়তান বলিল, এটা এমন কি মুশ্‌কিলের কথা! তুমি আমার সঙ্গে চল, পরে যত টাকা বলিবে তাহাই পাইবে। শয়তান তাহাকে এক রাজকোষের সম্মুখে নিয়া দাঁড় করাইয়া দিল এবং একটি গাঁঠুরীতে অনেক টাকা ভরিয়া তাহার কাঁধের উপর রাখিল। উহা এত ভারী ছিল যে, বোঝার চাপে তাহার পায়খানা বাহির হইয়া গেল। ভোর হইলে দেখা গেল, বিছানা পায়খায়নায় ভর্তি। বিবী জিজ্ঞাসা করিল: 'এটা কি হইল।' সে বলিল: 'শয়তান আমার কাঁধে টাকার এত বড় বোঝা চাপাইয়াছিল যে, বোঝার চাপে আমার পায়খানা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।' তখন বিবী বলিল: মিঞা! তুমি প্রস্রাবই করিও। আমাদের টাকার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আর পায়খানা করিও না।'

এই গল্পটি অর্থহীনের মতই বটে; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখুন। আমাদেয় অবস্থার সহিত পুরা-পুরি মিল রহিয়াছে। আমরাও সেই ব্যক্তির ন্যায় এখন নিদ্রা-মগ্ন রহিয়াছি, এবং স্বপ্নে দেখিতেছি বহু রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার থলি নিজেদেয় মাথায় লইয়া ফিরিতেছি, কিন্তু মৃত্যু আসিয়া যখন আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিবে, তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, সমস্তই ছিল স্বপ্ন এবং কল্পনা; আর কিছু নহে। তখন আমরা নিজেদের গুণাহ্‌রূপ মলমূত্রে থাকিব, আমাদের নিকট টাকা-পয়সাও থাকিবে না। কোন বন্ধু-বান্ধব বা সাহায্যকারীও থাকিবে না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একাকী হইব। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۞

"এবং তোমরা আমার কাছে আসিলে একাকী একাকী। যেরূপ আমি তোমাদিগকে প্রথম দফায় সৃষ্টি করিয়াছি। আর ত্যাগ করিয়া আসিলে তোমাদের পশ্চাতে যেসমস্ত জীবিকার উপকরণ আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম।" আর টাকা-পয়সা—থাকিলেই কি—তাহা তখন কোন কাজে আসিবে না। যেমন আর এক আয়াতে বলিতেছেন:

وَلَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

"এবং যদি তখন তাহাদের জন্য হয় দুনিয়ার সবকিছু এবং উহার সঙ্গে তদনুরূপ আরও এতগুলি, এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা উহা দ্বারা কিয়ামত দিবসের আযাবের মুক্তিপণ দিবে। তাহাদের নিকট হইতে উহা কবুল করা হইবে না এবং তাহাদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাময় শাস্তি রহিয়াছে।" অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যদি একজন লোক সারা দুনিয়া প্রাপ্ত হয় এবং আযাব হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য উহা মুক্তিপণ স্বরূপ দিতে চায়, তবে তাহার নিকট হইতে উহা কবুল করা হইবে না। অতএব, এখানে কয়েক দিনের জন্য আমোদ-আহ্লাদ করিয়া যদি ইহাই পরিণাম হইল, তবে এই আমোদ এবং সুখ-শান্তিও দুঃখ-কষ্টই বটে। আর যদি এখানে কিছু দিন দুঃখ-কষ্ট করিয়া অনন্ত কালের জন্য নেয়ামত লাভ করা গেল, তবে এই দুঃখ-কষ্টও শান্তি।

হযরত শায়খ্ আবদুল কুদ্দ্স গঙ্গুহী (রঃ) যখন উপর্যুপরি তিন দিন উপবাস করিতেন, তখন তাঁহার বিবী বলিতেন: 'হযরত! আর তো ছবর করা যায় না। তখন তিনি বলিতেন: "বেহেশ্‌তে আমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। একটু ছবর কর। ইন্‌শাআল্লাহু সেই নেয়ামত আমরা অতি সত্বর লাভ করিতেছি।" 'আল্লাহু আকবর' বিবীও এমন শোকরকারিণী ও ধৈর্যশীলা ছিলেন যে, বেহেশ্‌তের জন্য অপেক্ষা করার উপরই সম্মত হইয়া নীরব হইয়া যাইতেন।

আর একজন বুযুর্গ লোকের ঘটনা। কোন এক বাদশাহ্ লিখিলেন, আপনি খুব সঙ্কীর্ণতার সহিত জীবনযাপন করিতেছেন, খাদ্য এবং বস্ত্র উভয়েরই খুব কষ্ট করিতেছেন। আপনি এখানে আসিয়া আমার কাছে থাকিলেই ভাল হয়। তিনি যে জবাব লিখিয়া পাঠাইলেন, উহার কয়েকটি বয়েত আমি এখানে পাঠ করিতেছি:

خوردن تو مرغ مسمن و مئے + بہتر ازیں نانک جوین ما

پوشش تو اطلس و دیبا حریر + بخیہ زدہ خرقۂ پشمین ما

نیک ہمین ست کہ بس بگزرد + راحت تو محنت دوشین ما

باش کہ تا طبل قیامت زنند + آن تو نیک آید و یا این ما

"তোমার খাদ্য 'মোসাম্মান্-মোরগ' এবং শরাব, আমাদের যবের ছাতুতে প্রস্তুত একটি ক্ষুদ্র রুটি তাহা অপেক্ষা উত্তম। তোমার পোশাক মসৃণ শাটিন, রেশমী কিংখাব এবং রেশমী বস্ত্র। আর আমাদের পোশাক সেলাই করা পশ্‌মী খের্‌কা। আমাদের রাত্রিকালে পরিশ্রম তোমার শান্তি ও আরামকে ছাড়াইয়া যায়। ইহাই আমাদের জন্য ভাল। কিয়ামতের ডঙ্কা বাজা পর্যন্ত থাক, তখন বুঝিতে পারিবে, তোমার সেই জাঁকজমকপূর্ণ খাদ্য ও বস্ত্রই ভাল হয়, না আমাদের এই গরীবী হালের খাদ্য-বস্ত্রই ভাল হয়।"

বাস্তবিকই ওখানে যাইয়া এখানকার সুখ-শান্তি তো থাকিবে না দুঃখ-কষ্টও থাকিবে না। আখেরাতে যাইয়া দুনিয়ার এই অতীত বস্তুসমূহ কি মনে থাকিবে?

দুনিয়াতেই দেখুন, অতীত জীবন স্বপ্নের চেয়ে অধিক নহে। যমানা অতীত হইয়া যাইতেছে, ঠিক যেন বরফের খণ্ড গলিতে আরম্ভ করিলে সম্পূর্ণ গলিয়াই শেষ হয়। এই জন্যই হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছেঃ কিয়ামতের দিন দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ভোগকারীদিগকে যখন বড় বড় মর্যাদা দান করা হইবে, তখন সুখ-সম্পদ ভোগকারীরা বলিবেঃ 'আফসুস! যদি দুনিয়াতে আমাদের চামড়া কাঁচি দ্বারা কুচি কুচি করিয়া কাটা হইত, তবে আজ আমরাও বড় বড় মর্যাদা লাভ করিতাম?' এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কোন চিন্তা না করিয়া বলিতে হয়, দুনিয়াতে কিছুই না পাইলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অতএব, আলোচ্য আয়াতে যে সচ্ছলতা ও উচ্চ মর্যাদা দানের ওয়াদা করা হইয়াছে তাহা বেহেশ্‌তের জন্য খাছ বলিয়া যে প্রশ্ন করা হইয়াছে তাহা নিরর্থক।

॥ বাহ্যিকরূপ ও হাকীকতের প্রভেদ ॥

বন্ধুগণ! বেহেশ্‌ত কি সামান্য বস্তু? এখনও দেখিতে পান নাই বলিয়া আপনাদের কাছে বেহেশ্‌তের কোন কদর নাই। দেখিলে উহার হাকীকত জানিতে পারিবেন। আর যাহারা ঐসমস্ত বস্তুকে অন্তরের চক্ষু দ্বারা আজই দেখিয়া লইয়াছে তাহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শকদেরই মত।

বেহেশ্‌তের সুখ যখন ভোগ করিব—তখন ভোগ করিব। তাহাতো ভবিষ্যতের কথা, এখন তো দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছি। এরূপ সন্দেহ করা ভুল, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক আছে তাহারা কখনও দুঃখ-কষ্টে নাই। আসল কথা এই যে, যে বস্তুকে আপনারা দুঃখ-কষ্ট নামে আখ্যায়িত করিয়া থাকেন, আল্লাহ্-ওয়ালাদের কাছে তাহা মুছিবৎই নহে। ইহার তথ্য এই যে, সুখ-শান্তির যেমন একটি বাহ্যিক আকার আছে আর একটি মূল আছে, তদ্রূপ মুছিবতেরও একটি বাহ্যিকরূপ এবং একটি মূল আছে।

দেখুন, কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘ দিনের বিরহী মা'শুকের হঠাৎ সাক্ষাৎ পায় এবং মা'শুক তাহার আশেককে অতি জোরে কোলাকুলি দেয়, এমন কি তাহার পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়, তবে বাহ্যিকরূপে আশেক বেচারা ভয়ানক কষ্টের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু তাহার অন্তরের অবস্থা তখন এইরূপ হয় যে, সে চায়, মা'শুক তাহাকে আরও জোরে আলিঙ্গন করিলেই ভাল হয়। আর মা'শুক যদি বলে যে, কষ্ট হইলে ছাড়িয়া দেই। তখন আশেক জবাবে বলিবে যেঃ

اسیرت نخواهد رهائی ز بند + شکارت نه جوید خلاص از کمند

"তোমার কয়েদী কয়েদখানা হইতে রেহাই চায় না। তোমার শিকার ফাঁদ হইতে মুক্তি অন্বেষণ করে না।"

আর যদি মাশুক বলে যে, তোমার কষ্ট হইলে তোমাকে ছাড়িয়া তোমার এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে এইরূপে আলিঙ্গন করি, তখন সে বলিবে :

نه شود نصیب دشمن که شود هلاک تیغت + سر دوستان سلامت که تو خنجر آزمائی

"তোমার তরবারি ধ্বংস হয় এমন ভাগ্য যেন দুশমনের না হয়, তোমার খঞ্জর পরীক্ষার জন্য বন্ধুদের মস্তক নিরাপদে রহিয়াছে।" আরও বলিবে :

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے + یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

"ইহাই মনের আক্ষেপ। ইহাই মনের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার পায়ের নীচে আমার প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া যায়।"

এমন কি, আশেক ব্যক্তির প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া গেলেও সেই কষ্ট তাহার জন্য প্রকৃত শান্তি। অথচ বাহ্যিক দর্শনে দেখা যায়, সে খুবই কষ্টের মধ্যে আছে।

এতদুভয় ব্যক্তির পরস্পর মহব্বতের সম্পর্ক অবগত নহে এমন কোন বেগানা লোক যদি এই কঠোর আলিঙ্গন দেখিতে পায়, তবে তাহার খুবই দয়া হইবে এবং আশেক্‌কে ছাড়িয়া দিবার জন্য মা'শুককে অনুরোধ করিবে। কিন্তু আশেক ব্যক্তি এই দয়া ও সুফারিশকে নির্দয়তা এবং শত্রুতা বলিয়াই মনে করিবে। কেননা, সে জানে যে, এই সুফারিশের ফল এই দাঁড়াইবে যে, মা'শুক তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া এখনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপে খোদা তা'আলার সহিত যাহাদের সম্পর্ক হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে মুছিবতে পতিত দেখিয়া যদি আপনি হিতকামনা করিয়া আফসুস করেন যে, আহা! এই আল্লাহ্‌ওয়ালা বেচারা বড়ই মুছিবতের মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহাকে উক্ত মুছিবত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় বলেন—তাঁহারা আপনার হিতকামনাকে নিতান্ত অপছন্দ করিবে।

আমি আমার ওস্তাদ (রঃ) হইতে একটি গল্প শুনিয়াছি। কোন এক বুযুর্গ পথ দিয়া চলিতে চলিতে এক ব্যক্তিকে দেখিলেন যমিনের উপর পড়িয়া রাহিয়াছে। সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত। নীরিক্ষণ করিয়া দেখিলেন, রাশি রাশি নূর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং লোকটি আল্লাহ্‌ওয়ালা শ্রেণীর। তিনি দয়াদ্র হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং আদবের সহিত তাঁহার আহত স্থানের মাছি তাড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিতে লাগিলেন : "এই ব্যক্তি কে? আমার ও আমার মা'শুকের মধ্যস্থলে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে?" এবং বলিলেন : আমার অবস্থা এই :

خوشا وقتے که خرم روزگارے + که یارے برخورد از وصل یارے

"সেই সময়টুকু খুশীর এবং সেই যমানাটুকুই আনন্দময়; যখন এক বন্ধু আর এক বন্ধুর মিলন-সুধা পান করে।"

অতএব, মহব্বতের সম্পর্ক এমন বস্তু; যাহার কারণে অপছন্দনীয় বস্তু পছন্দনীয় এবং অসহনীয় বস্তু সহনীয় হইয়া যায়।

॥ মহব্বতের বিশেষত্ব এবং দাবী ॥

এক ব্যক্তির ঘটনা লিখিত আছে : কোন এক ব্যক্তিকে ভালবাসার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। নিরানব্বই কোড়া পর্যন্ত সে 'উঃ" শব্দটি করে নাই। কিন্তু অতঃপর যে একটি কোড়া লাগিল তাহাতে সে খুব জোরে চীৎকার করিয়া "উঃ" শব্দ করিল। লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, নিরানব্বই চাবুক পর্যন্ত আমার মা'শুক সম্মুখে দাঁড়ান ছিল, তখন আমি এই আনন্দ পাইতেছিলাম যে, মাহ্‌বুব আমার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছে। কাজেই কোন কষ্ট বোধ হয় নাই। সর্বশেষ চাবুকের সময় মাহ্‌বুব চলিয়া গিয়াছিল, কাজেই সেই আঘাতের চোট খুব অনুভূত হইয়াছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহাই বলিতেছেন :

واصبر لحكم ربك فانك باعيننا

"আর তুমি তোমার প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরিয়া থাক। তুমি তো আমার চক্ষের সামনে আছ।"

ইহাতে বুঝা যায়, এই কল্পনার মধ্যেও এই বিশেষত্ব আছে যে, কষ্ট আরামে রূপান্তরিত হইয়া যায়। আর আশেকরাও এই আকাঙ্ক্ষাই করিয়াছেন :

بجرم عشق توام می کشند غوغا ئیست + تو نیز بر سر بام آکه خوش تماشا ئیست

"তোমার এশ্‌কের অপরাধে আমাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। বেশ শোরগোল হইতেছে। তুমিও ছাদের উপরে আস, কেননা, সুন্দর একটি তামাশা।" এই যে, ছাদের দিকে ডাকিতেছে—শুধু এই আনন্দ ও শান্তির জন্যই। অতএব, মহব্বতের মধ্যে যখন এই বিশেষত্ব রহিয়াছে, তখন যাঁহাদিগকে আপনারা কষ্টের মধ্যে মনে করিতেছেন এবং তাঁহাদের এই সহনশীলতার অবস্থা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছেন তাঁহারাও যদি এই কষ্টে শান্তি বোধ করেন, তবে বিচিত্র কি ?

হাদীস শরীফে আসিয়াছে—একজন ছাহাবী (রাঃ) নামাযের মধ্যে কোরআন পড়িতেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার গায়ে একটি তীর আসিয়া বিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি কোরআন পাঠ বন্ধ করিলেন না। অপর একজন ছাহাবী (রাঃ) তথায় শায়িত ছিলেন। জাগিয়া তিনি এই অবস্থা দেখিলেন এবং নামাযী সালাম ফিরাইবার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, কোরআন পাঠ বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। (রক্ত বাহির হওয়ায় ওযু ও নামায বাতিল হওয়া একটি ফেক্‌হী মাস্‌আলা, ইহাতে মতভেদ আছে।)

ফলকথা, মহব্বৎ এইরূপ বস্তু। কিন্তু আমরা যেহেতু মহব্বতের স্বাদ কোনদিন গ্রহণ করি নাই কাজেই আমরা মনে করিয়া থাকি এ সমস্ত লোক কষ্টের মধ্যে আছে। অথচ তাহারা বাস্তবিক পক্ষে কষ্টের মধ্যে নহেন। কেননা, মুছিবতের মূলটিই মুছিবৎ, বাহিরের রূপের নাম মুছিবৎ নহে। অতএব, এরূপ সন্দেহ আর থাকিতে পারে না যে,

"আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ কষ্টের মধ্যে আছেন।" আর একথাও প্রমাণিত হইল যে, নাফরমানীর সহিত শান্তি ও ইয্‌যৎ নাই এবং এবাদৎ ও ফরমাঁবরদারীর সহিত কষ্ট এবং অপমান নাই। অতএব যদি আমরা ইয্‌যতের প্রত্যাশী হই, তবে আমাদের কর্তব্য—খোদার আনুগত্য অবলম্বন করা। যখন হইতে আমরা তাহা ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন হইতেই আমাদের ইয্‌যত ও শান্তি চলিয়া যাইতেছে। একথাই এখন বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌ তাহা যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

॥ চরিত্র সংশোধন ও সামাজিক জীবন ॥

এখন এই আয়াতটি সম্বন্ধে কয়েকটি বিভিন্ন প্রকারের ফায়দা বর্ণনা করিতেছি। তাহা আলেমদের জন্য অধিক হিতকর হইবে। অর্থাৎ, বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও এই আয়াতের মধ্যে আরও কিছু অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। সে সমস্ত অর্থ সম্বন্ধেও লোকে ভুল করিয়া থাকে। যেমন, একটি অর্থ এই যে, শরীয়তে আকীদা, কাজ কারবার ইত্যাদি যেমন উদ্দেশ্য তদ্রূপ সৎভাবে সামাজিক জীবন যাপনও শরীয়তের অংশ বিশেষ।

যেমন, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজনের সময় উঠিয়া যাওয়া, যাহা সামাজিক জীবনের অন্তর্গত। আয়াতে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার উল্লেখ এবং আদেশ করা হইয়াছে।

সারকথা এই যে, মানুষ এখন ধর্মের অংশগুলিকে সংক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ শুধু আকায়েদকেই গ্রহণ করিয়া লইয়াছে: مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "যে লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু"বলিয়াছে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" শুধু এই হাদীসকে গ্রহণ করিয়া ইহারা নামায ইত্যাদি এবাদতকে একদম উড়াইয়া দিয়াছে। ইহারা বলে—শাস্তি ভোগ করিয়া কোন এক সময়ে বেহেশ্‌তে অবশ্যই চলিয়া যাইবে। এ সমস্ত লোক আমলকে কার্যক্ষেত্রে একদম পরিত্যাগ করিয়াছে। আর কেহ কেহ আকায়েদের সঙ্গে আমলকেও গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে কাজ কারবার বা ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়গুলি কার্যতঃ খারিজ করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ, নামায রোযার প্রতি গুরুত্ব অবশ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু আদান-প্রদানের ব্যাপারে শরীয়তের পরোয়া মোটেই করে না যে, ইহা জায়েয হইল, কি, না-জায়েয হইল। এতদ্ভিন্ন আমদানীর উপায়সমূহেও মোটেই খেয়াল করে না। আর কেহ কেহ এমনও আছেন যাঁহারা ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়গুলিকেও শরীয়তের অংশ সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করাকে শরীয়তের অংশ মনে না করিয়া উহাকে তেমন জরুরী বিষয় বলিয়া গণ্য করেন নাই। অতি অল্প সংখ্যক লোক আছেন যাঁহারা ইহার প্রতিও গুরুত্ব দান করিতেছেন। কেহ কেহ এমনও আছেন যাঁহারা দীর্ঘ দিন ধরিয়া অপরের

সংশোধনে লিপ্ত আছেন ; কিন্তু স্বয়ং তাঁহাদের স্বভাবে ও চরিত্রে মানুষ ব্যাপকভাবে কষ্ট পাইতেছে। অথচ তাহারা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেপরোয়া ; বরং খবরও রাখেন না যে, "আমরা কি কর্ম করিতেছি।" আর এমন লোক তো অনেকই আছে যাহারা রাস্তায় কোন গরীব মুসলমানকে দেখিলে নিজে আগে কখনও সালাম দিবেন না ; বরং তিনি তাহা হইতে সালাম পাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকেন। আর কেহ কেহ আকায়েদ, আমল এবং কাজ-কারবার সংক্রান্ত মাসায়েলের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ স্বভাব-চরিত্রের সংশোধনকেও শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া থাকেন এবং উহার জন্য যথেষ্ট উপায়ও অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা সামাজিক জীবনের আবশ্যকীয় মাসায়েলগুলিকে শরীয়তের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা তো আমাদের পারস্পরিক আচরণ। ইহার সহিত শরীয়তের কি সম্পর্ক ? যদিও একথা অবশ্যই সত্য যে, শরীয়তের সমস্ত অংশগুলি সমান স্তরের নহে, তথাপি সবগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব। মোটকথা, এই প্রকারের বহু লোক দেখা যায়, তাহারা দ্বীনদারও ; বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ স্বভাবও তাহাদের দুরুস্ত আছে। কিন্তু সামাজিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে এদিকে লক্ষ্য করে না যে, তদ্দ্বারা অপর লোক তো কষ্ট পাইবে না ? কোন কোন সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে অনেক বেশী কষ্ট পৌঁছিয়া থাকে। কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। অথচ হাদীসে বহু জায়গায় বর্ণিত আছে যে, হুযুর (দঃ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি ততখানি লক্ষ্যই রাখিতেন এবং গুরুত্ব দিতেন যতখানি বড় বড় বিষয়ের প্রতি দিতেন।

এ সম্বন্ধে আমি একটি চটি কিতাব সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছি। উহার নাম রাখিয়াছি—"আদাবুল মোআশারাত।" (১)

এই ধরনের বহু হাদীস উক্ত কিতাবটির ভূমিকায় একত্রিত করিয়া দিয়াছি। আপনারা উক্ত কিতাবটি সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোআ করুন। সেই হাদীসগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন শরীয়তে ইস্‌লাম এমন কার্য কখনও জায়েয রাখে না যদ্দ্বারা কাহারও সামান্য মাত্র কষ্ট পৌঁছিতে পারে কিংবা কোন প্রকারের বোঝা আসিয়া চাপে। এই যুগে এই রোগটি এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, যাঁহারা দাবী করিয়া থাকেন—তাঁহারা কেবল আল্লাহ্ আল্লাহ্ করেন এবং নানাবিধ যেকের ও ওযিফায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহারাও এবিষয়ে কোন পরোয়া করেন না এবং এই বিষয়টিকে কার্যতঃ শরীয়ত হইতে খারিজ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এই অবস্থাটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নিজ দায়িত্বে এই বিষয়টি জরুরী মনে করিয়া লইয়াছি যে, যাঁহারা আমার নিকট আসিবেন তাঁহাদিগকে যেকের ও ওযিফায় লাগান অপেক্ষা অধিকতর তাহাদের স্বভাব-চরিত্র ও সামাজিক জীবনেরই সংশোধন করা উচিত, যেন জীবনযাপন

(১) আল্‌হামদু লিল্লাহ্, উক্ত কিতাবটি সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

প্রণালীর কোন একটি অংশে সাধ্য পরিমাণ ত্রুটি না হয়। কেননা, ইহার বড়ই প্রয়োজন। এই সামাজিক জীবন-যাপন প্রণালীর সংশোধন আমাদের মধ্য হইতে একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে।

॥ সংশোধনের পন্থা ॥

ইহার বিস্তারিত বিবরণ যে পর্যন্ত জানা না যায়, আমি ইহার একটি সহজ মাপকাঠি বলিয়া দিতেছি যে, ইহাতে একটু মনোযোগ দিলে প্রায় সবগুলি সামাজিক জীবন-যাপন প্রণালী আপনাআপনি বুঝে আসিতে আরম্ভ করিবে। সেই মাপকাঠি এই—যখন কোন মানুষের সহিত কোন প্রকার আচরণ করিতে হয়, যদিও তাহা আদব এবং তা'যীমের আচরণ হয় প্রথমে দেখিয়া লইবে যে, লোকটির সহিত আমার যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক তাহার সহিত আমার হইলে সে যদি আমার প্রতি এরূপ আচরণ করিত, তবে তাহা আমার অপছন্দনীয় হইত কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে নিজের অন্তর হইতে যে কথাটি বাহির হইবে তাহারই অনুযায়ী অপরের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

এক সময় আমি পড়িতেছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া আমার পশ্চাদ্দিকে বসিয়া গেল। তখন আমি তাহাকে নিষেধ করিলে সে তাহা মানিল না। অতএব, আমিও তাহার পশ্চাদ্দিকে বসিলাম। ইহাতে সে ঘাব্‌ড়াইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, জনাব। পশ্চাদ্দিকে বসা যদি অপছন্দনীয় কাজই হয়, তবে নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনি কেন আমার পিছনে বসিলেন? এমন গর্হিত কাজ হইতে নিবৃত্ত কেন হইলেন না? আর যদি পছন্দনীয় এবং ভাল কাজ হয়, তবে আমাকে কেন বসিতে দিতেছেন না?" আমি আরও বলিলাম, আপনি অনুমান করুন, আমি আপনার পশ্চাদ্দিকে বসিবার কারণে আপনার মনে কি পরিমাণ কষ্ট হইয়াছে? ইহা হইতেই আমার কষ্টটুকুও অনুমান করিয়া লউন। আমার পরিবর্তে যদি অন্য কেহ আসিয়া এই ভাবে আপনার পশ্চাদ্দিকে বসিত, তবে তখনও আপনার মনে কষ্ট হওয়া সুনিশ্চিত ছিল। যদিও আমার বসা এবং অন্য কাহারও বসার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য হয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কাহারও মনে সামান্য কষ্ট প্রদান করাও জায়েয নহে।

আল্লাহ্ জানেন, মানুষ কাহারও পশ্চাদ্দিকে বসার মধ্যে কি সার্থকতা মনে করে। ইহাই কি ধারণা করে যে, "তিনি একজন বুযুর্গ লোক। তাঁহার ভিতর দিয়া আমার এবাদৎ সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া গেলে আল্লাহ্‌র দরবারে অবশ্যই কবূল হইবে?" সে যেন উক্ত বুযুর্গ লোককে "খছ" নির্মিত পর্দার ন্যায় ফাঁক বিশিষ্ট মনে করে। যাহার ভিতর দিয়া এবাদৎ বায়ুর ন্যায় যাতায়াত করিবে।

আবার কেহ কেহ এমন বিপদও করিয়া বসে যে যাহাকে বুযুর্গ মনে করে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দেয়। ইহার ফলে তিনি উঠিতে চাহিলে উঠিতে পারেন না।

বন্ধুগণ! এটা কেমন ধরনের আদব; এক জনের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া বসাইয়া রাখা হইল! মনে করুন, সেই ব্যক্তি নামাযের নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত বুযুর্গ লোকের পায়খানায় যাওয়ার আবশ্যক হইল, আবশ্যকও নিতান্ত অপরিহার্য। এমতাবস্থায় তিনি কি করিবেন? হয়ত নামাযের সম্মুখ দিয়া উঠিয়া যাইতে হইবে; নতুবা চারি রাকাত নামায পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কষ্ট বরদাশ্‌ত করিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন।

এইরূপে কাহারও অভ্যাস—বুযুর্গ লোকের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার কদমবুছি করিয়া থাকে। তাঁহার মনে ইহাতে কষ্ট হয় কি না কোনই পরোয়া করে না। তিনি বারণ করিলে মনে করে কৃত্রিম দরবেশীর ভান করিতেছেন। নিষেধ মানে না, অথচ ভাবিয়া দেখা উচিত, তাঁহার নিষেধ করাকে যদি কৃত্রিমতা এবং তাঁহাকে কৃত্রিম মনে করা হইল, তবে তো তিনি আর বুযুর্গই রহিলেন না। তবে তাঁহার কদমবুছি কেন?

একবার আমি বাংলা দেশে সফর করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কদমবুছির রসমটি তথায় এত অধিক প্রচলিত দেখিলাম যে, অন্য কোথাও হয়ত এরূপ রসম কচিৎই দেখা যাইতে পারে। যে ব্যক্তিই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মুসাফাহার পরে কদমবুছিও করিত। দুই চারি জনকে আমি নিষেধ করিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম যে, কেহই মানে না। তখন আমি এই উপায় অবলম্বন করিলাম, যে ব্যক্তিই আমার কদমবুছি করিত, আমিও তাহার পায়ে হাত দিতাম। তাহারা ঘাব্‌ড়াইয়া যাইত। তখন আমি বলিতামঃ 'জনাব! পা ধরা যদি ভাল কাজ হয়, তবে আমাকে কেন উহার অনুমতি দেওয়া হয় না?' তাহারা বলিতঃ "আপনি বুযুর্গ লোক।" আমি বলিতামঃ "আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি আপনাকে বুযুর্গ মনে করিতেছি।" তখন তাহারা কদমবুছি ত্যাগ করিল।

॥ সম্মান ও তা'যীমের নিয়ম ॥

আমি বলি, যে সমস্ত উপকরণ বাহ্য দৃষ্টিতে অপরের মনঃকষ্টের কারণ তাহা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য হওয়া সম্বন্ধে তো কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু আজকালের প্রচলিত নিয়মে যাহাকে তা'যীম বলা হয়, তাহাও যদি মনঃকষ্টের কারণ হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমি আমার মুরব্বিয়ানের খেদমত অধিকাংশ সময়ে এই কারণে করি নাই যে, হয়ত আমার অজ্ঞতা বশতঃ আমার খেদমতে তাঁহার

মনে কষ্ট হইতে পারে। অথবা তাঁহার অন্তরে আমার প্রতি স্নেহায বা সম্মান বোধ থাকিতে পারে। আর এই কারণেও তাঁহার মনে কষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে। কোন কোন লোকের প্রতি কাহারও এমন সম্মান-বোধ থাকে যে, প্রবৃত্তির প্রতি জোর দেওয়া সত্ত্বেও তাহা কোনরূপেই বিস্মৃত হয় না। অতএব, এরূপ ব্যক্তি যদি আসিয়া শরীর দাবাইতে কিংবা পাখা ঝুলাইতে আরম্ভ করে, তবে উহাতে আরামের পরিবর্তে কষ্ট হয়। এখন মানুষ উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসিয়া চাপিয়া ধরে। এরূপ ক্ষেত্রে বিবেক খাটাইয়া কাজ করা উচিত। যদি নিজের ততটুকু বিবেক না থাকে, তবে কেহ বারণ করিলে জিদ করা উচিত নহে।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুযূরের (দঃ) জন্য জান কোরবান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা বলেন, যেহেতু আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁহার তা'যীমের জন্য আমাদের দণ্ডায়মান হওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না; সুতরাং আমরা তাঁহার তা'যীমের জন্য দাঁড়াইতাম না।

আমার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা স্মরণ হইল। হযরত মাওলানা ইয়াকুব (রঃ) যখন মাদ্রাসায় তশ্‌রীফ আনিতেন, তখন আমরা সকলে তাঁহার তা'যীমের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতাম। একদিন হযরত মাওলানা বলিলেন, ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়, আমি আসিলে তোমরা দাঁড়াইও না। তখন হইতে আমরা আর তাঁহার তা'যীমের জন্য দাঁড়াইতাম না। মনে অবশ্য প্রেরণা উৎপন্ন হইত, কিন্তু কল্পনা করিতাম—তা'যীম করার উদ্দেশ্য তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা, অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন তাহাই করা সঙ্গত।

কেহ কেহ বুযুর্গ লোকের জুতা বহন করিয়া নেওয়ার জন্য জিদ ধরিয়া থাকে। মূলতঃ ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু কোন সময় নিষেধ করিলে তৎক্ষণাৎ সে কাজ হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্তব্য। কেননা, জিদ ধরিলে মনে কষ্ট হয়।

একবার আমার ওস্তাদ হযরত মাওলানা ফতেহ্ মোহাম্মদ ছাহেব থানাভোয়ানের জামে মসজিদ হইতে জুমুআর নামায পড়িয়া গৃহে চলিলেন। জুতা হাতে করিয়া মসজিদের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছিলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাত হইতে জুতা লইতে চাহিল। মাওলানা বিনয়ের সহিত অস্বীকার করিলেন, কিন্তু লোকটি তাহা মানিল না। কথা কাটাকাটিতে অনেক বিলম্ব হইল এবং সেই নির্বোধের কারণে মাওলানাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রখর সূর্যের কিরণের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। সে যখন দেখিল যে, মাওলানা কোনক্রমেই মানিতেছেন না, তখন সে এক হাতে মাওলানার হাতের কব্জা ধরিল এবং অপর হাতের সাহায্যে হেচ্‌কা টান মারিয়া জুতা লইয়া ফেলিল এবং দৌড়াইয়া গিয়া ফরশের বাহির প্রান্তে নিয়া রাখিল। সে নিজের এই কৃতকার্য তার জন্য খুব খুশী হইল। এই ব্যবহার দেখিয়া আমার খুব অপছন্দ হইল। সেই লোকটিকে আমি খুব তিরস্কার করিলাম এবং বলিলাম, হতভাগ্য! জুতা

বহন করিয়া নেওয়াকেই তুমি তা'যীম মনে করিলে, কিন্তু এই বেতমিযী ও বেআদবীর প্রতি লক্ষ্যই হইল না যে, তুমি উত্তপ্ত মেজের উপর মাওলানাকে দাঁড় করাইয়া রাখিলে এবং হাতে ঝট্‌কা মারিয়া তাঁহার নিকট হইতে জুতা ছিনাইয়া নিলে? আজকাল লোকে তা'যীমের নামই খেদমত রাখিয়াছে। অথচ তা'যীমকে খেদমত বলা হয় না এবং খেদমত বলে আরাম পৌঁছানকে। অতএব, যে বুযুর্গ তা'যীমে খুশী হন না; পরন্তু উহা করিতে নিষেধ করেন, তাঁহার প্রতি এত তা'যীম করিও না।

॥ আরাম পৌঁছানের নিয়ম ॥

সারকথা এই যে, যে কাজে কাহারও মনে কষ্ট হয়, তাহা একেবারে ত্যাগ করা আবশ্যক। যদিও তাহা বাহ্যিক আকারে তা'যীমই হইয়া থাকে। আর যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা'যীম না হয়, তবে তো তাহা নিন্দনীয় এবং অবশ্য পরিহার্য হওয়া দিবালোকের মত স্পষ্ট। যেমন, রাত্রে এক ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার এস্তেন্‌জার প্রয়োজন হইল। সে বসিয়া খুব জোরে জোরে সশব্দে ঢিলার চাকা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। যাহার ফলে নিকটে শয়িত লোকদের ঘুম নষ্ট হইল, ঘুম নষ্ট হওয়ায় তাহাদের মধ্যে কাহারও মাথায় ব্যথা ধরিল, কাহারও বা চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল, কাহারও বা ফজরের নামায কাযা হইয়া গেল। এই বিষয়গুলি বাহ্য-দৃষ্টিতে খুব ছোট এবং সাধারণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া বড়ই ক্ষতিকর। ফকীহ্‌গণ এতটুকু পর্যন্ত লিখিয়াছেন যে, সশব্দে আল্লাহ্‌র নাম যেকের করিলে যদি নিকটে শায়িত লোকের ঘুমের ক্ষতি হয়, তবে সশব্দে যেকের করা হারাম। অতএব, যখন কোন মানুষের কষ্ট পৌঁছাইয়া আল্লাহ্‌র নাম লওয়াও জায়েয নহে, তখন অন্য কাজ অপরের মনে কষ্ট দিয়া করা কেমন করিয়া জায়েয হইবে?

নাসায়ী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে: বিশ্বের সরদার হুযূরে আকরাম (দঃ) একবার হযরত আয়েশার (রাঃ) গৃহে আরাম করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে রাত্রিকালে তাঁহার গাত্রোত্থানের প্রয়োজন হইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন: قَامَ رُوَيْدًا অর্থাৎ, তিনি খুব ধীরে ধীরে উঠিলেন, وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا এবং নিঃশব্দে দরজা খুলিলেন, وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا এবং খুব ধীরে জুতা পায়ে দিলেন, وَخَرَجَ رُوَيْدًا এবং নিঃশব্দে বাহির হইলেন। মোট কথা, কয়েক স্থানে رويدا 'নিঃশব্দে' শব্দটি রেওয়ায়তে আসিয়াছে।

হাদীসটি খুব দীর্ঘ। হযরত আয়েশা (রাঃ)ও গাত্রোত্থান করিয়া চুপিচুপি হুযূরের পিছে পিছে চলিলেন। হুযূর (দঃ) জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তশ্‌রীফ নিলেন, হযরত আয়েশাও তাঁহার পাছে পাছে রহিলেন। হুযূর (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করিতেই হযরত আয়েশা (রাঃ) দ্রুত আসিয়া নিজের বিছানায় শয়ন করিলেন। হুযূর (দঃ)

প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিশ্বাস জোরে জোরে বহিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন : مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً অর্থাৎ, "হে আয়েশা! তোমার নিশ্বাস জোরে বহিতেছে কেন?" তিনি লুকাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লুকাইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি পিছে পিছে যাওয়ার ঘটনাটি পুরাপুরি বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া হুযুর (দঃ) বলিলেন : "তুমি সম্ভবতঃ ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি তোমার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অন্য বিবির কাছে চলিয়া যাইব? এমনও কি সম্ভব?" যাহা হউক, হাদীসটি আরও দীর্ঘ।

এই হাদীসটি হইতে আমার শুধু এতটুকু কথা বলা উদ্দেশ্য যে, হুযুর (দঃ) সকলেরই প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি কাহাকে কষ্ট দিলেও লোকে উহাকে শান্তি বলিয়াই মনে করিত। বিশেষতঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) তো তাঁহার জন্য চরম আশেকা ছিলেন। তাঁহার সশব্দে বাহির হওয়ার ফলে হযরত আয়েশার যদি ঘুম ভাঙ্গিয়াও যাইত, তবুও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার বা মনে কষ্ট নেওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না; কিন্তু অবস্থাটি যেহেতু বাহ্যতঃ কষ্টদায়ক ছিল, কাজেই হুযুর (দঃ) তাহাও পছন্দ করেন নাই। কষ্ট নিবারক এতকিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হুযুর (দঃ) তৎপ্রতি এতটুকু লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তবে যে কাজে অপরের মনে কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তদ্রূপ কার্য করিতে আমাদের জন্য কিরূপে অনুমতি থাকিতে পারে?

কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে—সফরে গমনকারীকে কিছু না কিছু একটা ফরমাইশ করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় মুসাফির ব্যক্তির এত কষ্ট হয় যে, তাহা অবর্ণনীয়। আমি যখন কানপুরে ছিলাম তখন দেখিতাম, কেহ লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলে অনেকে ফরমাইশ করিত : "আমার জন্য অমুক অমুক তরকারী আনিবেন।" সময় সময় সেই মুসাফির বেচারার বাসস্থান তরকারীর বাজার হইতে এত দূরে হইত যে, বাজার পর্যন্ত যাইতে তাহার অন্ততঃ দুই আনা পয়সা 'এক্কা' ভাড়া লাগিত। অতএব, নিজের পকেট হইতে দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া এই ফরমাইশকারীর এক আনার ফরমাইশ তা'মীল করিতে হইত। অথচ লজ্জায় এক্কা ভাড়ার দুই আনা পয়সা চাহিয়া লইতে পারিত না। এইরূপে ফরমাইশ তা'মীল না করিলে আবার সারা জীবনের জন্য অনুযোগ ক্রয় করিতে হইত। আবার অনেকে এমন বিপদও করিয়া বসে যে, ফরমাইশী বস্তুর মূল্যও দিত না। মুসাফির ব্যক্তি যেন বাড়ী হইতে ধনভাণ্ডার সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে নিজের এবং অন্যান্য সকলের সর্বপ্রকারের প্রয়োজন মিটাইয়া আসিবে।

কেহ কেহ এরূপও করেন যে, একখানা চিঠি কাহারও নামে লিখিয়া সফরে গমনকারী ব্যক্তির হাতে দিয়া দিল, ইহাতেও অনেক সময় নানাবিধ কষ্ট হইয়া থাকে। প্রেরণকারী নিশ্চিন্ত থাকে, "আমার চিঠি মালিকের নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সফরে গমনকারী অনেক সময় গন্তব্য স্থানে ঠিক সময়ে না পৌঁছিয়া

মধ্য পথে থাকিয়া যায়। আবার কোন কোন সময় চিঠি নষ্টও হইয়া যায়। ইহা তো হইল চিঠি প্রেরকের ক্ষতি। কোন কোন সময় যাহার নিকট প্রেরণ করা হয়, তাহারও কষ্ট হয়। কেননা, চিঠি আনয়নকারী তাগাদা করে, "আমি এখনই যাইতেছি তাড়াতাড়ি জবাব লিখিয়া দিন।" কোন কোন সময় বেচারার ফুরসৎ থাকে না, কোন কোন সময় তাহ্‌কীক্ ভিন্ন যা, তা একটা উত্তর লিখিয়া দেওয়া হয়।

যেমন, আমার নিকটও অনেক সময় হাতে হাতে ফতুয়া চাওয়া হয় এবং আনয়নকারী তাগাদা করে যে, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি। কাজেই অন্য কাজের ক্ষতি করিয়াও তাড়াতাড়ি লিখিয়া দিতে হয়। ইহাতে কোন কোন সময় তাড়াতাড়ির দরুন কোন কোন বিষয়ে দৃষ্টির ভ্রম হইয়া যায় এবং উত্তর ভুল হয়। কোন কোন সময় উত্তর লেখার জন্য কিতাব দেখিতে হয় এবং ঠিক সময়ে রেওয়ায়ত পাওয়া যায় না।

একবার এমন হইয়াছিল যে, কোন এক ব্যক্তিকে আমি ফারায়েয সম্বন্ধীয় একটি মাস্‌আলার জবাব লিখিয়া দিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি উহা লইয়া চলিয়া গেলে আমার স্মরণ হইল যে, উত্তর ভুল লেখা হইয়াছে। আমি খুব অস্থির হইয়া পড়িলাম। লোকটিকে খোঁজ করাইয়া কোথাও পাওয়া গেল না। ইহাও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল না যে, কোথায় যাইবে? অবশেষে দোআ করিলাম, খোদা! আমার সাধ্যের বাহির হইয়া গিয়াছে, এখন আপনার সাধ্যের মধ্যে রহিয়াছে। খোদা তা'আলা আমার প্রার্থনা কবুল করিলেন। ১৫ মিনিট না যাইতেই লোকটি ফিরিয়া আসিয়া বলিল : মৌলবী ছাহেব! আপনি সীল্‌মোহর তো লাগান নাই। তাহাকে দেখিয়া আমি খুব খুশী হইলাম এবং বলিলাম : 'হাঁ ভাই আস।' তাহার হাত হইতে লইয়া জবাবটি শুদ্ধ করিলাম এবং তাহাকে বলিলাম : 'ভাই, আমার কাছে তো মোহর নাই। এখন তো আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোআ কবুল করিয়া তোমাকে আমার নিকট পৌঁছাইয়াছেন। কেননা, মাস্‌আলাটির মধ্যে কিছু ভুল হইয়া গিয়াছিল।' এই ঘটনার পর হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া লইয়াছি যে, কোন সময়ই হাতে হাতে ফতুয়ার জবাব দিব না। এই জাতীয় ব্যাপারে অনেকেই আমাকে 'বেমরুয়ৎ' আখ্যা দিয়া থাকে। কিন্তু বলুন, এসমস্ত ব্যাপার হইতে চক্ষু কেমন করিয়া বন্ধ করা যায়? এখন আমি এই রীতি করিয়াছি যে, কেহ হাতে হাতে কোন ফতুয়া লইয়া আসিলে তাহাকে বলিয়া দেই, নিজের ঠিকানা লিখিয়া দুই পয়সার টিকেট দিয়া রাখিয়া যাও, আমি নিশ্চিন্ত মনে জবাব লিখিয়া ডাকযোগে তোমার নামে পাঠাইয়া দিব।

আমার ছোট ভাই মুন্সী আকবর আলী ছাহেব হাতে হাতে কোন চিঠি দিলে বলিয়া দেন, ইহাকে লেফাফায় বন্ধ করিয়া পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখিয়া দাও যেন সহজে চিনা যায়। অতঃপর উহাতে দুই পয়সার টিকেট লাগাইয়া পোষ্ট অফিসের ডাকবাক্সে

ফেলিয়া দিতে বলিয়া দেন। তিনি বলেন, হাতে হাতে চিঠি পাঠাইবার উদ্দেশ্য দুইটি পয়সা বাঁচান। অতএব, আমি আমার পকেট হইতে দুইটি পয়সা খরচ করিব। কিন্তু এসমস্ত পেরেশানী হইতে রক্ষা পাইব। তবে ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ লোক-মারফতের চিঠি অনেক সময়ে কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত নমুনাস্বরূপ বর্ণনা করিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, কাহারও দ্বারা কাহারও মনে যেন কোন প্রকার কষ্ট না পৌঁছে।

॥ একটি জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্মকথা ॥

সামাজিক আচরণের মাস্‌আলা কোরআন শরীফে কয়েক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, এক আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কাহারও ঘরে প্রবেশ করিও না।" আর প্রথমে আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়াছি তাহা হইতেও সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত মাস্‌আলা বুঝাইতেছে। যেমন, আমি তখন বলিয়াছি যে, এই আয়াতে সামাজিক আচরণ সংক্রান্ত দুইটি মাস্‌আলা উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে একটি এল্‌মী সূক্ষ্ম কথাও আছে। তাহা এই যে, দুইটি নির্দেশ এখানে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম নির্দেশটিকে দ্বিতীয় নির্দেশের উপর অগ্রবর্তী কেন করা হইল?

ইহার কারণ আমার এই মনে হইতেছে যে, এতদুভয়ের মধ্যে যেহেতু দ্বিতীয় নির্দেশটি প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। কেননা, تَفَسَّحُوا অর্থাৎ, "মজলিসে স্থান করিয়া দাও" নির্দেশটির মধ্যে মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। আর انْشُزُوا অর্থাৎ, "উঠিয়া যাও" নির্দেশটির মধ্যে একেবারে মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতেই বলা হইয়াছে। এই কারণেই মজলিসে স্থান করিয়া দেওয়ার নির্দেশটি আগে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেন তা'লীম এবং আ'মলের মধ্যে ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। অর্থাৎ প্রথমে সহজ নির্দেশ অনুযায়ী আমল করিলে এবাদতের অভ্যাস হইবে। অতঃপর অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজও সহজ হইয়া যাইবে এবং ইহাও বিচিত্র নহে যে, দ্বিতীয় নির্দেশটি পালনের বিনিময়ে মরতবা উন্নত করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এই জন্যই দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশটি নফসের উপর অধিকতর কঠিন। কেননা, ইহাতে লজ্জা হয়; সুতরাং ইহা পালন করা চরম পর্যায়ের বিনয় ও নম্রতা বটে। আর বিনয় ও নম্রতার পুরস্কার উচ্চ মর্যাদা। এই কারণেই ইহার প্রতি উচ্চ মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। অতএব, এই আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ দুইটির মধ্যে এবাদতের অনুসারে এই ব্যবধান হইল যে, প্রথম আমলের জন্য সচ্ছলতা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যাহা স্বভাবতঃ ধন-দৌলতের সাহায্যে লাভ করা যায় এবং

ধন-দৌলত নিম্নস্তরের কাম্য বস্তু। আর দ্বিতীয় নির্দেশ অনুযায়ী আমলের বিনিময়ে উচ্চ মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। যাহা পদমর্যাদার উছিলায় লাভ হইয়া থাকে এবং পদমর্যাদা ধন-দৌলতের তুলনায় উচ্চতম স্তরের কাম্য। বস্তুতঃ এই ব্যবধান হওয়ার মূল কারণ এই যে, প্রথম কাজটি নাফ্‌সের পক্ষে সহজ ছিল। অতএব, উহার প্রতিফল দ্বিতীয় শ্রেণীর। আর দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়া নফ্‌সের জন্য খুবই কঠিন। অতএব, উহার, বিনিময়ও অতি উন্নত স্তরের ঘোষণা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কাজটির জন্য যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার সারমর্ম যেন এই—من تواضع لله رفعه الله "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নম্র হয় আল্লাহ্ তাহাকে উন্নত করেন।" অর্থাৎ, দ্বিতীয় নির্দেশটি পালনে যেহেতু চরম পর্যায়ের নম্রতা অবলম্বন করিতে হয় কাজেই উহার ফল দেওয়া হইয়াছে—উচ্চ মর্যাদা।

আয়াতের এবারতে নির্দেশ দুইটির মধ্যে আর একটি প্রভেদ এই যে, প্রথম নির্দেশের ফল ঘোষণায় لكم "তোমাদের জন্য" শব্দে সকলকে ব্যাপকভাবে লক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তে "তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন।" আর দ্বিতীয় নির্দেশটির ফল ঘোষণায় বলিয়াছেন:

يرفع الله الذين امنوا منكم

والذين اوتوا العلم درجت এখানে মুমেন ও আলেমদিগকে খাছ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রথম ফলের বেলায় সমস্ত মুমেনকে সমানভাবে লক্ষ করিয়া ব্যাপকভাবে সম্বোধন করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় ফলের বেলায় সমস্ত মুমেনকে ব্যাপকভাবে লক্ষ করার পর নির্দিষ্টরূপে আলেমদিগকেও লক্ষ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া কোন কঠিন কাজ ছিল না। ইহাতে নিয়ত পরিষ্কার ও খাঁটি না হওয়ার সম্ভাবনা খুব অল্প ছিল। অতএব, এই নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সমস্ত মুমেনই প্রায় সমান হইবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা খুবই কঠিন। ইহাতে কেহ কেহ শুধু লৌকিকতার খাতিরে উঠিয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা আছে। অথচ ভিতরে খাঁটি নিয়তের অভাব রহিয়াছে এবং নিয়ত খাঁটি করার মধ্যে এল্‌মের অধিকারই বেশী। কেননা, এলমের সাহায্যেই খাঁটি নিয়তের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায়। এই কারণেই এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে সমস্ত মুমেনকে লক্ষ্য করার পর খাছভাবে আলেমদিগকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেননা, আলেমদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনের উৎস অধিকতর পাওয়া যাইবে। সুতরাং খাঁটি নিয়তের মধ্যে অপরাপর মুমেন অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর অগ্রগামী হইবেন।

॥ সামাজিক আচরণ সংশোধনের ফল ॥

এই আয়াতে আরও একটি কথা বুঝা যায়, সামাজিক আচরণ সংশোধনের বিনিময়ে আখেরাতেও ফল পাওয়া যায়। ইহাতে একথার ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, শরীয়তের যে সমস্ত বিধানকে তোমরা শুধু দুনিয়া মনে করিতেছ উহা মানিয়া চলিলেও তোমরা আখেরাতে সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আয়াত হইতে একথাটি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কেননা, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং উঠিয়া দাঁড়ান উভয়টিই ব্যবহারিক কাজ এবং উহাদের বিনিময়ে আখেরাতের পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে কোন কোন বক্র স্বভাবের লোক লিখিয়াছে, মৌলবীরা শরীয়তকে তুমারে পরিণত করিয়াছে। রুটি ছেঁড়ার মধ্যেও শরীয়তের নির্দেশ, পানি পান করার মধ্যেও শরীয়তের নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে একটি বেদনাময় কাহিনী আমার মনে পড়িয়াছে ঃ

এক ব্যক্তি "শোআবে ঈমানিয়াহ্" অর্থাৎ ঈমানের শাখা সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করিয়া সংশোধনের নিমিত্ত আমার নিকট পাঠাইল। তাহাতে সে লিখিয়াছে, "আমি এই কিতাবটি আমার জনৈক উকীল আত্মীয়ের নিকট দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আমার কিতাবটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—এসমস্ত বিষয় যদি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, তবে ঈমান (نعوذ باالله) শয়তানের নাড়িভুঁড়ি হইল।" এই কুফরী উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া কিতাবের লিখক অতিশয় আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার উত্তরে লিখক সেই উকীলকে যে পত্র লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছে, উহার মুশাবিদাও সংশোধনের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিল।

আমি লিখিলাম, "আপনি যে উত্তর দিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহা পাঠাইয়া দেওয়া আপনার ইচ্ছা। কিন্তু এই লোকটি সম্পূর্ণরূপে বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে, কাজেই আপনার এই লেখা ফলপ্রসূ হওয়ার কোনই আশা নাই। এই লেখায় সে সোজা পথে আসিবে না। তাহার প্রকৃত উত্তর এই যে, তাহাকে আল্লাহ্‌র সপর্দ করিয়া দিন। যদি হতভাগার এতটুকু জানা না ছিল যে, এইগুলি ঈমানের শাখা, তবে এই কথাটি ভদ্রোচিত ভাষায় লিখিতে পারিত। কিন্তু তাহার কলুষিত আত্মার অপবিত্র মনোভাব তাহাকে ভদ্র ভাষা ব্যবহারের অনুমতি কেন দিবে? আসল কথা এই যে, এল্‌ম্ অথবা আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংসর্গ লাভ ভিন্ন ঈমানেরও ভরসা নাই। দেখুন জাহেল হওয়ার কারণে কেমন কুফরী উক্তি করিয়া বসিল। কেন? বন্ধুগণ বলুন। এই ব্যক্তিকেও যদি কাফের বলা জায়েয না হয়, তবে তো কুফরীও ইস্‌লামেরই অন্তর্ভুক্ত। লোকে বলে, মৌলবীরা কাফের বানাইয়া দেয়। বন্ধুগণ ইন্‌সাফ করুন। "মৌলবীরা কাফের বানাইয়া দেয়" কথাটি তো তখনই শুদ্ধ হইতে পারে যখন তাঁহারা কোন কুফরী উক্তি কিংবা কোন কুফরী কাজ শিখাইয়া দেয়। কিন্তু যখন মানুষ

নিজেই নিজের মূর্খতা এবং কলুষিত মনোভাবের দরুন কুফরী উক্তি করিয়া বসে, তখন মৌলবীরা তাহাদিগকে কেমন করিয়া কাফের বানাইল ? তাহারা তো নিজেরাই কাফের বনিল। অবশ্য আলেমগণ তাহা বলিয়া দেন। অতএব, আলেমগণ মানুষকে কাফের বানায় না ; যাহারা নিজের কর্মফলে কাফের হয়, তাহাদিগকে বলিয়া দেয়, তোমরা কাফের। کافر بنا دیتے هیں আর کافر بتا دیتے هیں কথা দুইটির মধ্যে মাত্র একটি (০) নুক্‌তার পার্থক্য।

মোট কথা, এই প্রকারের লোকেরা দাবী করিয়া থাকে যে, সামাজিক আচরণ শরীয়তের অংশ নহে। তাহাদের দাবী খণ্ডনের জন্য এই আয়াতটিই সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট। এই খণ্ডন দুই প্রকারে করা যায়—এক প্রকার এই যে, উভয় নির্দেশের মধ্যেই আদেশবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মূলতঃ উক্ত নির্দেশ দুইটি পালন করা ওয়াজেব বলিয়াই বুঝা যায়, আর আসল হইতে পরিষ্কার কোন দলিল নাই। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, এই দুইটি নির্দেশ পালনের জন্য সওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে এবং ধর্মীয় কাজের বিনিময়েই সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, যে কাজকে তোমরা দুনিয়া মনে করিতেছ, তাহাতেও যদি শরীয়তের নির্দেশ মানিয়া চল, তবে উহাতেও সওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আর ইহাতে আনুগত্যের ফযীলতও জানা গেল, অর্থাৎ যদি শরীয়তের সাধারণ একটি নির্দেশও পালন করা হয়, তবে উহাও সওয়াবশূন্য হয় না।

॥ আ'মল কবুল হওয়ার শর্ত ॥

এই আয়াত হইতে আরও একটি কথা বুঝা যাইতেছে যে, আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। কেননা পুরস্কার বর্ণনার বেলায় الذين امنوا منكم। "অর্থাৎ, "যাহারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করিয়াছে" শর্তটি উল্লেখ করা হইয়াছে। আর যদি কেহ সন্দেহ করে যে, প্রথম নির্দেশে তো لكم (তোমাদের জন্য) ব্যাপক ভাবে বলা হইয়াছে, মুমেনের সহিত খাছ করা হয় নাই। তবে উত্তরে বলা হইবে যে, এখানেও كم (তোমাদের) সর্বনামটির উদ্দেশ্য শুধু মুমেনের। কেননা, এস্থলে পূর্ব হইতে মুমেনদিগকে লক্ষ করিয়াই নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু দ্বিতীয় নির্দেশটিতে যেহেতু ব্যাপক লক্ষের পরে খাছ লক্ষ করা উদ্দেশ্য ছিল, যেমন আমি পূর্বেও বলিয়াছি, সুতরাং الذين امنوا। শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা সমীচীন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু আয়াত দ্বারাও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব, এই আয়াত দ্বারা এবং অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে, ঈমান ভিন্ন কোন আমল কবুল হয় না।

এই মাস্‌আলাটি হইতে সাধারণ লোকদের কাজে আসার মত একটি কথা প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ কোন কোন সাধারণ লোক, যাহারা বুযুর্গ লোকের সাক্ষাৎ লাভের জন্য আগ্রহশীল থাকে, তাহাদের মধ্যে এমন ভেদ-জ্ঞান-হীনতা আসিয়া গিয়াছে যে, সংসারের যাবতীয় সম্পর্ক বর্জনকারী হিন্দুদিগকেও বুযুর্গ মনে করিয়া থাকে। আর ঐ সমস্ত মুসলমানকেও যাহারা শরাব পান করিয়া মাতাল অবস্থায় কিংবা উন্মাদ রোগে আবল তাবল বকিতে থাকে তাহাদিগকে 'মাজ্‌যুব' মনে করে। তাহারা মাজ্‌যুব লোকের নিদর্শন নিজের মনগড়া এই নির্ণয় করিয়া লইয়াছে যে, যদি তাহার পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়া দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ ফিরাইবে। বস্তুত প্রথমতঃ ইহা তাহার জানিতে পারার প্রমাণ নহে। এমনও হইতে পারে যে, সে ঘটনাক্রমে হঠাৎ সেদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, খুব বেশী হইলে ইহা দ্বারা তাহার কাশ্‌ফ হওয়ার প্রমাণ হইতে পারে। কাশফ্‌ কোন বড় কামালিয়ৎ নহে। কাফেরও যদি চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তাহারও কাশফ্‌ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পাগলেরও অন্তর-চক্ষু কোন কোন সময় খুলিয়া যায়। যেমন "শরহে আসবাব" কিতাবের রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, পাগলেরও কাশ্‌ফ হয়। আমি নিজে একজন পাগলিনীকে দেখিয়াছি, তাহার কাশ্‌ফ এত হইত যে, কোন বুযুর্গ লোকেরও তেমন হয় না। কিন্তু যখন তাহার জুলাব হইল, তখন উন্মাদনার মাদ্দার সাথে সাথে কাশ্‌ফও বাহির হইয়া গেল। অতএব, বুঝা গেল যে, কাশফ হওয়া মাজ্‌যুব হওয়ার প্রমাণ নহে।

ফলকথা, সাধারণ লোকের পক্ষে একথা জানা কঠিন যে, এই ব্যক্তি মাজযুব, আর যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, এই নিদর্শনের দ্বারা তাহার মাজ্‌যুব হওয়া সাব্যস্ত হইল। তুমি মাজ্‌যুবকে তো খুঁজিয়া বাহির করিলে, কিন্তু হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকের বেআদবী করিলে। কেননা, ইচ্ছা করিয়া তাহার পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়া দুরূদ শরীফ পড়িলে।

॥ সালেক এবং মাজ্‌যুবের পথ ॥

তদুপরি কথা এই যে, সে মাজ্‌যুব হইলে তোমার কি লাভ হইল। মাজযুব হইতে দুনিয়ারও কোন ফায়দা হয় না, আখেরাতেরও না। কেননা, ফায়দা নির্ভর করে তা'লীমের উপর। অথচ তাহার দ্বারা কোন তা'লীম হাছিল হয় না, পরন্তু দুনিয়ার ফায়দা হয় দোআয়। অথচ মাজ্‌যুব কাহারও জন্য দোআ করে না। কেননা, তাঁহারা সাধারণ কাশ্‌ফের দ্বারা জানিতে পারেন যে, অমুক ব্যাপারটি এইরূপে হইবে। অতএব, উহার অনুকূলে দোআ করা—অর্জিত অর্জনের শামিল। আর বিপরীত দোআ

করা তাক্‌দীরের সহিত বিরোধিতা করা। অবশ্য তাঁহারা কাশফের ভিত্তিতে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করিয়া থাকেন যে, ব্যাপারটি এইরূপ হইবে। অথচ তিনি না বলিলেও এইরূপই হইত, কাজেই তাঁহার ভবিষ্যৎবাণীর কারণে এইরূপ হয় নাই। হাঁ, সালেক দ্বারা সর্বপ্রকারের ফায়দা হইয়া থাকে। কেননা, সেখানে তা'লীমও হয় এবং দোআও হয়; বরং মাজ্‌যূবের ফেকেরে পড়িলে ক্ষতি এই হয় যে, মানুষ শরীঅতকে বেকার মনে করিতে থাকে।

সারকথা এই যে, ঈমানবিহীন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র প্রিয় মনে করা সম্পূর্ণরূপে কোরআনের বিরোধিতা করা। সুতরাং যোগী ও জাহেল ফকিরের পাছে পাছে ঘুরা নিজের আখেরাত বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

॥ আলেম ও মুমেনের মরতবা ॥

এই আয়াতটি হইতে আরও একটি কথা এই বুঝা যায় যে, আলেম ব্যক্তি সাধারণ ঈমানদার হইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, বালাগাতের নিয়মানুসারে প্রশংসার ক্ষেত্রে প্রথমে ব্যাপকরূপে বর্ণনা করিয়া উহার কোন অংশকে পরে খাছ করিয়া বর্ণনা করিলে ইহাতে খাছ অংশটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এখন আমি আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে বর্ণনা করিব না। আবার কখনও সুযোগ পাইলে ইন্‌শাআল্লাহ্ তাহা বর্ণনা করিব।

এই আয়াতটি হইতে আরও একটি কথা বুঝা যায় যে, সাধারণ মুমেন যদিও সে জাহেল হয়, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রিয়। অতএব, সাধারণ মুমেনকেও হীন এবং নীচ মনে করা উচিত নহে। সুতরাং প্রত্যেকটি মুমেন যদি ফরমাঁবরদার হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হয়। আর ফরমাঁবরদার হওয়ার শর্ত এই জন্য লাগান হইয়াছে যে, বেহেশ্‌তে স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং মর্যাদা উচ্চ করিয়া দেওয়া, যাহার দ্বারা ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে—এবাদতে এবং ফরমাঁবরদারীর পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। কেননা, এখানে উহ্য ও পূর্ণ কথাটি এই :

تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ اِنْ تَتَفَسَّحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا

فَانْشُزُوْا اِنْ تَنْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ لَكُمْ -

ইহার অর্থ এই যে, যখন এই দুইটি নির্দেশ তোমরা পালন করিবে, তখন তোমরা এসমস্ত মরতবা লাভ করিবে। আয়াতের এই অর্থটি বর্ণনা করিয়া—যেমন আলেমদের সংশোধন উদ্দেশ্য যেন তাঁহারা সাধারণ মুমেনদিগকে হীন ও নীচ মনে না করেন। তদ্রূপ এল্‌মবিহীন অহংকারী মুমেনদের সংশোধনও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, জোলা ও তেলীদিগকে নীচ মনে করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। কেননা, আয়াতে

বুঝা যায়—শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নির্ভর করে ঈমান এবং ফরমাঁবরদারীর উপর, সে যেই শ্রেণীর লোকই হউক না কেন।

॥ না-ফরমান ও মুমেনের সহিত ব্যবহার ॥

এই আয়াতটির আরও একটি অর্থ আছে। একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। অর্থাৎ, মজলিস হইতে উঠিয়া যাওয়ার নির্দেশটি পালনের বিনিময়ে যে ফলটির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার বর্ণনা-ভঙ্গী এক বিশেষ ধরণের। অর্থাৎ, এইরূপ বলিয়াছেন :

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجت অথচ

يرفعكم والذين اوتوا العلم বলিলেও চলিত। অর্থাৎ, الذين امنوا منكم-এর স্থলে শুধু كم বলিলেও চলিত। কিন্তু তদ্রূপ না বলিয়া সর্বনামের পরিবর্তে উহার প্রকাশ্য শব্দটি বলার মধ্যে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই উচ্চ মর্যাদা লাভের মধ্যে ঈমানের অধিকারই বেশী। অতএব, ইহা হইতে একথাটি পাওয়া যায় যে, যদি কোন মুমেন পুরাপুরি ফরমাঁবরদার নাও হয় কিন্তু ঈমান আছে, সে ব্যক্তিও আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে কিছু না কিছু মর্যাদা লাভ করিবেই। অতএব, যাহারা গুনাহ্‌গার মুমেন, তাহাদিগকেও হীন মনে করিও না। অবশ্য যদি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাহাদের মন্দ কার্যের জন্য তাহাদের প্রতি রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হও তাহা জায়েয হইবে। কিন্তু তৎসঙ্গে তাহার প্রতি সহানুভূতি এবং দয়াও থাকা আবশ্যক। ব্যক্তিগত রাগ এবং অহংকার যেন না হয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার জন্য আমি একটি স্থূল দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। আমার জনৈক বন্ধু এই দৃষ্টান্তটিকে খুব পছন্দ করিয়াছেন। তিনি পছন্দ করার কারণে আমার নিকটও ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ, সাধারণ ঘটনায় দুই ক্ষেত্রে অসন্তোষ ও রাগের উদ্রেক হইয়া থাকে। একটি ক্ষেত্র অপরিচিত লোক আর একটি ক্ষেত্র নিজের পুত্র। অপরিচিত লোকের দুষ্ট চরিত্র দেখিলে তাহার প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা জন্মে। আর নিজের পুত্র যদি সেই কাজই করে, তবে তাহার প্রতি ঘৃণা হয় না; বরং দয়ার সাথে সাথে আফসুসও হয় এবং তাহার সংশোধনের জন্য নিজেও দোআ করে অন্য লোকের দ্বারাও দোআ করায়। তাহার অবস্থার জন্য মন দুঃখিত হয়। কিন্তু পুত্রের প্রতি যে রাগ জন্মে উহার সহিত দয়া মিশ্রিত থাকে।

অতএব, ইস্‌লামী ভ্রাতৃত্বের দাবী হইল, অপরিচিত একজন মুমেন গুনাহ্‌গারের সাথেও পুত্রের ন্যায়ই ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ, যদি কোন সময় এরূপ লোকের প্রতি

রাগ আসে এবং ধারণা হয় যে, আমার এই রাগ খোদার জন্যই হইয়াছে। ইহাতে নিজের নাফ্‌সের কোন সম্পর্ক নাই। তখন দেখিতে হইবে, এই ব্যক্তি যদি অপরিচিত না হইয়া আমার পুত্র হইত, তবে এরূপ কাজে তাহার প্রতি আমি রাগান্বিত হইতাম কি না। যদি মন বলে যে, "গোস্বা হইত না," তখন বুঝিতে হইবে যে, এই গোস্বা খোদার জন্য নহে ; বরং আত্মম্ভরিতার কারণে তাহার প্রতি রাগ জন্মিয়াছে। ইহা ঐ ব্যক্তির নাফরমানী অপেক্ষাও অধিক নাফরমানী এবং ভয়ংকর ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'আলার অবস্থা এই যে, কোন গুনাহ্‌গার যদি গুনাহের দরুন নিজেকে হীন ও নিকৃষ্ট মনে করে, তবে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে একজন নেককার ফরমাঁবরদার লোক যদি নিজেকে বড় মনে করে, তবে সে খোদার কোপে পতিত হয়। অতএব, খোদা প্রাপ্তি কারণে গর্বিত হওয়া উচিত নহে আর খোদার দয়া হইতে নিরাশ হওয়াও উচিত নহে। ফলকথা, কোন মুসলমানকে হীন মনে করিবে না। কিন্তু পাপী মুমেনের প্রতি খোদার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হইলে যদি উহার সহিত সহানুভূতি এবং দয়া মিশ্রিত থাকে, তবে কোন ক্ষতি নাই।

॥ অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা ॥

অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আমাদের ওখানে নামায রোযার 'পাবন্দ' একটি মেয়ে ছিল। (এখন সে মৃতা)। এমন একজন পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল, যে নামায রোযার তত 'পাবন্দ' ছিল না। একদিন মেয়েটি বলে, আল্লাহ্‌র এমনই শান্! আমি এমন পরহেযগার এবং খোদাভক্ত আর আমার বিবাহ হইল এমন একজন লোকের সহিত।

বন্ধুগণ! কেমন বোকামির কথা! কেননা, কেহ যদি বুযুর্গও হয়, তবে সে কিসের জন্য গর্ব বোধ করিবে ? বুযুর্গীর জন্য গর্ব বোধ করার দৃষ্টান্ত তো ঠিক এইরূপ, যেমন কোন রোগী ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া গর্ব করিতে আরম্ভ করে যে, আমি এমন একজন বুযুর্গ লোক যে, আমি ঔষধ সেবন করিয়াছি। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন তুমি ঔষধ সেবন করিয়াছ, ইহাতে কাহার উপর অনুগ্রহ করিয়াছ এবং এমন কি গুণের কাজ করিয়া ফেলিয়াছ ? না করিলে জাহান্নামে যাইতে। অবশ্য গর্ব করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলার শোক্‌র করা উচিত। তিনি তোমাকে তাঁহার বন্দেগী করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন। সারকথা এই যে, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হইতে ইহাও বুঝা গেল যে, গুনাহ্‌গার মুমেনও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সম্মান হইতে বঞ্চিত নহে।

॥ আমল কবুল হওয়ার মাপকাঠি ॥

এই আয়াতের আরও একটি অর্থ এই যে, الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم বাক্যে ব্যাপকতার পর বিশিষ্ট ভাবে বলা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আমল কবুল হওয়ার তারতম্য খাঁটি নিয়তের পরিপ্রেক্ষিতে হইয়া থাকে। কেননা, আলেমদের মরতবার পার্থক্য এই খাঁটি নিয়তের কারণেই হইয়াছে, যেমন একটু পূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি। এই মাস্আলাটি এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ এই জন্য হইয়াছে যে, আজকাল মানুষ আ'মলের প্রতি বেশ আগ্রহশীল, কিন্তু খাঁটি নিয়তের প্রতি অধিকাংশ লোকেরই লক্ষ্য নাই। অথচ খাঁটি নিয়ত এমন একটি বস্তু যাহার ফলে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এমন উন্নত মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন যে, আমরা ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করিলেও তাঁহাদের অর্ধ মুদ (আধা সের) যব দান করার সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারি না।

কেহ যদি বলেন যে, হুযুর আকরাম(দঃ)এর পবিত্র সংসর্গের বদৌলতে তাঁহাদের আমলের এই মর্যাদা ছিল। আমি বলিব, খাঁটি নিয়ত ও সংসর্গের ফলেই হইয়াছিল। অতএব, হুযুরের সংসর্গ এবং খাঁটি নিয়ত এই দুইটি বিষয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। এখন আপনার ইচ্ছা হইলে সংসর্গকেও কারণ বলিতে পারেন, খাঁটি নিয়তকেও বলিতে পারেন। অবস্থাটি ঠিক এইরূপ :

عباراتنا شتى وحسنك واحد + فكل الى ذاك الجمال يشير

"আমাদের বর্ণনা-ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য একই। প্রত্যেক বর্ণনাকারী তোমার সেই সৌন্দর্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া থাকে।" অর্থাৎ, সমস্তই একই সৌন্দর্যের বর্ণনা।

আমি আমার মুরশিদ্ হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আরেফ (আল্লাহ্‌ওয়ালা) লোকের এক রাক'আত নামায মা'রেফাৎবিহীন লোকের এক লাখ রাকাআতের চেয়ে উত্তম। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের মা'রেফাতের কারণে তাঁহার এক রাকআতেই খাঁটি নিয়ত অধিক।

এই অর্থে আরও একটি কথা আলোচ্য আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, আজকাল অনেকে কোন কোন ইংরেজী শিক্ষিত লোকের প্রশংসা করিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি ইংরেজী শিক্ষিত হইলেও কোরআনের খুব পাবন্দ, কিংবা বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা খাঁটি নিয়ত প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করে না। আমিও দীর্ঘকাল যাবৎ এই ধোকায় পতিত ছিলাম। কিন্তু আমার একজন যুবক বন্ধু এই শ্রেণীর লোকদের

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, কোন কোন মানুষের মধ্যে ধার্মিকতার আকৃতি ও বেশ-ভূষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বীনের মূলবস্তু তাহাদের মধ্যে নাই। অর্থাৎ, তাহাদের অন্তরের মধ্যে ধর্মের রং ধরে না। এইরূপে এসমস্ত লোকের অন্তরে ধর্মের কোন শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহব্বতও থাকে না। যদিও বাহিরে ধর্ম-কর্মে তাহাদিগকে খুব পাবন্দ দেখা যায়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহাদের মধ্যে ধর্মের জন্য কোন খাছ গুরুত্ব এবং মহব্বত নাই। ইহা না থাকিলে বলিতে হইবে, কিছুই নাই। কেননা, ইহাই প্রকৃত দ্বীনদারী। অর্থাৎ, যাহার অন্তরে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ধর্মের মহব্বত ঘর করিয়া লইয়াছে যদিও কদাচ কোন বাহ্যিক কারণে তাহাদের আ'মলের মধ্যে কিছু ত্রুটিও দেখা যায়। সম্মুখের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আমল সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।" অত্র আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যের সহিত এই আয়াতটির সম্পর্ক রহিয়াছে। অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকটি হুকুম মান্য কর। উহাতে ত্রুটি করিও না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অভ্যন্তরেরও খবর রাখেন। অতএব, তিনি তোমাদের এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও জানিতে পারিবেন যাহা তোমাদের অন্তরেও থাকিবে।

॥ একটি সহজ মুরাকাবা ॥

এই বাক্যটি দ্বারা খোদা তা'আলা যেন আপন বান্দাগণকে একটি বিষয়ের মুরাকাবা শিখাইয়াছিলেন। সেই বিষয়টি স্মরণ রাখিলে বান্দা কখনই কোন আমলে ত্রুটি করিবে না। অর্থাৎ, সর্বদা মনে রাখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভিতর ও বাহিরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন। অবিরতভাবে একথা স্মরণ রাখিলে একটি 'হাল' উৎপন্ন হইবে এবং রুচির সাহায্যেই সে বুঝিতে পারিবে যে, যেন আমি খোদাকে দেখিতেছি। আর কোরআন ও হাদীসে এই প্রকারের যতগুলি বিষয় আছে' সবগুলিই মুরাকাবা। ইহাতে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এবাদতের প্রকৃত ও দৃঢ় অবস্থা তখনই উৎপন্ন হইবে যখন এই মুরাকাবার কথা মনে হাজির থাকিবে। কেননা, যখন এই ধারণা দৃঢ় হইয়া যাইবে যে, আমার এই কাজটি সম্বন্ধে বিচারক স্বয়ং অবগত আছেন, তখন সে কাজে আর ত্রুটি হইতে পারে না। এই মুরাকাবাটি খুবই সহজ। ইহাতে মূলতঃ কোন পীরের, কিংবা কোন নির্জনতা ইত্যাদি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকেই এই মুরাকাবার দ্বারা লাভবান হইতে পারে। কিন্তু এখন কতকগুলি বাহ্যিক কারণ এমন সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কিছু পরিমাণ নির্জনতা এবং কিছু পরিমাণ কামেল পীরের পরামর্শেরও দরকার হয়। কেননা, আজকাল এল্‌ম ও আমলের মধ্যে এক প্রকার দুর্বলতা আসিয়া গিয়াছে।

॥ আ'মলের শর্ত ॥

ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, প্রত্যেক কাজে দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সিদ্ধান্ত নিখুঁত হওয়া, দ্বিতীয়তঃ, সাহস। আমাদের মধ্যে উভয় বিষয়েরই অভাব। সিদ্ধান্তের অভাব এই যে, অনেক সময় কোন কোন কাজের উদ্দেশ্য এবং প্রেরণা সম্বন্ধে আমরা একটি বিষয়কে মন্দ বলিয়া মনে করি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা ভাল, আবার কোন সময় কোন বিষয়কে আমরা ভাল মনে করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা মন্দ। এইরূপে কোন সময় সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও কোন কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহস নষ্ট হইয়া যায়। অতএব, কামেল পীর যেহেতু অভিজ্ঞ এবং অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন, কাজেই তাঁহার নিকট হইতে সিদ্ধান্ত স্থির করা সম্বন্ধেও সাহায্য পাওয়া যায় এবং তাঁহার পরামর্শ বা নির্দেশে কিছু বরকতও থাকে। উহার ফলে সাহসও বৃদ্ধি পায়। আর ইহার আদি বা মূল উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, ইহা অবশ্যই কুদরতী বিষয়। যখন কাহাকে পীর সাব্যস্ত করিয়া লওয়া হয়, তখন সাধারণতঃ তাঁহার কথার বিরোধিতা কম করা হয়। অতএব, সিদ্ধান্ত নিখুঁত করিবার এবং সাহস দৃঢ় করিবার জন্য স্বভাবতঃ কামেল পীর ভিন্ন অন্য কোন উপলক্ষ নাই, সুতরাং مقدمة الواجب واجب "ওয়াজেব কাজের সূচনাও ওয়াজেব" এই নীতি অনুসারে কাজ বিশুদ্ধরূপে করার জন্য কামেল পীরের আশ্রয় নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

॥ কামেল পীরের পরিচয় ॥

যাহাকে পীর সাব্যস্ত করিবে তিনি কামেল লোক হইতে হইবে। কামেল পীর চিনিয়া লইতে অনেক সময় লোকে ভুল করিয়া বসে। সুতরাং তাঁহার পরিচয় জানিয়া লওয়া আবশ্যক। পরিচয় নিম্নরূপ :

১। আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী এল্‌ম থাকা চাই। তাহা পড়া শুনা করিয়াই হউক কিংবা আলেমদের সংসর্গে থাকিয়াই হউক।

২। শরীয়ত অনুযায়ী সঠিক আমল থাকা চাই।

৩। তরীকত-শিক্ষার্থীদিগকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হইতে বারণকারী হওয়া চাই।

৪। সর্বজন মানিত কোন কামেল পীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা চাই।

৫। আলেমদিগকে ঘৃণা না করেন এবং তাঁহাদিগ হইতে ফায়দা হাছিল করাকে লজ্জাকর মনে না করেন।

৬। তাঁহার মধ্যে এমন বিশেষত্ব থাকা চাই যে, তাঁহার সংসর্গ অবলম্বনে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ এবং দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা জন্মে।

যে ব্যক্তির মধ্যে এই চিহ্নগুলি পাওয়া যাইবে, তিনিই কামেল, এরূপ কামেল লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইবে। ইহাই ছিল আমার বক্তব্য বিষয়— যাহা এখন বর্ণনা করা আমি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। এখন আল্লাহ্ তাআ'লার দরবারে দোআ করুন, তিনি যেন আমাদিগকে আ'মলের তাওফীক দান করেন এবং ঈমানের সহিত আমাদের জীবনাবসান করেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

আক্‌বারুল আ'মাল

হিজরী ১৩৪৮ সনের ১৮ই জমাদাস্‌সানী, বৃহস্পতিবার দিন, হযরত থানবী (রঃ) আপন ছোট বিবীর গৃহে, প্রায় ৬০ জন স্ত্রী ও পুরুষ শ্রোতৃবর্গের উপস্থিতিতে, আল্লাহ্‌র যেকেরের হাক্বীক্বত এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সোয়া দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপী এই ওয়াযটি করিয়াছেন। মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওস্‌মানী ছাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

o

আজকাল ওয়ায়েযগণ আমলের ফযীলতই অধিক বর্ণনা করিয়া থাকেন। অথচ আমলের ফযীলত অনেকেরই জানা আছে। অবশ্য উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অমনোযোগী যদিও তাহা ধর্মের প্রতীক শ্রেণীর অন্তর্গতই হউক না কেন? অথচ কোন কোন আমল যদিচ ধর্মের প্রতীক জাতীয় নাও হয়, কিন্তু তাহা ধর্ম-প্রতীক জাতীয় আমলের মুল ও শিকড়। যেমন অনুভবনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে ফল ও পাতার প্রতিই লোকের দৃষ্টি থাকে অথচ শিকড়ের দিকে কেহ দৃষ্টি করে না। এইরূপে শরীঅতের কার্যগুলিরও মূলাধার সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। কেবল শাখা-বিধানসমূহের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি। ইহা একটি বড় ত্রুটি।

●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ *

॥ বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা ॥

আমি যে আয়াতাংশটি তেলাওয়াত করিলাম তাহাতে দুইটি বাক্য রহিয়াছে। এখন কেবল প্রথম বাক্যটি সম্বন্ধে বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বাক্যটি কেবল বরকতের জন্য পাঠ করিলাম। আমার এখন শুধু وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ বাক্যটি সম্বন্ধে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। শ্রোতৃমণ্ডলী খুব সম্ভব এই বাক্যটি তেলাওয়াত করাতেই হয়ত বুঝিয়া ফেলিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ আপনাদের 'যেহেন্' ও এদিকেই ধাবিত হইয়াছে যে, আমি যেক্‌রুল্লাহ্‌র ফযীলত বর্ণনা করিব। কেননা, আজকাল ওয়ায়েযগণ বেশীর ভাগ আমলের ফযীলতই বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি ফযীলত বর্ণনা করিতে চাই না। কারণ আজকাল আমলের ফযীলত অনেকেই জানে। অবশ্য উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গাফেল ও উদাসীন যদিচ তাহা ধর্মের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আমলই হউক না কেন। আর যে সমস্ত আমল ধর্মের প্রতীকসমূহের অন্তর্গত নহে, কিন্তু ধর্মের মূল ও শিকড়, তাহা ধর্মের প্রধান অঙ্গগুলির চেয়ে কম নহে। কিন্তু সাধারণতঃ সেগুলিকে জরুরী মনে করা হয় না। যেমন অনেক লোক গাছের ফল ও পাতা চিনে। তাহারা বাগানে যাইয়া ফল এবং পাতাই দেখে শিকড়কে কেহই দেখে না, সেদিকে কাহারও কল্পনাও যায় না। কেননা, ফল ও পাতার সহিত শিকড়ের সম্পর্ক অদৃশ্য বলিয়া এই সম্পর্ক দলিল দ্বারা প্রমাণ করার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব, অনুভবনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে উহাদের শিকড়ের বা মূলের প্রতি যেমন লোকের মনোযোগ কম, তদ্রূপ শরীয়তের কার্যসমূহেও আমাদের অবস্থা অবিকল সেইরূপ। অর্থাৎ আমরা মূল বস্তু হইতে গাফেল থাকিয়া কেবল শাখার প্রতি লক্ষ্য করিতেছি। এজন্য আমলের ফযীলতের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি, প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য কম। ইহাতে সাধারণ লোকের দোষ বেশী নহে ; বরং আমাদের দোষই অধিক। কেননা, আমরা তা'লীম প্রদানকারীরাও ফযীলতই অধিক বর্ণনা করিয়া থাকি। প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করি না মোটেই। আর ইহাই বড় ত্রুটি। অতএব, আমি প্রয়োজনীয়তাই বর্ণনা করিব।

॥ ধর্মের প্রতীকসমূহ এবং উহাদের মূলতথ্য ॥

আয়াতটির অনুবাদ এই, আল্লাহ্‌র যেকের অত্যন্ত বড় জিনিস। বাহ্যতঃ একথা হইতে মানুষ ইহাই মনে করিয়া থাকিবে যে, শুধু ফযীলতের কারণেই বড় জিনিস। কিন্তু ইহা ছাড়াও যেক্‌রুল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয়তার কারণেও শ্রেষ্ঠ বস্তু। এই হিসাবে উহা মূলেই একটি শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং অন্যান্য দরকারী আমলেরও মূল।

যদিও ইহা ধর্মের প্রধান চিহ্নগুলির অন্তর্গত নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ধর্মের প্রধান প্রতীকসমূহেরও মূল।

ধর্মের প্রতীক বলিতে ঐ সমস্ত আমলই বুঝিতে হইবে যাহা ইসলামের প্রকাশ্য চিহ্ন। যাহা দেখিয়া অপর লোকে বুঝিতে পারে যে, এই কার্যসমূহ পালনকারী মুসলমান। কিন্তু ইহা জরুরী নহে যে, যাহা ইস্‌লামের প্রকাশ্য চিহ্ন নহে তাহা প্রয়োজনীয়ও নহে ; বরং এমনও হইতে পারে যে, কোন আমল ধর্মের প্রতীক জাতীয় নহে, কিন্তু উহা প্রতীক শ্রেণীরও মূল।

অনুভবনীয় বস্তুর মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত যেমন ঘড়ির হেয়ার স্প্রীং। বাহ্য দৃষ্টিতে উহা ঘড়ির কোন বড় অংশ নহে ; বরং অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ যাহা দেখিয়া ঘড়ি সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করিবে যে, ইহা অতি সাধারণ জিনিস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য অংশগুলি এই হেয়ার স্প্রীং ঠিক থাকিলেই কাজে লাগিতে পারে, অন্যথায় সবগুলি অংশই অকেজো। অর্থাৎ ঘড়ির যাহা উদ্দেশ্য, স্প্রীং ভিন্ন তাহা সফল হইতে পারে না। যদিও স্প্রীং এর অভাবে ঘড়ির সৌন্দর্য একটুও কমিবে না এবং জেবে রাখিলে দর্শকেরাও মনে করিবে যে, আপনার নিকট ঘড়ি আছে।

এইরূপে যেক্‌রুল্লাহ্‌কে মনে করুন, যদিও উহা নামায-রোযার পর্যায়ে ধর্মের প্রতীক নহে, কিন্তু সর্বপ্রকার ধর্ম-প্রতীকের মূল শিকড় এবং ভিত্তি। আর ধর্ম-প্রতীকের হাকীকত্ এই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে কতক শৃঙ্খলা বিধানও শরীয়তের উদ্দেশ্য। এই কারণে শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে শরীয়ত কোন কোন আমলকে ইস্‌লামের চিহ্ন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে যদ্দ্বারা মানুষ একে অন্যের মুসলমান হওয়া সম্বন্ধে জানিতে পারে এবং ইস্‌লামের বিধান তাহার উপর জারী করা সম্ভব হয়। এই চিহ্নগুলিই ইস্‌লামের প্রতীক বা "শেআর" নামে অভিহিত। এগুলি ধর্মের স্পষ্ট অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেই জানে যে, ইহা ধর্মেরই অংশ। আর এইরূপ স্পষ্ট বিষয়গুলির মর্যাদা এত বড় যে, কেহ ইহা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিলে তাহা কোন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াই হউক কিংবা সরাসরিই হউক সোজা কাফের হইয়া যাইবে। এরূপ ব্যক্তির পক্ষ হইতে "আমি জানিতাম না" এমন আপত্তিও গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু যে সমস্ত কাজ প্রতীক শ্রেণীর নহে, যেমন রেহ্‌নের বা বন্ধকের মাসআলা ইত্যাদি। সেগুলি অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিলে সকল অবস্থায় কাফের হইবে না ; বরং উহার তফসীল নিম্নরূপ হইবে—রেহ্‌ন্ সম্বন্ধীয় কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার পর যদি রাহ্‌নের মাস্‌আলা প্রত্যাখ্যান করে, তবে কাফের হইবে। কেননা, তাহাতে প্রকারান্তরে কোরআনকেই অবিশ্বাস করা হইল। রাহ্‌নের মাস্‌আলা অবিশ্বাস করিলে সকল অবস্থায় কাফের না হওয়ার কারণ এই যে, রাহ্‌নের মাসআলা ধর্মের অংশ হওয়া স্পষ্ট নহে। পক্ষান্তরে

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাৎ প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গগুলির অন্তর্গত। কাজেই এগুলি অবিশ্বাস করিলে সকল অবস্থায়েই কাফের হইবে। এখানে এরূপ আপত্তিও শুনা যাইবে না যে, "এসমস্ত আমল ধর্মের অঙ্গ বলিয়া আমি জানিতাম না"। অবশ্য যদি সত্যিই সে না জানিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহার আপত্তি গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু শরীয়তের বিচারে তাহার কোন ওযরই শুনা যাইবে না। ইস্‌লামের হাকিম তাহার উপর কুফরীর হুকুম দিয়া তাহার স্ত্রী-বিচ্ছেদ প্রভৃতির হুকুম জারী করিয়া দিবে। (কিন্তু যদি সে কাফেরের দেশে থাকিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকে, অতঃপর হিজ্‌রত করিয়া দারুল ইস্‌লামে আসে, তবে হিজ্‌রতের পূর্ববর্তী কালে দারুল হরবে থাকিয়া উক্ত কার্যগুলি ধর্মের অঙ্গ হওয়ার কথা অবিশ্বাস করিয়া থাকিলে সে কাফের হইবে না। কেননা, এমতাবস্থায় ইস্‌লামের বিধান সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞ থাকার যুক্তি সঙ্গত স্পষ্ট কারণ রহিয়াছে।)

মোটকথা, শৃঙ্খলাবিধান ও ধর্মীয় হুকুম জারী করার উদ্দেশ্যে কোন কোন আমলকে ধর্মের প্রতীক পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে, প্রতীক শ্রেণীর অন্তর্গত না হইলে কোন আমল জরূরী ও অপরিহার্য হইবে না। দেখুন আন্তরিক বিশ্বাস। ইহা যদিও প্রচলিত অর্থে প্রতীক শ্রেণীর কার্যগুলির অন্তর্গত নহে (অবশ্য মুখে স্বীকার করা ধর্মের প্রতীক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য) কিন্তু তাই বলিয়া কি আন্তরিক বিশ্বাস ধর্মের জন্য জরূরী নহে?

এই চমৎকার দৃষ্টান্তটি এখনই আমার মনে আসিয়াছে। ইহাতে আমার দাবী সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহা জরূরী নহে যে, যাহা প্রতীক শ্রেণীর অন্তর্গত নহে তাহা প্রয়োজনীয়ও নহে। কেননা, ঈমান ও ইস্‌লামের জন্য আন্তরিক বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাকে প্রতীক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই কারণে করা হয় নাই যে, প্রতীকগুলির দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ঈমান প্রকাশ পাওয়া এবং তদনুযায়ী ইস্‌লামের হুকুম জারী করা। ইহা আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা হাছিল হইতে পারে না। কেননা, আন্তরিক বিশ্বাস সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারে না। কিন্তু ইহা এত প্রয়োজনীয় যে, ইসলামের যাবতীয় কার্যসমূহের ইহাই মূল শিকড়; বরং ঈমান ও ইস্‌লামের প্রকৃত নির্ভর ইহার উপরই। আন্তরিক বিশ্বাস ভিন্ন কেহই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুসলমান নহে, যদিও বাহিরে তাহাকে মুসলমানই বলা হইয়া থাকে।

অতএব, ইহা আমাদের বড় ত্রুটি—আমরা প্রয়োজনীয়তাকে কেবল প্রতীক শ্রেণীর সহিত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যেগুলি প্রতীক বা শেআরে-দ্বীন নহে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় মনে করি না। আন্তরিক বিশ্বাসের দৃষ্টান্তটি এই ভুলকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে এবং বলিয়া দিয়াছে যে, যেগুলিকে ধর্মের

প্রতীক বা শেআরের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে সেগুলিকে শে'আরে-দ্বীন এই জন্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে যে, লোকে উহাদের সাহায্যে একে অন্যের মুসলমান হওয়া সহজে বুঝিতে পারে, ইহাতে এই কথা বুঝিয়া লওয়া মারাত্মক ভুল যে, যাহা শেআরে-দ্বীন নহে, তাহা প্রয়োজনীয়ও নহে।

॥ যেক্‌রুল্লাহ্‌র অর্থ ॥

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ "এবং আল্লাহ্‌র যেক্‌র অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড়।" ইহার অর্থ—আল্লাহ্‌র যেক্‌র সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী বলিয়াও বড় এবং সমস্ত ফযীলতযুক্ত কার্যের মূলাধার বলিয়াও বড়। এতদ্ভিন্ন এই "আল্লাহ্‌র যেকরই" যাবতীয় নির্দেশাবলী পালন এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্যসমূহ হইতে দূরে থাকারও মূল। আর اَكْبَرُ। 'খুব বড়' কথাটির দুই অর্থ হইতে পারে। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলার যেকর নিজেই খুব বড়, কিংবা অন্য কোন বস্তুর তুলনায় বড়। এমতাবস্থায় অর্থ হইবে আল্লাহ্‌র যেকর অন্যান্য যাবতীয় আমল অপেক্ষা বড়।

এই তো বলিলাম আয়াতের ব্যাখ্যা। এখন যেকরুল্লাহ্‌র আবশ্যকতা শ্রবণ করুন যাহার প্রতি অনেক লোকেরই মনোযোগ নাই। প্রথমতঃ আজকাল ধর্মকর্মের প্রতি মানুষ কোন গুরুত্ব দিতে চায় না। আর যাহাদের মধ্যে কিছুটা গুরুত্ব আছে, তাহারা ফরয নামায এবং নফল ও মোস্তাহাবের প্রতি গুরুত্ব দেয়; কিন্তু যেকরুল্লাহ্‌র প্রতি আদৌ মনোযোগ নাই।

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন—"আপনি যখন মানিয়া নিলেন যে, মানুষ মুস্তাহাবের প্রতি গুরুত্ব দেয়, অথচ মুস্তাহাব কাজের মধ্যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতও দাখিল রহিয়াছে। আমরা দেখিতেছি অনেকে খুব মনোযোগের সহিত রীতিমত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়াও থাকে। তবে আপনার এই উক্তি কেমন করিয়া যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌র যেকরের প্রতি মানুষ গুরুত্ব দেয় না। কেননা, তেলাওয়াতে কোরআনও তো আল্লাহ্‌র যেক্‌রের অন্যতম একটি।

ইহার উত্তরে আমি বলিব—আমার উদ্দেশ্যে যেক্‌রে হাকীকী এবং উহাকেই সমস্ত আমলের চেয়ে সর্বাপেক্ষা বড় বলা হইয়াছে। এই যেক্‌রে হাকীকীর প্রতি গুরুত্ব অতি কম, তবে তেলাওয়াতে কোরআনও যেকরের একটি ছুরত বা প্রকার। ইহার প্রতি গুরুত্ব দিলে ইহা অনিবার্য নহে যে, যেক্‌রে হাকীকীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কেননা, কোন কোন আমলের শুধু বাহ্যিক আকার পাওয়া সম্ভব যাহাতে উক্ত আমলের কোন ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না। অন্যথায় যদি উহার হাকীকত

পাওয়া যাইত, তবে অবশ্যই উহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ক্রিয়া দেখা যাইত, যেমন মাদারীয়া ফকীরদের আপনি দেখিয়া থাকিবেন, তাহারা ওযিফার খুবই পাবন্দ। বুযুর্গদের শেজ্‌রা-নামাও দৈনিক পাঠ করে; কিন্তু রোযা-নামাযের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। অতএব, বুঝা যায়—যেকরের হাকীকত সে হাছিল করিতে পারে নাই। আমার অভিযোগের সারমর্ম ইহাই।

পীরের 'শেজ্‌রা-নামা' পড়া প্রসঙ্গে আমার একটি কেচ্ছা মনে পড়িল। আলী 'হাযীন' নামে ইরানের এক শাহ্‌যাদা বড় কবি ছিলেন, 'হাযীন' তাহার 'তাখাল্লুছ'। যদিও শায়েরগণ কখনও 'হাযীন' অর্থাৎ, চিন্তান্বিত হয় না; বরং সর্বদা مسرور অর্থাৎ, আনন্দিত থাকে এবং আনন্দের উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টায়ই সদাসর্বদা ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং এই শাহ্‌যাদা-কবি নামে মাত্র "হাযীন" ছিলেন; প্রকৃত পক্ষে হাযীন ছিলেন না; বরং বড়ই কৌতুক প্রিয় ছিলেন। যখন তিনি দিল্লী আসিলেন, এক রঈস লোকের বাড়ী ভাড়া করিলেন। শাহ্‌যাদা যেহেতু আরামপ্রিয় ছিলেন সুতরাং বাড়ীর মালিক, উক্ত আমীর লোকটি তাঁহার আরামের সর্ববিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। সেই বাড়ীর এক কোণে জনৈক মাদারীয়া ফকীর বাস করিত। সে রাত্রির শেষভাগে উচ্চ রবে বুযুর্গানে-দ্বীনের শেজ্‌রা-নামা পড়িত। ইহার ফলে আলী হাযীনের ঘুম ছুটিয়া যাইত। অতঃপর সেই ফকীর তো শেজ্‌রা-নামা শেষ করিয়া সম্ভবতঃ শুইয়া পড়িল। কারণ ফজরের নামাযে তো তাহার কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু আলী 'হাযীন' ভোর পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করিতে থাকিল। প্রাতঃকালে রঈস লোকটি তাহার মেযাজের খবর জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া বলিল, জানাবের কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই তো? আলী হাযীন বলিল—সর্বপ্রকারেই শান্তিতে ছিলাম; কিন্তু একটি কষ্ট হইয়াছে। উহা দূর করিয়া দিন। তাহা এই যে, এই তায্‌কেরাতুল আউলিয়াকে এখান হইতে সরাইয়া দিন। তায্‌কেরাতুল আউলিয়া খুব মজার উপাধি দিলেন। কেননা, শেজ্‌রা-নামায় বুযুর্গানের তায্‌কেরাই হইয়া থাকে। অতএব, দেখুন তাহারা ওযিফার প্রতি তো খুবই গুরুত্ব প্রদান করে, কিন্তু অন্যান্য আমলের প্রতি গুরুত্ব থাকে না।

থানা ভোয়ান শহরে এক বুযুর্গ এখনও জীবিত আছেন। তিনি নিজে আমার নিকট বলিয়াছেনঃ "আমার নামায হয়ত কোন কোন সময়ে কাযা হইয়া যায়। কিন্তু পীরের শিখান ওযিফা কখনও কাযা হয় না।" আচ্ছা বলুন তো এই যেকেরকে আপনারা যেক্‌রে হাকীকী বলিতে পারেন? কখনও পারিবেন না। ইহা কেমন যেক্‌রে হাকীকী, যাহা অন্যান্য আমল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল? অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা যেক্‌রে হাকীকী নহে; বরং শুধু যেক্‌রের বাহ্যিক আকার।

॥ উসিলা গ্রহণের স্বরূপ ॥

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, আপনি পীরের শেজ্‌রা-নামাকে ওযীফার মধ্যে কেমন করিয়া শামিল করিলেন? ইহার উত্তর এই যে, শেজ্‌রা নামার মূল উদ্দেশ্য উসিলা ধরিয়া আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা, আর দোআ যেকেরেরই একটি শাখা। ইহা তো সেই শেজ্‌রা-নামা যাহাতে বুযুর্গানে-দ্বীনের উসিলা লইয়া আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করা হয়। যেমন, আমাদের হাযী ছাহেব কেব্‌লার 'শেজ্‌রা-নামা'। ইহা ছাড়া আরও এক প্রকারের শেজ্‌রা আছে যাহাতে পীরের নামের ওযীফা পাঠ করা হয়। যেমন: يَا شَيْخ عَبْدُ الْقَادِر شَيْئًا لِلّٰه ইহা না জায়েয।

আল্লামা ইব্‌নে তাইমিয়্যাহ্‌ প্রথম প্রকারের শেজ্‌রাকেও না জায়েয বলেন। কেননা, তিনি মৃত ব্যক্তির উসিলা গ্রহণ করাকে সকল অবস্থায়ই নিষিদ্ধ বলেন। মাস্‌আলাটি যদিও এজ্‌তেহাদী, কিন্তু একথা আমি অবশ্যই বলিব যে, তাঁহার মত গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, উসিলা গ্রহণের সারমর্ম এই যে, "ইয়া আল্লাহ্‌! অমুক বুযুর্গের তোফায়েলে আমার অবস্থার প্রতি রহম করুন।" এখানে শুধু একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমের মধ্যে উক্ত বুযুর্গের বুযুর্গীর কি অধিকার আছে এবং উহার সহিত কি সম্পর্ক আছে? এই প্রশ্নটিকে আমি বহু আলেমের নিকট উত্থাপন করিয়া মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু কাহারও দ্বারা ইহার মীমাংসার আশা ছিল না। এই প্রশ্নটির মীমাংসা এক জায়গায়ই সম্ভব ছিল। কিন্তু সেখানে আদব রক্ষার্থে অধিক কিছু নিবেদন করার সাহস হয় নাই। অর্থাৎ, হযরত মাওলানা গঙ্গুহী (রঃ) দ্বারা ইহার মীমাংসা হইতে পারিত। কিন্তু আমি হুযূরের নিকট যখন আবেদন করিলাম, হযরত! পীরের বা বুযুর্গানে-দ্বীনের উসিলা গ্রহণের হাকীকত কি! তিনি বলিলেন, প্রশ্নকারী কে? হযরত তখন আমার আওয়ায শুনিতে পান নাই এবং দৃষ্টি শক্তিও তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। অতএব, আমি নিবেদন করিলাম। "প্রশ্নকারী আশ্‌রাফ আলী"। হযরত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি উসিলা গ্রহণের হাকীকত জিজ্ঞাসা করিতেছ?" আমি নীরব হইয়া গেলাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার সাহস পাইলাম না। কেননা, পুনরায় প্রশ্ন করিতে লজ্জা বোধ হইল। হুযুর মনে করিবেন, এমন সহজ কথা জানে না? অথবা ইহাও বলিতে পারেন যে, আদবের জন্য নীরব হইয়া গেলাম এবং মনে করিলাম—হযরত এখন এই মাসআলাটি বর্ণনা করিতে চান না। কিন্তু হযরতের শান এই যে:

اے لقائے تو جواب ہر سوال + مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

"আপনার সাক্ষাৎ লাভেই সকল প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। বিনা তর্ক-বিতর্কে আপনার নিকট সকল জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।" হযরত যদিও স্পষ্ট ভাবে 'তাওয়াস্‌সুলের হাকীকত বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু হযরতের

বরকতে সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে নিজেই উহার হাক্বীক্বত বুঝিতে পারিলাম।

গভীর মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। এই হাক্বীক্বতটি বুঝিতে আপনারা কোন কিতাবে পাইবেন না এবং ইহা স্মরণ রাখিলে বড় একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। তাহা এই যে, বুযুর্গানে দ্বীনের উসিলা গ্রহণে বলা হয়—ইয়া আল্লাহ্! অমুক বুযুর্গের উসিলায় আমার অবস্থার প্রতি রহম করুন। ইহার হাক্বীকত এই যে, ইয়া আল্লাহ্! আমার বিবেচনায় অমুক বুযুর্গ লোক আপনার একজন প্রিয় বান্দা। আর আপনার প্রিয় বান্দাগণের সহিত মহব্বৎ রাখা সম্বন্ধে আপনার যে রহমতের প্রতিশ্রুতি আছে اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ, "মানুষ তাহারই সঙ্গে গণ্য হইবে যাহাকে সে মহব্বত করে।" আমি সেই রহমতের প্রার্থনা করিতেছি। অতএব, উসিলা গ্রহণের মাধ্যমে এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওলীদের সহিত নিজের মহব্বত প্রকাশ করিয়া উক্ত মহব্বতের জন্য রহমত এবং সওয়াব প্রার্থনা করিতেছে এবং আল্লাহ্‌র ওলীদিগকে মহব্বত করা যে রহমত এবং সওয়াব প্রাপ্তির কারণ তাহা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যাহারা একে অন্যকে মহব্বত করেন তাঁহাদের ফযীলত সম্বন্ধে বহু হাদীস রহিয়াছে।

এখন আর এই প্রশ্ন হইতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে "বুযুর্গ লোকের বুযুর্গী এবং বরকতের কি অধিকার আছে?" অধিকার এই আছে যে, উক্ত বুযুর্গ লোকের সহিত মহব্বত রাখা আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতেরই একটি শাখা এবং আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত রাখার জন্য সওয়াবের পরিষ্কার ওয়াদা রহিয়াছে। এই তাক্‌রীরের পর আমি وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "তোমার প্রভুর নেয়ামত প্রচার কর।" নির্দেশের উপর আমল করিয়া নেয়ামত প্রচার স্বরূপ বলিতেছি যে, ইব্‌নে তাইমিয়্যাহ্ যদি এই তাক্‌রীর শ্রবণ করিতেন, তবে বুযুর্গানে দ্বীনের উসিলা গ্রহণ জায়েয হওয়া কখনও অস্বীকার করিতে পারিতেন না। কেননা, ইহার বর্ণিত সমস্ত দলীলই বিশুদ্ধ এবং নিখুঁত।

॥ আল্লাহ্‌র সঙ্গে বেআদবী ॥

আমার ভাল ধারণা এই যে, ইবনে তাইমিয়্যাহ্ (রঃ) তাঁহার যুগের জাহেলদের তাওয়াস্‌সুল নিষেধ করিয়াছেন। জাহেলগণ উসিলা গ্রহণ না করিয়া বুযুর্গানে-দ্বীনের রূহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করিয়া থাকে। (অথবা তাহারা আল্লাহ্‌র ওলীদিগকে 'কুদরতের কারখানায়' এবং খোদার কাজে হস্তক্ষেপের অধিকারী বলিয়া মনে করিত। অর্থাৎ, তাহাদের ধারণা আল্লাহ্ তা'আলা বহু কাজ তাঁহাদের হাতে সোপর্দ করিয়াছেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই সমস্ত কাজ সমাধা হইতে পারে।

আজকালও এরূপ ধারণার লোক অনেক আছে। এক দরবেশের মুরিদগণকে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের পীরের নামের ওযীফা জপ করে। আমি অবশ্য সেই দরবেশকে দেখি নাই। কাজেই আমি তাহাকে কিছু বলিতেছি না। কিন্তু তাহার মুরিদগণকে দেখিয়াছি। তাহারা বলিয়া থাকে—'ওয়ারেস্' খোদার নামও তো বটে, তবে يَا وَارِثُ ওযীফা করাতে দোষ কি ? আমি বলি—খোদার নাম কি শুধু 'ওয়ারেস্‌ই' আছে ? তাঁহার সমস্ত নাম ছাড়িয়া এই নামের ওযীফা করার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, نعوذ بالله খোদা এস্থলে এই জন্য পছন্দ হইয়াছে—যেহেতু পীরের নাম ও খোদার নাম একই। أَسْتَغْفِرُ اللهَ — أَسْتَغْفِرُ اللهَ আর এই নিয়ত যদি নাও থাকে তথাপি উহাতে সন্দেহের অবকাশ তো রহিয়াছে। শরীয়ত এরূপ সন্দিহান কাজ হইতেও নিষেধ করিয়াছে।

আমাদের দলেও কিছুকাল পূর্বে এই রোগ ঢুকিয়াছিল। কেহ কেহ চিঠি পত্রের বা কোন প্রকার লেখার মধ্যে يَا مْدَادِ اللهِ। কিংবা هُوَ الرَّشِيْدُ লেখা আরম্ভ করিয়াছিল, (যাহাতে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব ও হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ গাঙ্গুহী ছাহেবদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আমি তাহা নিষেধ করিয়া দিয়াছি। কি বলিব! ইহাতে আমার কি পরিমাণ কষ্ট হইত আমার নিকট তো উহা হইতে শিরকের গন্ধ আসিত। কেন ? ইহার পরিবর্তে بِعَوْنِ اللهِ লিখিতে পারিত না ? বন্ধুগণ! আদব এবং মহব্বত এমন বস্তু যে, মাতবায়ে নেযামীর প্রোপ্রাইটার আবদুর রহমান খাঁন সাহেবের নাপিতের নামও ছিল আবদুর রহমান। খাঁন সাহেবের বংশধরগণ নাপিতের নাম পরিবর্তন করিয়া আবদুল্লাহ্ রাখিয়া দিল, যেন ডাকার সময় খান সাহেবের মনে কষ্ট না হয় এবং নামে শরীক থাকা ও সমকক্ষতার সন্দেহ না হয়।

তবে কি সূফী এবং আলেমদিগকে নামে অংশীদার হওয়া এবং সমকক্ষতার কল্পনা হইতে দূরে থাকা উচিত নহে ? কিন্তু আফ্‌সুস, আজকাল লোকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আদব রক্ষা করে না। হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবশ্য কিছুটা আদব রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মোটেই আদব রক্ষা করে না। আবার এবিষয়ে একটি বয়েতাংশও প্রসিদ্ধ আছে—با خدا دیوانه باش و با محمد هوشیار—"খোদার সঙ্গে পাগল হও, আর মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহিত হুশিয়ার থাক।" প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন হয় যে, এই বাক্যটি কোরআন না হাদীস ? ইহার অনুসরণ করা কেন জায়েয হইবে ? দ্বিতীয়ত, ইহা কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের উক্তি হইলে ইহার অর্থ

শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে যেমন ডাকিয়া থাকি যে, "ইয়া আল্লাহ্! আমাকে রেযেক দান কর।" এইরূপে হুযূরের নাম লইও না; বরং হুযূরের নামের সহিত সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করিও। আল্লাহ্ তা'আলাকে এরূপ সাদাসিধা ভাবে ডাকা জায়েয হওয়ার কারণ—ইহা 'তাওহীদ' বুঝায়, দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহ্ তা'আলার যেকের অধিক পরিমাণে করিতে হয় এবং অধিক যেকেরে সম্মানসূচক গুণাবলী উল্লেখ করা কঠিন হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার সহিত এইরূপে লোকে বেআদবী করিয়া থাকে যে, কোন যুবকের মৃত্যু হইলে তখন সমাজের লোক একত্রিত হইয়া বলাবলি করে—"আহা! কেমন অসময়ে মৃত্যু হইল; বেচারার ছোট ছোট শিশু নিরাশ্রয় রহিয়া গেল। যেন সকলে মিলিয়া মীমাংসা করিয়া লইয়াছে যে, এই মৃত্যু অসময়ে এবং অসংগত হইয়াছে। অতঃপর এ সমস্ত বুদ্ধির ঢিপাই বলে, ভাই! অদৃষ্ট সম্বন্ধে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার জো নাই। আল্লাহ্ বড়ই বেপরোয়া। যেন এই অসময়ে মৃত্যু ঘটাইবার দরুন আল্লাহ্ তা'আলাকে তাহারা বেপরোয়া স্থির করিয়া বসিয়াছে। (نعوذ باﷲ) তাহাদের মতে খোদা বেপরোয়া হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র নিকট কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা নাই। কাহারও অবস্থার প্রতি দয়া নাই। অতএব, আল্লাহ্‌র রাজ্য যেন অযোধ্যার রাজ্য কিংবা নাইয়াও নগরের রাজ্য যেখানে ন্যায় বিচারের কল্পনাও নাই।

আন্নাইয়াও নগর সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে একটি গল্প মশ্‌হুর আছে। এক গুরু ও শিষ্য ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক বস্তিতে আসিয়া পৌঁছিল। উহার নাম ছিল 'আন্নাইয়াও নগর'। সেখানে তাহারা দেখিতে পাইল—বাজারে সকল জিনিষের এক দাম। দুধও এক টাকায় ষোল সের, ঘিও এক টাকায় ষোল সের, কাগজও এক টাকায় ষোল সের। গুরুজী শিষ্যকে বলিলেন, এই বস্তি থাকার উপযোগী নহে। ইহা আন্নাইয়াও নগর। এখানে এনসাফের নামগন্ধও নাই। প্রত্যেক বস্তুর এক দর। ইহার অর্থ এই যে, এখানে ছোট বড়র মধ্যে প্রভেদ নাই। এখানে বাস করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে। শিষ্য বলিল, না, এখানে দুধ ঘি খুব সস্তা, এখানেই থাকুন। দুধ ঘি যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। গুরু বলিল, আচ্ছা থাক, কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে।

শিষ্য দুধ ঘি খাইয়া খুব মোটা তাজা হইয়া গেল। কিছুকাল পরে একদিন রাজ দরবারে যাইয়া দেখিল একটি মোকদ্দমা উপস্থিত। মোকদ্দমাটি এই যে, দুই জন চোর চুরি করিতে যাইয়া এক বাড়ীতে সিঁদ কাটিল, তৎপর একজন চোর ঘরে ঢুকিল অপর চোরটি সিঁদের মুখে দণ্ডায়মান ছিল। হঠাৎ উপর হইতে ইট পড়িয়া তাহার মৃত্যু ঘটিল। অতএব, জীবিত চোরটি মোকদ্দমা দায়ের করিল যে, ইট পড়িয়া আমার সঙ্গীর মৃত্যু হইয়াছে। ঘরের মালিকের শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রাজা বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন বাড়ী কেন নির্মাণ করিলে ? সে বলিল, ইহা রাজ-মিস্ত্রীর দোষ। রাজ-মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, জোগালদার শ্রমিক গারা আনিত। সে পাত্‌লা গারা আনিয়াছে বলিয়াই গাঁথুনি মজবুত হয় নাই। শ্রমিককে ডাকা হইল, সে বলিল, ইহাতে 'সাক্কার' দোষ। সে পানি অধিক ঢালিয়া দেওয়ার ফলে গারা পাত্‌লা হইয়া গিয়াছে। 'সাক্কাকে' জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তখন একটি মত্ত হস্তী দৌড়াইয়া আমার দিকে আসিতেছিল। আমি ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়ায় পানি অধিক পড়িয়া গিয়াছে। হস্তীর মাহুতকে ডাকা হইল, সে বলিল, আমার দোষ নাই। একজন স্ত্রীলোক হঠাৎ হাতীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তাহার অলঙ্কারের ঝন্ ঝন্ শব্দে হাতী ক্ষেপিয়া গেল। স্ত্রীলোকটিকে ডাকা হইলে সে বলিল, আমার দোষ নাই, স্বর্ণকারের দোষ। স্বর্ণকারকে ডাকা হইলে তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিল না বলিয়া সে নীরব রহিল। সেই বেচারার ফাঁসীর হুকুম হইল। ফাঁসীর ফাঁদ তাহার গলার চেয়ে বড় ছিল। জল্লাদ রিপোর্ট করিল, ফাঁসীর ফাঁদ তাহার গলা হইতে বড়, কাজেই ফাঁদ তাহার গলায় লাগে না। তৎক্ষণাৎ হুকুম হইল স্বর্ণকারকে ছাড়িয়া দাও, কোন মোটা মানুষ আনিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দাও। তথায় উপস্থিত সকলের মধ্যে সেই শিষ্যই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক মোটা। তাহাকেই ফাঁসী কাষ্ঠের নিকট নেওয়া হইল।

শিষ্য খুব ঘাব্‌ড়াইয়া গুরুকে বলিল, আমাকে রক্ষা করুন। গুরুজী বলিলেন, আমি তোমাকে বলি নাই যে, এই জায়গা থাকার উপযুক্ত নহে ? দুধ ঘি খাওয়ার মজা দেখ। সে বলিল, আমি তওবা করিলাম। এবারের জন্য তো আমাকে রক্ষা করুন, আর কখনও আপনার কথার বিরোধিতা করিব না। গুরুজী ফাঁসীদাতাকে বলিলেন, ইহাকে মুক্তি দিয়া আমাকে ফাঁসী দিন। শিষ্য যখন দেখিল যে, "তাহারই জন্য গুরুজী স্বয়ং ফাঁসী কাষ্ঠে আরোহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন তাহার মন ইহা পছন্দ করিল না যে, সে জীবিত থাকিবে আর তাহারই জন্য গুরুজীর ফাঁসী হইবে। অতএব, সে বলিল, কখনই হইতে পারে না ; বরং আমাকেই ফাঁসী দাও। এখন ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল। শিষ্য বলে, আমাকে ফাঁসী দাও, গুরুজী বলেন, না, আমাকে দাও। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া গুরুকে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ঝগড়া করিতেছ কেন ? সে বলিল, হুযুর! আমি জানিতে পারিয়াছি ইহা মহেন্দ্রক্ষণ। এই মুহূর্তে যে ব্যক্তি ফাঁসী প্রাপ্ত হইবে সে সোজাসুজি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবে। অতএব, আমি চাহিতেছি যে, আমারই ফাঁসী হউক, রাজা বলিলেন, আচ্ছা এই কথা ? ব্যাস্. তবে আমাকেই ফাঁসী দেওয়া হউক। অনন্তর রাজাকেই ফাঁসী দেওয়া হইল। "خس کم جہان پاک" "একটা অপদার্থ মরিল, খোদার দুনিয়া পাক হইল।" সমস্ত ঝগড়াই চুকিয়া গেল। গুরুজী শিষ্যকে বলিলেন,

ব্যস্, আর নয়, এখান হইতে সরিয়া পড়। এই স্থানটি বাস করার উপযোগী নহে। এই গল্পটি এমনি একটি দৃষ্টান্তের মত মনে হয়। কিন্তু এই গল্পে বিশৃঙ্খলা ও বে-ইন্‌ছাফীর সুন্দর ছবি আঁকা হইয়াছে। আজকাল মানুষ (نعوذ بالله) আল্লাহ্ তা'আলাকে সেই আন্নাইয়াও নগরের রাজা মনে করিয়া লইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাও যেন অসঙ্গত অযৌক্তিক অসাময়িক কাজ করিয়া থাকেন। একথাটি আজকাল এরূপ ভাষায় বলা হয় যে, খোদা বড়ই বে-পরোয়া। যেরূপ ক্ষেত্রে এই বাক্যটি ব্যবহার করা হয়, কুফরী অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতে দেওবন্দী আলেমগণেরই ধৈর্য যে, তাহারা এ সমস্ত লোকের উপর কুফরী ফতুয়া দেন না। কেননা, এসমস্ত লোক জানে না যে, এরূপ বাক্য উচ্চারণে কাফের হইতে হয়, কিংবা তাহারা কুফরীর নিয়তে এরূপ কথা বলেও না।

বন্ধুগণ! ইহাও ঠিক যে, খোদা তা'আলা বে-পরোয়া। কিন্তু পরোয়া শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক! 'পরোয়া' শব্দের অর্থ অভাবও হয়, ইহার অর্থ মনোযোগ এবং লক্ষ্যও হয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলাকে এই অর্থে বে-পরোয়া বলা যাইতে পারে যে, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কখনও এই অর্থে বেপরোয়া হইতে পারেন না যে, তিনি কাহারও মুছলেহাত অনুযায়ী কাজ করেন না; বরং আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার বান্দাদের সুখ-সুবিধা ও মঙ্গলের প্রতি পূর্ণরূপে লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু তিনি নিজের কাজের যুক্তি ও মঙ্গলময় পরিণাম সম্বন্ধে তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহার কাজের যুক্তির অপেক্ষায় থাকা আমাদেরও উচিত নহে, আমাদের ধর্ম এই হওয়া উচিত—

زباں تازہ کردن باقرار تو + نینگیختن علت از کار تو

"তোমার কার্যাবলী ন্যায়সঙ্গত হওয়ার স্বীকৃতি দ্বারা যবান সতেজ রাখা উচিত, তোমার কাজের কারণ ও যুক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।"

আর ইহাও আমাদের ধর্ম— هرچه آں خسرو کند شیریں بود "সেই মহা মহিমান্বিত বাদশাহ্ যাহাকিছু করেন তাহাই আমাদের জন্য মিষ্ট।"

বন্ধুগণ! একজন ঘৃণ্য গণিকাকেও তাহার কোন প্রেমিক তাহার কাজ-কর্ম ও আদেশ-নির্দেশের কারণ এবং যুক্তি জিজ্ঞাসা করে না। শুধু এই কারণে যে, সে তাহাকে ভালবাসে। হাকিম ও মুনীবকেও কেহ তাহাদের আদেশের কারণ এবং যুক্তি জিজ্ঞাসা করে না। কেননা, অন্তরে তাহাদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। রীতি এই যে, মহব্বৎ এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ থাকিলে কেহ তাহার কাজের যুক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে বা উহার অবগতির অপেক্ষায় থাকিতে পারে না। অতএব, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও কার্যের কারণ এবং যুক্তি জানিবার পশ্চাতে লাগিয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বৎ এবং শ্রেষ্ঠত্ববোধ যতটুক থাকা

উচিত ততটুকু নাই। সুতরাং একথাই ঠিক যে, আল্লাহ্ তা'আলা বে-পরোয়া হওয়ার অর্থ তিনি কাহারও মোহ্‌তাজ নহেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ - اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ -

"আর যে কেহ পরিশ্রম করে সে নিজের জন্যই পরিশ্রম করে। নিঃসন্দেহ, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসী হইতে অভাবশূন্য।" এখানে মানুষের এবাদত হইতে তাঁহার অভাবশূন্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রিয়াযত ও এবাদতের জন্য মোহ্‌তাজ নহেন। আর একস্থানে বলেন :

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সহিত কুফ্‌রী কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কোন পরোয়া রাখেন না এবং তিনি নিজের বান্দাদের জন্য কুফ্‌রী পছন্দও করেন না।" এখানে নাফরমানী ও কুফ্‌রী হইতে নিজের বেপরোয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, তোমাদের নাফরমানী ও কুফ্‌রীর ফলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না; বরং তাঁহার শান এইরূপ :

من نکردم خلق تا سودے کنم + بلکه تا بر بندگاں جودے کنم

"আমি কোন লাভের আশায় বান্দা সৃষ্টি করি নাই; বরং এই বান্দাদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করার উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি।"

ক্বোরআনে যাহা বর্ণিত আছে আল্লাহ্ তা'আলার বে-পরোয়া হওয়ার অর্থ তাহাই। আর যে অর্থে লোকে তাঁহাকে বেপরোয়া বলিয়া থাকে তাহা কুফ্‌রী। কেননা, رؤف رحیم গুণে সমগ্র ক্বোরআন পরিপূর্ণ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি খুব দয়ালু ও মেহেরবান।" মোটকথা, আজকাল মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার শানে বড়ই বেআদবী করিয়া থাকে। কেহ يَا وَارِثُ নামের ওযীফা পড়ে কেহ يَا اِمْدَادُ اللّٰهِ লেখে।

॥ আদবের তা'লীম ॥

নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের তো সামান্য সামান্য ব্যাপারেই কানমলা দেওয়া হয়। আমাদের মূর্খতাই এখন আমাদের কাজে লাগিয়াছে। এসমস্ত বিষয়ে আমাদিগকে পাকড়াও করা হইতেছে না কিংবা কম হইতেছে। এক বুযুর্গের ঘটনা আমি কোন একটি কিতাবে দেখিয়াছি। কোন একটি বস্তু সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল "বড়ই لطیف" (মুলায়েম, পবিত্র, উত্তম বা অন্য কোন

অর্থে) তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধমক দেওয়া হইল, ওহে বেআদব ! لطيف আমার নাম, অপরের সম্বন্ধে এই নাম কেন ব্যবহার করিলে ? আমার খুব স্মরণ আছে। এই ঘটনাটি কিতাবে দেখার পর হইতে বহু বৎসর ধরিয়া আমি কোন বস্তুকে لطيف বলি না।

হুযূর (দঃ) আমাদিগকে দৈনন্দিনের কথার মধ্যেও আদব তা'লীম দিয়াছেন। যেমন, তিনি বলিয়াছেন : خَبُثَتْ نَفْسِىْ "আমার নাফ্‌স 'খবীস্' হইয়া গিয়াছে" কখনও বলিও না। কেননা, মুসলমানের নাফস্ কখনও খবীস হয় না। আর নিজের বান্দী গোলামকে عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ বলিও না ; বরং فَتَاىَ وَفَتَاتِىْ বলিও। মোটকথা, আদব বড় জিনিষ। মাওলানা রূমী বলেন :

بے ادب را اندریں رہ بار نیست + جائے او بردار شد دردار نیست

"এই দরবারে বেআদবের কোন সম্মান নাই। তাহার স্থান গৃহের বাহিরে, গৃহের ভিতরে নহে।"

আরও বলেন :

ہر کہ گستاخی کند اندر طریق + باشد او در لجۂ حیرت غریق

"যে ব্যক্তি তরীকতের পথে বেআদবী করে সে অস্থিরতার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।" বাতেনের পথে আদবের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব রহিয়াছে। কেননা, বাতেনপন্থীরা খাছ নৈকট্য লাভ করিতে চাহেন। এই পথে আদবের ফলে নানাবিধ নেয়ামত পাওয়া যায় এবং বেআদবী করিলে অনেক নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) বলিতেন, মাওলানা কাসেম কুদ্দেসা সিররূহুর অনুপম এল্‌মের এক কারণ ইহাও ছিল যে, মাওলানার মধ্যে আদব ছিল যথেষ্ট। যখন বাতেনী পথে শায়খ এবং ওস্তাদের সহিত এত আদব রক্ষা করা আবশ্যক, তবে খোদাতা'আলার সহিত আদব রক্ষা কেন জরূরী হইবে না ?

দ্বিতীয়তঃ, মনে রাখিবে যে, বুযুর্গ লোকের নামের ওযীফা পড়া খোদা তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করা তো বটেই, স্বয়ং সেই বুযুর্গ লোকও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে চীফ্‌ রীডার সাহেবকে কালেক্টর বলিয়া সম্বোধন করে, তবে স্বয়ং চীফ্‌ রীডার সাহেবও ইহাতে নারায হইবেন।

সম্ভবতঃ আল্লামা ইব্‌নে তাইমিয়্যার সময়ে উছিলা গ্রহণের এমনই কোন আকার ছিল। যেমন, মানুষ পীর ও বুযুর্গের নামের ওযীফা পড়িয়া থাকে। এই কারণেই ইচ্ছা করিয়া তিনি এই বিশেষ ধরণের উছিলা গ্রহণকে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্বাবস্থায় উছিলা গ্রহণকেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যেমন, আমরা আজকাল 'রাহান' রাখাকে সকল অবস্থায় নিষেধ করিয়া থাকি। কেননা,

সর্বসাধারণের অভ্যাস—স্বার্থ ভোগের শর্ত ভিন্ন কোন রাহান রাখা হয় না। অথচ এরূপ 'রাহান' রাখা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম।

ইহা তাঁহার কথার ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন এইজন্য হইয়াছে যে, তিনি একজন মহামানব। কোন কোন আলেম তাঁহাকে মুজতাহেদ পর্যন্ত বলিয়াছেন। নতুবা উছিলা গ্রহণের যে পদ্ধতি আমি বর্ণনা করিলাম তাহা হারাম নহে। যদি বলেন যে, আপনি উছিলা গ্রহণের যে হাক্বীকত বর্ণনা করিলেন তাহা তো কাহারও জানা নাই, তবে এই হাক্বীকতের নিয়তে কে উছিলা গ্রহণ করে ?

ইহার উত্তর এই যে, যে বস্তু মূলতঃ জায়েয, তাহা তখন পর্যন্তই জায়েয থাকিবে যখন পর্যন্ত না-জায়েয নিয়ত না করা হয়। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ জায়েয নিয়তে না করিলেও না-জায়েয নিয়তে কখনও উছিলা গ্রহণ করেন না।

॥ বাহ্যিক আকার ও আভ্যন্তরীণ তথ্যের পার্থক্য ॥

আমি বলিতেছিলাম—কবি আলী হাযীন সেই ফকীরকে যে পীরের শেজ্‌রা-নামা পড়িত 'তায্‌কেরাতুল আউলিয়া' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। আমি গল্পটি বর্ণনা করিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, দেখুন এই ফকীর পীরের শেজ্‌রা পড়িতেছিলেন। ইহার হাক্বীকত এই যে, সে পীরের উছিলা গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোআ করিতেছিল এবং দোআও যেকেরেরই একটি শাখা। অতএব, বাহ্য দৃষ্টিতে সে যাকেরই ছিল। কিন্তু হাক্বীকী যেকের সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। কেননা, তাহার রোযা নামায ছিল না। যদি সে সত্যিকারের যাকের হইত, তবে অন্যান্য আমল হইতে শূন্য হইত না। অতএব, তাহার যেকের ছিল বাদামের খোশা। বাদামের শাঁস নহে।

অতএব, যেকের দুই প্রকার। যেকেরের বাহ্যিক আকার এবং যেকেরের হাক্বীকত। শুধু যেকেরই কেন; বরং এইরূপে প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার। বস্তুর বাহিরের রূপ আর বস্তুর মূল হাক্বীকত।

মানুষও দুই প্রকার বাহ্যাকৃতির মানুষ আর সতিকারের মানুষ। মাওলানা তাহাই বলিতেছেন :

این که می بینی خلاف آدم اند + نیستند آدم غلاف آدم اند
گر بصورت آدمی انسان بدے + احمد و بوجهل هم یکسان بدے
اے بسا ابلیس آدم روئے هست + پس بهر دستے نباید داد دست

"বাহিরে এই যাহাকিছু দেখিতেছি ইহারা আদমের বিপরীত। ইহারা আদম নহে, আদমের খোলস। আকৃতিতেই যদি মানুষ মানুষ হইত, তবে আহ্‌মদ (দঃ) এবং আবু জাহাল এক সমান হইত। ওহে! আদমের ছুরতে অনেক ইব্লীস রহিয়াছে সুতরাং সকল হাতে হাত দেওয়া উচিত নহে।"

নামাযেরও দুই প্রকার আছে। বাহ্যিক আকারের নামায আর সত্যিকারের নামায। বিনা ওযূতে নামায পড়িলে তাহা নামাযের বাহিরের আকার হইবে। সত্যিকারের নামায হইবে না। কোন একজন গ্রাম্য বর্বর শুনিয়াছিল ওযূ ভিন্ন নামায হয় না। সে উত্তরে বলিল, بارها كردم وشد "বহুবার করিলাম এবং হইল।"

এইরূপে মাওলানা ইয়াকুব কুদ্দেসা সিররুহুকে কোন এক স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—ইহাদের বিবাহ সম্পর্ক দুরুস্ত হইতে পারে কি না? তিনি জবাব দিলেন, না, ইহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। প্রশ্নকারী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল। আমি তো করিয়াছিলাম, দেখিলাম, হইয়া গেল।

এই প্রকারের ঘটনা মাওলানা শাহ্ সালামতুল্লাহ্ কানপুরী ছাহেবের সময়েও ঘটিয়াছিল। তিনি দুইজন স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ পড়াইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কেননা, ইহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না। লোকেরা জেদ্ ধরিল, এখন তো বর-যাত্রীরা আসিয়া পড়িয়াছে, যে প্রকারেই হউক বিবাহ পড়াইয়া দিন। মাওলানা ধমক দিয়া বলিলেন, পাগল হইলে না কি? আমি হারামকে হালাল কিরূপে করিয়া দিব? চুলায় যাক তোমার পাঁচ সিকা। তাহারা অগত্যা জনৈক মোল্লাজীকে পাঁচ সিকা দিয়া ইজাব কবুল করাইয়া লইল। অতঃপর মাওলানার নিকট বলিতে আসিল। বাঃ, আমরা শুনিয়াছিলাম, তুমি খুব বড় আলেম, কিন্তু তোমার দ্বারা এই সামান্য কাজটুকু হইল না যাহা আমাদের মোল্লাজী করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় সত্যিকারের বিবাহ তো হয় নাই, তবে বিবাহের বাহ্যিকরূপ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, ইজাব কবুল হইয়া গিয়াছে, খোরমা তাক্‌সীম হইয়াছে। মোল্লা পাঁচ সিকা পাইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা মনে আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপে বিপদও দুই প্রকার। বিপদের বাহ্যিকরূপ আর সত্যিকারের বিপদ। ইহা হইতে একটি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাইবে। প্রশ্নটি এই– আল্লাহ্ বলিয়াছেন:

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

"অর্থাৎ, তোমাদের উপর যে বিপদই আসে, তাহা তোমাদের হাতের অর্জিত কাজের কারণেই আসিয়া থাকে।" বলা বাহুল্য, আম্বিয়ায়ে কেরামের উপরও বিপদ আসিয়াছিল। কোন কোন নবীকে হত্যা করা হইয়াছে। কোরআন শরীফে মৃত্যুকেও বিপদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ "অতঃপর মৃত্যুর বিপদ আসিয়া তোমাদিগকে ধরিল।" এতদ্ভিন্ন ওহুদের যুদ্ধে হুযুর (দঃ)-এর দাঁত মোবারক

ভাঙ্গিয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল। তবে কি نعوذ بالله হযরত আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বারাও কোন পাপ কার্য সংঘটিত হইয়াছিল? যদ্দরুন তাঁহাদের উপর বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছিল। হক পন্থীদের মত তো এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ ছিলেন। গুনাহ্ হইতে পবিত্র ছিলেন। হাশাবিয়া সম্প্রদায় আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা বুঝে নাই। তাহারা তাঁহাদিগকে নিষ্পাপ মনে করে নাই। আমি বলি, হাশাবীয়া সম্প্রদায়ের এই মত কোরআন হাদীসের খেলাফ তো বটেই, সাধারণ বিবেকেরও খেলাপ। কেননা, দুনিয়ার হাকিমগণও যাহার উপর কোন পদের ভার ন্যস্ত করেন, তাহাকে বাছাই করিয়া পদস্থ করিয়া থাকেন। তবে কি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নবুওওতের পদের জন্য বাছাই হয় না? কিম্বা তাঁহার বাছাই এরূপ ভুল হয় যে, এমন লোকদিগকে নবীর পদে নিযুক্ত করেন, যাহারা অপরকে আইন মানিয়া চলার নির্দেশ দেন; কিন্তু নিজেরা আইন বিরুদ্ধ কাজ করিয়া থাকেন। সাধারণ জ্ঞান কখনও এমন কথা স্বীকার করিতে পারে না। অতএব, প্রশ্নের উত্তর এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের উপর যে সমস্ত বিপদ অবতীর্ণ হইতে দেখা যাইত তাহা প্রকৃত বিপদ ছিল না; বরং বিপদের বাহ্যিক রূপ ছিল। ইহা শুধু ব্যাখ্যাই নহে; বরং ইহার একটি প্রমাণও আছে। আমি আপনাদিগকে একটি মাপকাঠি বলিয়া দিতেছি, যদ্দারা বিপদের হাকীকত এবং বাহ্যিক রূপের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। তাহা এই যে, যে বিপদে মন সংকীর্ণ হইয়া যায় ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় তাহা পাপের কারণে হইয়া থাকে। আর যে বিপদে আল্লাহ্‌র সহিত সম্বন্ধ উন্নত হয়, আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় তাহা প্রকৃত পক্ষে বিপদ নহে যদিও বাহিরে বিপদ বলিয়াই বোধ হয়। এখন প্রত্যেকে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখুন। বিপদের সময় আপনার অবস্থা কিরূপ হয়। এই মাপকাঠি লইয়াই হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের বিপদ আর দুনিয়াদারদের বিপদের পার্থক্য নির্ণয় করুন। তখনই বুঝিতে পারিবেন যে, আম্বিয়া ও আউলিয়াদের উপর সে সমস্ত বিপদের ফল এই ফলিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা আরও উন্নত হইত এবং তাঁহারা নিজদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে আরও অধিক সোপর্দ করিতেন ও আল্লাহ্‌র বিধানে আরও অধিক সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহারা চরম আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতেন:

اے حریفاں راہ ھارا بستہ یار + آھوئے لنگم واوشیر شکار

غیر تسلیم ورضاء کو چارۂ + در کف شیر نر خو نخوارۂ

হে প্রতিদ্বন্দ্বিগণ! বন্ধু পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আমি হরিণী, আর সে শিকারী বাঘ। আত্মসমর্পণ এবং অদৃষ্টের প্রতি রাযী থাকা ভিন্ন উপায় কোথায় রক্ত পিপাসু নর খাদকের হাতে?" আর ইহাও বলেন:

ناخوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

"তোমার অসঙ্গত ব্যবহারও আমার প্রাণে ভাল লাগে। মনে ব্যথা দানকারী বন্ধুর উপর আমার প্রাণ উৎসর্গীত।"

ইহা হাশাবিয়াদের বোকামি। তাহারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিজেদের উপর ধারণা করিয়া লইয়াছে এবং উক্তি করিয়াছে যে, তাঁহারাও আমাদেরই মত, তাঁহাদের উপর বিপদ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ইহা চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, তাঁহাদের ও আমাদের বিপদের মধ্যে আসমান-জমীনের পার্থক্য। এই ভুল ধারণাই তো মানব জাতিকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে এবং ইহাই তো একমাত্র কারণ যাহার ফলে অনেক কাফের ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামের বাহিরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের ন্যায় মনে করিয়াছে। মাওলানা বলেনঃ

جمله عالم زین سبب گمراه شد + کم کسے ز ابدال حق آگاه شد

گفته اینک ما بشر ایشان بشر + ما وایشان بستهٔ خوابیم وخور

این ندانستند ایشان از عمی + درمیان فرقے بود بے منتهی

کار پاکان را قیاس از خود مگیر + گرچه ماند در نوشتن شیر وشیر

"এই কারণে সারা জগৎ পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার আবদালগণ সম্বন্ধে অনেক কম লোকই অবগত হইতে পারিয়াছে। তাহারা বলে, আমরাও মানুষ তাহারাও মানুষ। আমরা এবং তাহারা সকলেই ঘুমাই এবং খাই। মূর্খতা বশতঃ এসমস্ত লোক বুঝিতে পারে নাই যে, উভয়ের মধ্যে অসীম পার্থক্য রহিয়াছে। পবিত্র বান্দাগণের কার্যকে নিজেদের উপর অনুমান করিও না। যদিও লেখার মধ্যে شیر (বাঘ) এবং شیر (দুধ) একই রকম, কিন্তু উভয় বস্তু এক নহে।" এক ব্যক্তি ইহার সঙ্গে নিম্নোক্ত বয়তটি যোগ করিয়াছে।

شیر آں باشد که آدم می خورد + شیر آں باشد که آدم می خورد

"شیر (বাঘ) তাহাই যাহা মানুষকে খায়। আর شیر (দুধ) তাহাই যাহা মানুষে খায়"

এইরূপে আলিঙ্গন দুই প্রকারের—চোরকে পাক্‌ড়াইয়া দুই বাহুতে জড়াইয়া জোরে চাপিয়া ধরা। এমতাবস্থায় ধারণকারী যতই সুন্দর এবং প্রিয় হউক না কেন চোর তাহার চাপিয়া ধরাতে সন্তুষ্ট হইবে না। কেননা, সে আশেক নহে, সে উক্ত চাপিয়া ধরাতে অস্থির হইয়া পড়িবে, পলাইতে চাহিবে। আর এক প্রকারের চাপিয়া ধরা এই যে, প্রিয়জন তাহার প্রেমিককে আলিঙ্গন করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া খুব জোরে চাপিয়া ধরিল, এখন তুমি তাহার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ সে কি বলে, সে কি এই চাপের কষ্টে প্রিয়জনের বাহুর বেষ্টনী হইতে বাহির হওয়া পছন্দ করিবে? কখনই না; বরং বলিবেঃ

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت + سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر ازمائی

"তোমার তরবারির আঘাতে ধ্বংস হওয়ার সৌভাগ্য যেন দুশ্‌মন লাভ না করে। তোমার দোস্তের মস্তক নিরাপদে রহিয়াছে, তুমি তাহাতে খন্‌জরের ধার পরীক্ষা করিতে পার।" এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলাও মানুষকে দুই প্রকারে চাপিয়া থাকেন, চোরকে চাপেন আর তাঁহার আশেকবৃন্দকেও চাপিয়া ধরেন। চোর তো খোদার ধরাতে ঘাবড়াইয়া অস্থির হইয়া যায়, আর আশেকদের অবস্থা এরূপ হয় যে :

اسیرش نخواهد رهائی ز بند + شکارش نجوید خلاص از کمند

"তাহার কয়েদী কয়েদখানা হইতে মুক্তি কামনা করে না, তাহার শিকার ফাঁদ হইতে খালাছ পাওয়ার প্রত্যাশা করে না।" এবং এরূপ অবস্থাও ঘটে :

خوشا وقت شوریدگان غمش + اگر تلخ بینند دگر مرهمش
گدایا نے از پادشائی نفور + با میدش اندر گدائی صبور
دمادم شراب الم در کشند + وگر تلخ بینند دم در کشند

"আল্লাহ্‌র পাগল যাহারা, তাহারা আল্লাহ্‌র চিন্তা কঠিন এবং ব্যথাদায়কই হউক আর মনের অনুকূলই হউক, চিন্তার সময়টুকুকে আনন্দদায়ক মনে করেন। কিছু সংখ্যক ফকীর বাদশাহী হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারই আশায় ফকীরীতে ছবর করিয়া রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্তে দুঃখ-কষ্টের শরাব পান করিতেছে। যদিও তিক্ত বা বিস্বাদ লাগে তবুও উহাই সহ্য করিয়া লয়।"

এখন আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিপদের একটি বাহ্যিক রূপ এবং একটি আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা আছে। সত্যিকারের বিপদ যাহাতে মনে পেরেশানী ও অস্থিরতা আসে তাহা অবশ্যই গুণাহের ফলে আসিয়া থাকে। কিন্তু বাহ্যিক বিপদ মর্যাদার উন্নতি এবং মহব্বতের পরীক্ষার জন্যও আসিয়া থাকে।

॥ যেক্‌রুল্লাহ্‌র স্তর ॥

এইরূপে যেক্‌রুল্লাহ্‌রও দুইটি স্তর আছে। একটি যেক্‌রের বাহ্যিক রূপ, যে 'ওযীফাবায' নামায পড়ে না তাহার যেক্‌র যেক্‌রের বাহ্যিকরূপ, সত্যিকারের যেক্‌র তাহার মধ্যে নাই। যেমন, মাটির নির্মিত হাতীর মূর্তি হাতীই বটে; কিন্তু কাজের হাতী নহে। মাটির হাতী প্রসঙ্গে আকবর ও বীরবলের একটি ঘটনা মনে পড়িল।

এক দিন আকবর বীরবলকে বলিল, আচ্ছা তিন জনের হঠকারিতা বড় কঠিন বলিয়া বিখ্যাত। রাজ-হট, স্ত্রী-হট ও বালক-হট। অর্থাৎ, রাজার জেদ্, স্ত্রীলোকের জেদ্ এবং শিশুর জেদ্। ইহাদের মধ্যে রাজা ও স্ত্রীলোকের জেদ্ তো কঠিন বলিয়া মানিয়া নিলাম। কেননা, তাহারা জ্ঞানবান, তাহারা এমন জেদ্ করিতে পারে যাহা

পূরণ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু শিশুদের জেদ্‌ পূর্ণ করা কিরূপে কঠিন তাহা তো বুঝিলাম না। বীরবল বলিল, হুযুর! সর্বাপেক্ষা কঠিন তো ইহাই বটে। অবশ্য বুদ্ধিমানের পক্ষে সহজ। আকবর বলিলেন, একথা আমার বুঝে আসিল না। বীরবল বলিল, আচ্ছা আমাকে এজাযত দিন, আমি শিশু হইয়া শিশুদের ন্যায় জেদ্‌ করিতে থাকি। আকবর বলিলেন, আচ্ছা; বীরবল উঁ উঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আকবর বলিল, কি হইল কেন কাঁদিতেছ? বলিল, আমি হাতী নিব, আকবর পিলখানা হইতে হাতী আনাইয়া দিলেন, আবারও সে কাঁদিতে লাগিল। আকবর বলিল, আর কি চাও? সে বলিল, আমাকে একটি ছোট মাটির পাত্র দিতে হইবে, আকবর একটি পাত্র আনাইয়া দিলেন। তবুও সে কাঁদিতে লাগিল, আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন আবার কি চাও? বলিল, এই হাতীটিকে এই মৃৎপাত্রে ভরিয়া দাও। এখন আকবর ঘাব্‌ড়াইয়া গেলেন, এই জেদ্‌ কেমন করিয়া পূর্ণ করা হইবে? তখন সে স্বীকার করিল, সত্যিই তো, শিশুর জেদ্‌ বড় কঠিন। কিন্তু তুমি যে বলিয়াছিলে জ্ঞানী লোকের পক্ষে শিশুর জেদ্‌ও পূর্ণ করা সহজ, এই খানে কি বুদ্ধি চালাইবে? বীরবল বলিল, হুযুর! জ্ঞানবানের পক্ষে বাস্তবিক ইহা সহজ। আকবর বলিলেন, আচ্ছা এখন আমি শিশু সাজিতেছি, তুমি আমার জেদ্‌ পূর্ণ কর। ফলতঃ আকবরও উক্ত অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করিল। কেননা, সে তো একটি অভিনয়ই বীরবলের নিকট শিখিয়াছিল। অতএব, আকবর যখন হাতী চাহিল, বীরবল তাহাকে ক্ষুদ্র একটি মাটির হাতী আনিয়া দিল। যখন মাটির পাত্র চাহিল, তখন বড় দেখিয়া একটি মাটির পাত্র আনাইয়া দিল, আবার হাতীকে মৃৎপাত্রে রাখিতে বলিলে সে সহজে তাহা মৃৎপাত্রে রাখিয়া দিল এবং বলিল, হুযুর! আপনি যে শিশুর জেদ্‌ অনুযায়ী পিলখানা হইতে হাতী আনাইয়া দিয়াছেন ইহাই ভুল করিয়াছেন। শিশুদের জন্য তাহাদের রুচি অনুযায়ী হাতীই আনাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। মোটকথা, মাটির হাতীও শিশুদের নিকট হাতী, কিন্তু জ্ঞানবানদের নিকট উক্ত হাতীর কোন মূল্য নাই।

এইরূপে যেক্‌রের মধ্যেও দুইটি স্তর আছে। যেক্‌রের বাহ্যিকরূপ আর প্রকৃত যেক্‌র। উভয় প্রকারের যেকের পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেক্‌রে হাকীকী আয়ত্ত হইলে সমস্ত নাফরমানীর কাজ হইতে রক্ষিত থাকা এবং সমস্ত আদেশ পালন করা অনিবার্য হইয়া পড়ে এবং যেক্‌রে হাকীকী খুবই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।

॥ আমাদের ত্রুটি ।

কিন্তু আজকাল আমরা ওয়াজেদ আলী শাহের সময়ের 'আহাদী' হইয়া গিয়াছি। (ইহা কেমন শব্দ বুঝা যায় না। আমার মনে হয়, এই শব্দটি احدی; ইহারা যেহেতু একই ব্যক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। একই ব্যক্তির দেহরক্ষীরূপে সর্বদা একই

ব্যক্তির সেবায় রত থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে 'আহাদী' বা এককসেবী বলা হয়।) আবার এই কাজ ভিন্ন যেহেতু তাহাদের অন্য কোন কর্তব্য নাই। কেবল প্রয়োজন হইলেই বাদশাহের দেহ রক্ষা করিয়া থাকে এবং এরূপ প্রয়োজন কচিৎই হইত। অন্য সময়ে বেতন খাইত আর আরাম করিত। এই কারণে তাহারা খুব অকর্মণ্য ও অলস হইয়া পড়িয়াছিল। এই আহাদীদেরই একটি ঘটনা বিখ্যাত আছে। দুইজন আহাদী একই স্থানে বাস করিত। তাহারা পরস্পর এই চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল যে, একজন একদিন শুইয়া থাকিবে অপর জন তাহার হেফাযত করিবে। আর একদিন দ্বিতীয় ব্যক্তি শুইয়া থাকিবে এবং প্রথম ব্যক্তি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। এক দিন তাহাদের একজন শুইয়াছিল, জনৈক অশ্বারোহী তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল, সে ডাকিয়া আরোহীকে বলিল, মিঞা অশ্বারোহী একটু এদিকে আস। সে কাছে আসিয়া বলিল, কেন? কি চাও? আহাদী বলিল, আমার বুকের উপর যে বরইটি রহিয়াছে ইহা আমার মুখে ফেলিয়া দাও। আরোহী বলিল, হতভাগা! আমি ঘোড়া হইতে নামিব তারপর বরই তোমার মুখে দিব। তুমি তোমার হাত দ্বারা কেন মুখে তুলিয়া লইতেছ না? সে বলিল। ভাই! এখন আবার হাত নাড়ে কে? মুখ পর্যন্ত নিয়া যায় কে?

তাহার সঙ্গী লোকটি সেখানেই বসিয়াছিল। আরোহী তাহাকে বলিল, তুমিই তাহার মুখে বরইটি তুলিয়া দাও না। সে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, জনাব! আমাকে একথা বলিবেন না। আপনি ব্যাপার জানেন না। গতকল্য আমার শয়ন করিয়া থাকার পালা ছিল। এই ব্যক্তি আমার কাছেই বসিয়াছিল। আমি হাই তুলিতেই একটা কুকুর আসিয়া আমার মুখে প্রস্রাব করিয়া গেল। এই হতভাগা উহাকে একটু তাড়াইয়াও দেয় নাই। এখন আমি তাহাকে বরই খাওয়াইব? আরোহী উভয়কে অভিসম্পাত দিয়া চলিয়া গেল।

অতএব, এই নির্বোধেরা যেমন অলসতা বশতঃ একটি সহজ কাজকে কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে, তদ্রূপ আমরা সহজকে কঠিন করিয়া রাখিয়াছি। আমরা বুঝিয়া লইয়াছি যে, সেই ব্যক্তিই 'যাকের' যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া নির্জনে চলিয়া যায় এবং আরামের সমস্ত ভাল ভাল উপকরণ বর্জন করে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য অনাবশ্যক সাজ-সরঞ্জামের জন্য খুব চেষ্টা এবং ফেকের করা নিন্দনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা, যাবতীয় আয়েশ ও আরামের সামগ্রী আল্লাহ্ তা'আলা হইতে গাফেল করিয়া ফেলে। তবে বিনা চেষ্টায় যদি আসিয়া যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নিজের এক স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছেন :

رَأَيْتُ طَائِفَةً مِّنْ أُمَّتِيْ رَاكِبِيْنَ هٰذَا الْبَحْرَ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ نَحْوِهٖ ❋

অর্থাৎ, "আমি দেখিলাম যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে একদল লোক সমুদ্রের উপর দিয়া সফর করিয়া জেহাদে গমন করিতেছে। তাহাদিগকে সিংহাসনে আরূঢ় বাদশাহের ন্যায় বোধ হইতেছিল। অর্থাৎ, বাদশাহী সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া গমন করিতেছে।" হুযূর (দঃ) এক দিকে তাঁহাদের ফযীলতও বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহারা রাজকীয় সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, জাঁকজমকপূর্ণ সাজসরঞ্জাম সকল অবস্থায় নিন্দনীয় নহে। আর যে সমস্ত বুযুর্গ লোক সিংহাসন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছিল তাঁহাদের হালের প্রাবল্য বশতঃ। অন্যথায় ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাঁহারা দ্বীনও দুনিয়াকে একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ ছিল, رُهْبَانُ اللَّيْلِ لُيُوثُ النَّهَارِ "রাত্রিকালে দরবেশ এবং দিনের বেলায় যুদ্ধক্ষেত্রের সিংহ।"

॥ ফরমাইশে সতর্কতা ॥

হযরত সুলতান নেযামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে রাজকীয় সাজসরঞ্জাম ছিল। কিন্তু নিজ চেষ্টায় তাহা সংগৃহীত হয় নাই; বরং আল্লাহ্ তা'আলা পাঠাইতেন। এই কারণেই একত্রিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার দস্তরখানে সময় সময় বহু উযীর নাযীর ও রাজা বাদশাহ উপস্থিত থাকিত। দরবারের সকলেই তাঁহাদের রুচি অনুযায়ী আহার্য পাইত। একবার উযীর তাঁহার দরবারে হাযির ছিলেন। খাইবার সময় হইয়া গেলে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, খাবার প্রস্তুত। উযীর সাহেবের অন্তরে তখন কল্পনা হইল যে, এখন মাছের কাবাব হইলে ভাল হইত। সোলতানজী তাঁহার এই কল্পনা কাশ্ফের সাহায্যে জানিতে পারিলেন। চাকরকে বলিলেন, একটু থাম।

এই কারণেই তো বুযুর্গানে দ্বীনের দরবারে যাইয়া মনকে খুব সংরক্ষিত ও সংযত রাখা আবশ্যক। কেননা, কোন কোন বুযুর্গ লোক কাশ্ফ্ দ্বারা আগন্তুকের মনের অবস্থা জানিতে পারেন। কেহ কেহ জানিতে না পারিলেও আদব এই যে, মনকে কল্পনামুক্ত করিয়া তাঁহাদের দরবারে যাইবে। কেননা, তিনি জানেন বা না জানেন, তোমার আদব উহার উপর নির্ভর করিবে না। তোমরা পিতার সম্মান কি শুধু তাঁহার সামনেই কর? পাছে কি সম্মান কর না?

মোটকথা, সোলতানজী কাশ্ফ দ্বারা জানিতে পারিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোআ করিলেন, "কোন স্থান হইতে মাছের কাবাব পাঠাইয়া দিন।" একটু পরে চাকর আবার আসিয়া বলিল: "হুযুর খাবার প্রস্তুত।" তিনি বলিলেন: 'একটু অপেক্ষা কর।' একটু পরে আবারও আসিয়া বলিল: 'হুযুর! আহার্যদ্রব্য ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।' তিনি বলিলেন: 'আরও একটু অপেক্ষা কর।' এমন সময়ে খাবারের খাঞ্চা মাথায় করিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া হাযির হইল এবং বলিল: 'হুযুর অমুক আমীর

আপনার খেদমতে সালাম আরয করিয়াছে এবং হুযূরের জন্য মাছের কাবাব পাঠাইয়াছে।' হযরত হাদ্‌য়া কবূল করিলেন এবং খাদেমকে খাবার আনিতে বলিলেন। উযীর সাহেব তখন মনে মনে বলিলেন, সম্ভবতঃ আমার ফরাইশের ফলেই আহারে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণ কাবাবের অপেক্ষা করা হইয়াছে, অথবা হয়ত ঘটনাক্রমেই কাবাব আসিয়া পড়িয়াছে। দস্তরখান বিছাইয়া সকলের সম্মুখে খাদ্য পরিবেশন আরম্ভ হইল। সুলতানজী বলিলেনঃ মাছের কাবাব উযীর সাহেবের সামনে অধিক রাখিও। তিনি উহা খুব ভালবাসেন। এখন উযীর সাহেব বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর সুলতানজী বলিলেনঃ উযীর সাহেব! ফরমাইশ করাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটু সময় বিবেচনা করিয়া ফরমাইশ করা উচিত। দেখুন, এখন খাওয়ার বিলম্ব হওয়ার দরুন সকলেরই কষ্ট হইল। এখন তো উযীর সাহেব স্থির নিশ্চিত হইলেন যে, কাশ্‌ফের দ্বারা হয়ত তিনি আমার মনের কল্পনা জানিতে পারিয়াছেন।

॥ দ্বীন-দুনিয়ার তারাক্কী ॥

ফলকথা, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছেন, যাঁহারা দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম লইয়াও দ্বীনের মধ্যে তারাক্কী করিয়াছেন। হযরত ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রারও এই শ্রেণীর বুযুর্গ লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁহার দরবারে প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম ছিল ? কিন্তু তরীকতপন্থীরা সকলেই তাঁহার কামালিয়ত সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি তৎকালে একজন বিখ্যাত বুযুর্গ লোক ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া মাওলানা 'জামী' তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মাওলানা জামীর রুচির উপর ফকীরীর প্রভাব অধিক ছিল। তিনি সূফীদের জন্য বাতেনী ফকীরীর সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দারিদ্রভাবও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। খাজা সাহেবের সাজ-সরঞ্জাম এবং জাঁকজমক দেখিয়া তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং উত্তেজনার বশে বলিয়া ফেলিলেনঃ نه مرد ست آنکه دنیا دوست دارد "যে দুনিয়া ভালবাসে সে মানুষ নহে।" এমনকি, রাগান্বিত হইয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিলেন; সুতরাং মসজিদে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন ও স্বপ্নে দেখিলেন—ক্বিয়ামতের ময়দান কায়েম হইয়াছে। এক ব্যক্তি মাওলানা জামীর নিকট আসিয়া দাবী করিতেছে—আমি তোমার নিকট কিছু পয়সা পাইব, পরিশোধ কর অন্যথায় নেকী দাও। তিনি অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন, অতঃপর দেখিলেন যে, খাজা ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব কোন বাহনে আরোহণ করিয়া তথায় পৌঁছিলেন এবং সেই দাবীদার ব্যক্তিকে বাধা দিয়া বলিলেনঃ 'ফকীরকে কেন বিরক্ত করিতেছ, এই ব্যক্তি আমার অতিথি। সে বলিলঃ 'আমি তাঁহার

নিকট কিছু পয়সা পাইব।' তিনি বলিলেন: 'আমি এখানে যে ধন-ভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়াছি তাহা হইতে নিজের দাবী বুঝিয়া লও।'

মাওলানা জামী এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইলেন। তখন যোহরের নামাযের সময় হইয়াছে, এদিকে খাজা সাহেব মসজিদে প্রবেশ করিতেছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তি দুনিয়াদার নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দা। দৌড়াইয়া গিয়া খাজা সাহেবের পদ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং মনের কল্পনার জন্য ক্ষমা চাহিলেন ও খেদমত কবুল করার জন্য আবেদন জানাইলেন। খাজা সাহেব সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন: 'আচ্ছা। তুমি যাহা চাহিবে তাহাই হইবে। কিন্তু তোমার সেই বয়েতাংশটি আবার একটু শুনাও, মাওলানা আরয করিলেন, তাহা তো আমার বোকামি ছিল। বলিলেন: একবার তুমি নিজের খুশীতে পড়িয়াছিলে, এখন আমার কথায় একটু পড়। তিনি নির্দেশ অনুসারে শুনাইয়া দিলেন:" نه مرد ست آنکه دنیا دوست دارد 'যে ব্যক্তি দুনিয়া ভালবাসে সে মানুষ নহে'। খাজা সাহেব বলিলেন: 'মন্তব্য তোমার ঠিকই আছে কিন্তু অপূর্ণ রহিয়াছে, কাজেই ইহার সহিত যোগ করিয়া দাও: اگر دارد برائے دوست دارد। "যদি ভালবাসে তবে বন্ধুর জন্যই ভালবাসে।"

॥ নফ্‌সকে চিনিবার মাপকাঠি ॥

বন্ধুগণ! মহব্বতের এক অবস্থা এই যে, নিজের তরফ হইতে মাহ্বুব ভিন্ন আর সকলকে ছাড়িয়া কেবল তাহারই দর্শনে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু স্বয়ং মাহ্বুব যদি আমাকে কোন এক সম্প্রদায়ের হাকিম নিযুক্ত করেন, তবে সেই শাসন কার্যের শৃঙ্খলা বিধানে মশ্‌গুল থাকাও ঠিক দর্শনই বটে। এই ব্যক্তি হাকিমের পদে থাকিয়াও যাকের এবং প্রত্যক্ষ দর্শনকারী।

এখন একটি কথা বাকী থাকে যে, আমি নিজের আনন্দের জন্যই শাসন শৃঙ্খলা করিতেছি, না শুধু মাহ্বুবের আদেশ পালনের জন্য করিতেছি, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? অতএব, ইহার মাপকাঠি এই যে, যদি সে ব্যক্তি প্রজাবৃন্দকে নিজের চেয়ে কম ওলী মনে না করে। যদিও বড় হইয়াই কাজকর্ম করিতেছে, কিন্তু অন্তরের বিশ্বাসে সকলকে নিজের চেয়ে বড় মনে করে, তবে তাহার এই মনোভাব ইহারই অনুরূপ হইবে যে, সে শুধু মাহ্বুবের হুকুম পালনের জন্যই মানুষের শাসন কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। নিজের নাফ্‌সের আনন্দের জন্য কাজ করিতেছে না। যেমন আল্লাহ্ ওয়ালাগণের অবস্থা এইরূপই হয় যে, তাঁহারা অপরকে শাস্তিও প্রদান করেন এবং ঠিক সেই অবস্থায় নিজের শাসন কার্যকে এইরূপ মনে করেন যেন বাদ্‌শাহ মেথরকে আদেশ করিয়াছেন—শাহ্যাদাকে এক শত বেত লাগাও, তখন সে বাদশাহর

হুকুম অবশ্যই পালন করিবে, কিন্তু শাহ্‌যাদা হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কল্পনাও তাহার মনে আসিবে না।

॥ সম্পর্ক বর্জনের নাম যেক্‌র নহে ॥

যাহা হউক, সেই ব্যক্তিকেই লোকে যাকের মনে করে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক বর্জন করিয়া ফেলে। যেমন, কোন কোন মূর্খ পীর গর্ব করিয়া থাকে— আমার মুরীদ বিশ বৎসর যাবৎ বিবির সঙ্গে কথা বলে নাই।

একবার আমি আমার বিবিকে চিকিৎসার জন্য মীরাঠে লইয়া গেলাম। তথায় একজন মহিলা আমার নিকট বাইআৎ হওয়ার দরখাস্ত করিল। তখন অন্য একজন স্ত্রীলোক তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, ইঁহার কাছে মুরীদ হইও না। ইনি তো বিবিকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিতেছেন। আমার পীরের হাতে বাইআৎ হও। তিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বিবির সঙ্গে কথা বলেন নাই।" কিন্তু সেই আল্লাহ্‌র বাঁদী একথার প্রতি লক্ষ্য করে নাই যে, এই স্ত্রীলোকটি তাহার অবস্থার ভাষায় জবাব দিতেছে যে, তুমি আমাকে এমন লোকের হাতে বাইআৎ হওয়ার উৎসাহ প্রদান করিতেছ যিনি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এমন লোকের হাতে কখনও বাইআৎ হইব না। বন্ধুগণ! এই যে কথা বিখ্যাত রহিয়াছে ঃ

آں کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند + فرزند و عزیز و خانماں را چہ کند

"যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিয়াছে, সে প্রাণ দিয়া কি করিবে? সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব এবং বাড়ী-ঘর দিয়া কি করিবে?" ইহার অর্থ এই নহে যে, পরিবার পোষ্যবর্গের হক্ নষ্ট করিয়া ফেল; বরং অর্থ এই যে, পরিবার পোষ্যবর্গের মহব্বত যেন তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত হইতে গাফেল করিতে না পারে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি খোদাকে চিনিবে, সে খোদার আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব অবশ্যই বুঝিবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ—পরিবার পোষ্যবর্গের হক আদায় কর। এই হিসাবে নহে যে, তাহারা তোমার; বরং তাহারা খোদার, এই হিসাবে। যেমন, হাদীসে আসিয়াছে, اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ "মানুষ আল্লাহ্‌র পোষ্যবর্গ" এবং তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, اَحَبُّكُمْ اِلَى اللهِ اَحْسَنُكُمْ اِلَى عِيَالِهِ অর্থাৎ, 'সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয় যে আল্লাহ্‌র পোষ্যবর্গ অর্থাৎ তাঁহার মাখ্‌লুকের সহিত অধিক সদ্ব্যবহার করে, বিশেষ করিয়া যে সমস্ত মাখ্‌লুকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা তাহার জন্য জরূরী। কিন্তু মানুষ এরূপ মনে করে যে, যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এবং বাসগৃহকে ভূমিসাৎ করিয়া যেকর ও ওযীফায় মগ্ন হয় সে-ই প্রকৃত যাকের ও ওযীফাদার সূফী। কিন্তু বাসগৃহ ভূমিসাৎ করিলে কি লাভ হইবে?

এরূপ লাভই হইবে যেমন, এক ব্যক্তি টাকা ধার লইয়া বাড়ী নির্মাণ করিল। ধার করিয়া বাড়ী করাই ছিল তাহার প্রথম বোকামি। অতঃপর মহাজন যখন টাকার তাগাদা করিল, তখন রাগান্বিত হইয়া বাড়ীটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল এবং বলিল : "যাও, তোমার টাকায় নির্মিত বাড়ীই আর রাখিলাম না। এরূপ করিয়া কি লাভ হইল? ঋণের টাকা তো সম্পূর্ণই খাড়া রহিল? অধিকন্তু একটি ক্ষতি এই হইল যে, বাড়ীটাও গেল। এই লোকটির অবস্থাকে এক আফিম খোরের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এক আফিম খোরের নাকের উপর বার বার মাছি আসিয়া বসিতেছিল। সে বার বার তাড়াইয়া দিত আর মাছিও বার বার আসিয়া বসিত। কোন কোন মাছি বড়ই লেচ্চড় হইয়া থাকে। বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। আফিম খোর মাছির উপর রাগ করিয়া কি করিল? ক্ষুর লইয়া নিজের নাকই কাটিয়া ফেলিল এবং বলিল : যাও, আড্ডাই আর রাখিলাম না। এখন আর কোথায় বসিবে?" কিন্তু মাছি পূর্বের চেয়ে এখন আরও ভাল আড্ডা পাইল। কেননা, রক্ত চুষিবার সুযোগ পাইল, সম্ভবতঃ এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক মাছির ফৌজ জমিয়া গেল। কিন্তু লাভ এই হইল যে, মিঞা সাহেবের নাক রহিল না। আজকাল যাকেরদেরও এই অবস্থা। স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া খোদাকে তো পাইলই না; অধিকন্তু আরও একটি ক্ষতি এই হইল যে, দুনিয়াটাকে তিক্ত করিয়া লইল এবং অস্থিরতা বাড়াইয়া লইল।

॥ যেক্রের রূপ ॥

এই জন্য আমার ইচ্ছা যেক্রের প্রণালী সহজ করিয়া দেই এবং প্রকৃত যেক্রের হাকীকত মানুষকে বলিয়া দেই। মানুষ সোয়া লক্ষ বার اَللّٰهُ اَكْبَرْ পড়াকে যেক্র মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও যেক্রের হাকীকত নহে; বরং যেক্রের বাহ্যিকরূপ ও যেক্রের লক্ষণসমূহের অন্তর্গত। অন্যথায় যদি সে যেক্রের হাকীকত লাভ করিতে পারিত, তবে এই ব্যক্তি অন্যান্য আমল বর্জন করিতে পারিত না। অথচ দেখা যায়, অনেকে সোয়া লাখ 'আল্লাহু আকবার' পাঠকারী, অন্যান্য আমল কিছুই করে না। অতএব, আমি যেক্রের হাকীকত বর্ণনা করিতেছি। একটি ব্যাপার হইতে উহা বুঝিয়া লউন। আপনি হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে, অনেক সময় ভদ্র লোকের অন্তরেও চুরি প্রভৃতি অপরাধমূলক কার্যের স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন, কোন কোন ভদ্রলোকও চুরি আরম্ভ করিয়া দেয়। শুধু এই কারণে যে, অভাবের তাড়না। এই তাড়না, চুরি তাহার পেশা বলিয়া নহে; বরং শুধু অভাবের কারণে। অভাব বড় সাংঘাতিক বিপদ। ইহা মানুষকে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতম স্থানে লইয়া যায়। এই যে অবস্থা দেখিলেন, ইহা আপনার সম্মুখেই রহিয়াছে। ইহাকে সর্বদা মনের মধ্যে রাখুন।

এখন ইহার বিপরীত অন্য এক দলকে দেখুন। স্বভাবের তাড়না এবং অভাব সত্ত্বেও চুরি করে না ; চুরি করা তো দূরের কথা সরকারী খাজানা, কর প্রভৃতিও ফাঁকি দেয় না ; বরং নিজের জোতের জমিন হালের গরু প্রভৃতি বেচিয়াও খাজানা পরিশোধ করে, যদিও পরিবারের লোকেরা ক্ষুধায় দিনাতিপাত করিতেছে।

এখন চিন্তা করুন, প্রথম শ্রেণীর লোক চুরি কার্যের প্রতি কেমন করিয়া অগ্রসর হয় ? আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক খাজানা পর্যন্ত কেন পরিশোধ করিয়া দেয় ? অথচ অভাব ও প্রয়োজনের দিক দিয়া উভয়েই সমান। ইহার কারণ শুধু এই যে, তাহারা একটি বিষয় স্মরণ রাখে, যাহা প্রথম শ্রেণীর লোকেরা স্মরণ রাখে না। অর্থাৎ, শাস্তি জেল প্রভৃতির অপমান—আর কিছু নহে। এখন বুঝিয়া লউন, যেক্‌রের হাকীকতও ইহাই এবং স্মরণ রাখাও ইহাকেই বলে, শুধু জানার নাম স্মরণ নহে। কেননা, চুরির অপরাধে জেল, বেত্রাঘাত প্রভৃতি শাস্তি হওয়ার কথা প্রথম শ্রেণীর লোকেরও জানা ছিল ; কিন্তু এই শাস্তি ও জেলের কথা তাহাদের মনের সামনে উপস্থিত ছিল না। এই কারণে তাহারা অপরাধমূলক কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে নাই। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সম্মুখে উহা উপস্থিত ছিল তাহারা সর্বদা উহা পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিত। এই কারণেই তাহারা চুরির প্রতি অগ্রসর হইতে পারে নাই।

ইহাতে সম্ভবতঃ কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, আপনার এই বর্ণনার সারকথা তো এই দাঁড়াইতেছে যে, বেহেশ্‌ত এবং দোযখের কথা স্মরণ রাখার নামই যেক্‌রুল্লাহ্, অথচ ইহাতে বেহেশ্‌ত এবং দোযখের যেক্‌র হইল। আল্লাহ্‌র যেক্‌র তো হইল না। ইহার উত্তর এই যে, সওয়াব এবং আযাবের স্মরণই আল্লাহ্‌র স্মরণ। যেমন বলা হয় যে, আইনকে স্মরণ কর। ইহার অর্থ এই যে, আইনের স্মরণই হাত-কড়ি এবং জেলের স্মরণ।

হাঁ, একথা অবশ্য সত্য যে, যেক্‌রুল্লাহ্‌র বিভিন্ন স্তর আছে। কাহারও কাহারও পক্ষে হাকিমের ব্যক্তিত্ব স্মরণ রাখাই যথেষ্ট হইয়া থাকে। তাহার পক্ষে অপরাধমূলক কার্য হইতে রক্ষিত থাকার জন্য জেলের শাস্তি ইত্যাদির কথা স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না ; বরং কোন কোন লোককে হাকিম এরূপ বলিয়াও দেয় যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তোমার কোন শাস্তি হইবে না। তথাপি হাকিমের সহিত তাহার এমন বিশেষ সম্পর্ক হয় যে, বিরোধিতা করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ এরূপ ক্ষেত্রে হাকিমের অসন্তোষের আশঙ্কায়ই বিরোধিতা করে না। কাহারও কাহারও আবার এরূপ আশঙ্কাও হয় না ; বরং তাহার লজ্জা-শরমই অপরাধমূলক কার্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। আবার কাহারও বা এই প্রতিবন্ধক অর্থাৎ, লজ্জা-শরমের প্রতিও লক্ষ্য থাকে না। এই সম্পর্কের কোন নাম নাই ঃ

خوبی همین کرشمه و ناز و خرام نیست + بسیار شیوه هاست بتان را که نام نیست

"ভ্রূভঙ্গি, প্রেমের ছলনা এবং মনোহর চলনভঙ্গিই কেবল সৌন্দর্য নহে। মা'শুকের অনেক চালচলন আছে যাহার কোন নাম দেওয়া যায় না।" উহার নাম যদি কিছু হয়, তবে "ব্যক্তিত্ব বা সত্তার সহিত সম্পর্ক" নাম দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, যেক্‌রের স্তরসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা অবশ্যই থাকে।

যেক্‌রের স্তরসমূহ ॥
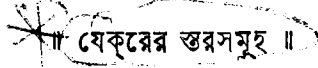
এখন আমাদের দেখিতে হইবে—আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আমাদের কিরূপ সম্পর্ক আছে। যে প্রকারের সম্পর্ক আছে উহারই উপযোগী যেক্‌রে আমাদের মশ্‌গুল হওয়া উচিত। এই স্তরের পার্থক্যের দরুনই আল্লাহ্ তা'আলা যেক্‌রের তাকীদ করিতে গিয়া কোথাও যেক্‌রকে নিজের সত্তার সহিত সম্পর্কিত করিয়া বলিয়াছেন : وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ "আল্লাহ্‌র যেক্‌র অতি মহান" এবং কোথাও তাঁহার নামের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন : وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا তোমার প্রভুর নাম যেক্‌র কর ··· ··· এখানে তাফসীরকারগণ اسم শব্দটিকে অতিরিক্ত বলিয়াছেন। কিন্তু আমি বলি, অতিরিক্ত বলার প্রয়োজন নাই; বরং এই যাকেরদের স্তর বিভাগের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বটে। এই তফসীর শুধু আমার নিজস্ব মত নহে। কেননা, ইহা আরবী ভাষা-নিয়মের বিরোধী নহে। শরীয়তের নিয়মেরও বিপরীত নহে; আবার আমি নিশ্চিতরূপেও বলি না; বরং এরূপ অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বলিতেছি। মাওলানা যেক্‌রের এই স্তরের পার্থক্যের প্রতি সচেতন করিয়া বলিতেছেন :

مست ولا یعقل نۂ از جام ہو + اے ز ہو قانع شدہ بر نام ہو

"ইহাতে একথার সজাগ করা হইয়াছে যে, যেক্‌রের একটি স্তর এরূপ আছে যাহা নামের যেক্‌র অপেক্ষা উন্নত ও উচ্চ। কিন্তু আর একস্থানে বলেন, নামের যেক্‌রও বেকার নহে; বরং হিতকর ও লাভজনক। যে ব্যক্তি উন্নত ও উচ্চ স্তরের যেক্‌র হাছিল করিতে না পারে সে এই নামের যেক্‌রকেই গণিমত মনে করিবে। কেননা :

از صفت وز نام چہ زاید خیال + وان خیالش ہست دلال وصال

"গুণ এবং নামের যেক্‌র দ্বারা কি ফল হইবে? উহার কল্পনা শুধু মিলনের দালাল, (পথ প্রদর্শক) হইতে পারে।" নাম যেক্‌র করা প্রসঙ্গে মাজ্‌নুর একটি ঘটনা স্মরণ হইল। কোন কবি মাস্‌নবীর ওযনে এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। শেএ'রগুলি মাসনবীর না হইলেও ভাল শেএ'র।

دید مجنوں را یکے صحرا نورد + دربیاباں غمش نشستہ فرد

ریگ کاغذ بود وانگشتاں قلم + می نویسد بہر کسے نامہ رقم

گفت اے مجنوں شیدا چیست این + می نویسی نامه بهر کیست این

گفت مشق نام لیلے می کنم + خاطر خود را تسلی می دهم

'একজন পথিক মজ্‌নুকে দেখিল, শূন্য প্রান্তরে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছে। মরুভূমির বালুকা ছিল কাগজ আর তাহার আঙ্গুল ছিল কলম। কাহার উদ্দেশ্যে যেন চিঠি লিখিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, হে মাজ্‌নু। কোন্ খেয়ালে আছ? এই চিঠি কাহার নিকট লিখিতেছ? উত্তর করিল: লায়লার নাম অভ্যাস করিতেছি এবং নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতেছি।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, মনঃসংযোগ না করিয়া শুধু মুখে যেক্‌র করিলেও তাহা বিফল হয় না। আর এই যে কোন কবি বলিয়াছেন:

بر زبان تسبیح ودر دل گاؤ خر + این چنین تسبیح کے دارد اثر

"মুখে তাস্‌বীহ আর অন্তরে গাভী ও গাধার চিন্তা; এই প্রকারের তাস্‌বীহ্‌তে কি ফল হইবে?" ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমি ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছি:

این چنین تسبیح هم دارد اثر "এই প্রকারের তাস্‌বীহরও ফল আছে।"

বন্ধুগণ! মজার কথা এই যে, মিষ্ট এবং টকের নামেও ফল বা ক্রিয়া আছে। নাম লওয়া মাত্র মুখ পানিতে ভরিয়া যায়। আর খোদার নামে কোন ফল না হওয়া বড়ই আশ্চর্যের কথা।

টকের নামের ফল দ্বারা দেওবন্দে জনৈক হিন্দু রাজবৈদ্য বড় কাজ লইয়াছিল। তাহা এই যে, দিল্লীর কোন বাদশাহ্‌র শাহ্‌যাদা প্রথম রোযা রাখিয়াছিল, তাহার রোযা ইফ্‌তার উপলক্ষে বড় ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। হঠাৎ আছরের সময় ছেলেটি পিপাসায় অস্থির হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, আমি রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল, এখন কি উপায় করা যাইতে পারে, যাহাতে রোযাও থাকে ছেলেরও কোন কষ্ট না হয়? চিকিৎসকদিগকে একত্রিত করা হইল। ইহাতে বুঝা যায়, বাদশাহ্ দুনিয়াদার হইলেও ধার্মিক ছিলেন। এই যুগের নূতন রঙ্গে রঞ্জিত ভদ্রলোকদের মত বেদ্বীন হইলে বলিয়া দিতেন, রোযার মধ্যে কি আছে? কিন্তু বাদশাহ রোযার সম্মান করিলেন। ফলকথা, চিকিৎসকগণ বহু উপায় চিন্তা করিলেন, কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। এই হিন্দু বৈদ্যটিও উপস্থিত ছিল। সে বলিল, আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি, অনুমতি পাইলে বলিতে পারি। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইলে সে বলিল, শীঘ্র কয়েকটা লেবু আনাইয়া লওয়া হউক এবং ছেলেপেলেদিগকে বলুন, তাহার সামনে যেন সকলে লেবু কাটিয়া চাটিয়া খাইতে আরম্ভ করে এবং জিহ্বা উপরের তালুতে লাগাইয়া চট্‌চট্ শব্দ করিতে থাকে। যেমন বলা তেমনি কাজ শুরু হইয়া গেল। ইহাতে শাহ্‌যাদার মুখে 'লালার' স্রোত বহিয়া গেল। এখন উক্ত বৈদ্য বলিতে

লাগিল, আমি আলেমদের নিকট শুনিয়াছি, মুখের নিঃসৃত লালা গিলিয়া ফেলিলে রোযা নষ্ট হয় না। শাহ্যাদা এই লালা গিলিতে থাকুন, পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। আলেমগণ ইহাতে একমত হইলেন এবং এইরূপে শাহ্যাদার রোযা পূর্ণ হইয়া গেল।

তৎকালে আলেমদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে হিন্দুরাও অনেক মাস্আলা জানিতে পারিত। আমি ভূপাল রাজ্যের ঘটনা শুনিয়াছি। জনৈক মুসলমান কোন এক হিন্দু স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে রূপার টাকা দিয়া রূপা খরিদ করিতেছিল। হিন্দু দোকানদারটি তাহাকে বলিল, এই প্রকারের বেচাকেনা তোমাদের ধর্মে জায়েয নাই। রূপার টাকার সহিত কিছু তামার পয়সা মিলাইয়া দাও, তাহা হইলে জায়েয হইবে।

এই যুগে আমাদের শহরে ঘিন্শী নামে একজন স্বর্ণকার ছিল। সে এই প্রকারের অনেক মাস্আলা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। কেননা, আমি তাহার দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতাম। আমার সঙ্গে সে এসমস্ত মাস্আলার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিত। অতএব, নামের যেক্রও নিষ্ফল নহে। অনেক সময়ে নামেই কাজ হইয়া যায়; বরং কোন সময় ভুলেও যদি কেহ আল্লাহ্র নাম লয় তৎক্ষণাৎ কবুল হইয়া যায়।

এক মূর্তিপুজক কয়েক বৎসর ধরিয়া 'সানাম্' 'সানাম্' (মূর্তি, মূর্তি) নাম জপ করিত। এক দিন ভুলক্রমে মুখ দিয়া 'সানামের' স্থানে 'সামাদ' নাম বাহির হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আওয়ায আসিল : لبيك يا عبدى لبيك "আমার বান্দা! আমি উপস্থিত আছি।" এই শব্দে মূর্তিপুজক লোকটি বেহাল হইয়া পড়িল এবং এক লাথি মারিয়া মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিল : 'হতভাগা! এত বৎসর তোকে ডাকিলাম তুই এই পোড়া মুখে কোন সময় উত্তর দিলে না। আমি কোরবান হই সেই খোদার জন্য যাঁহার নাম ভুলে একবার মুখে আনামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ আমার প্রতি দৃষ্টি করিলেন।'

'সীবওয়াহ্ ছিল আকীদায় মু'তাযেলী মতাবলম্বী। মৃত্যুর পরে কেহ তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? বলিলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, তুমি ক্ষমার উপযোগী ছিলে না, কিন্তু যাও একটি কথায় তোমাকে ক্ষমা করিতেছি, তাহা এই যে, তুমি আমার নামকে "আ'রাফুল মা'আরেফ" (সমস্ত নির্দিষ্টের মধ্যে অধিকতর নির্দিষ্ট) বলিয়াছিলে। তুমি আমার নামের ইয্যৎ করিয়াছ, আমিও তোমার ইয্যৎ করিতেছি। অথচ তিনি ইহা দীনদারীর নিয়তে বলেন নাই; বরং আরবী ব্যাকরণের নিয়ম বিশ্লেষণে বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ, الله শব্দটি নির্দিষ্টবাচক শব্দগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নির্দিষ্ট, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের আ'মলের এত মূল্য দান করেন যে, সামান্য কথায় ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার কথা কি বলিবেন, তিনি ক্ষমা করার জন্য উছিলা অন্বেষণ করিয়া থাকেন। رحمت حق بہانہ جوید "খোদার রহমত বাহানা (উছিলা)

তালাশ করে", সুতরাং নামের যেক্‌র একেবারে নিষ্ফল কেমন করিয়া হইবে? ইহাকেও মূল্যবান মনে করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিতেছি—শেষ যুগের সূফীগণ কেবল কল্‌বের যেক্‌রকেই মনোনীত করিয়াছেন, তাহা খুবই ভাল; কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; বরং কিছুক্ষণ পরেই কল্‌ব এদিক-ওদিক ছুটিয়া চলিয়া যায় এবং যাকের মনে করে যে, আমি যেক্‌রেই মশ্‌গুল রহিয়াছি। সুতরাং আমার বিবেচনা এই যে, মুখেও যেক্‌র করা আবশ্যক এবং কল্‌বকেও এদিকে রুজু করিয়া রাখা দরকার। কিছুক্ষণ পরে যদি কল্‌ব এদিকে রুজু নাও থাকে, তখন মুখের যেক্‌র তো বাকী থাকিবে এবং বৃথা সময় নষ্ট হইবে না; বিশেষতঃ আমি একটু আগেই বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছি যে, যে আ'মল খাছ নিয়তে আরম্ভ করা হয় উহার বরকত এবং নূর স্থায়ী থাকে—যদিও সেই নিয়ত সর্বক্ষণ মনে হাজির না থাকে, যদিও সেদিকে মন রুজু না থাকে। এখন যে আমাদের যেক্‌রের নূর পাইতেছি না, ইহার কারণ এই যে, একাগ্রভাবে মন রুজু থাকার কিংবা নূর হাছিল হওয়ার ইচ্ছাও আমাদের নাই। ইচ্ছাই যদি থাকে, তবে নূর অবশ্যই হাছিল হইবে। অতএব, এরূপ ক্ষেত্রে একথা বলা শুদ্ধ হইবে যে, این چنین تسبیح کے دارد اثر। অর্থাৎ, যেক্‌রের ফল লাভের ইচ্ছাই যদি না থাকে, তবে এরূপ তস্‌বীহ্‌র ফল হইবে কেন? আবার ইহাও বলা ঠিক হইবে যে, این چنین تسبیح هم دارد اثر অর্থাৎ, যদি ফল লাভের উদ্দেশ্য থাকে, তবে শুধু মুখের যেক্‌রেও ফল পাওয়া যাইবে। অতএব, এখন উক্ত কবির কথাও ঠিক, আমার কথাও ঠিক।

যাহা হউক, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বাক্যে اسم শব্দটিকে অতিরিক্ত বলার কোন প্রয়োজন নাই। নাম যেক্‌র করার নির্দেশ এক হিসাবে আর وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ অন্য হিসাবে। যেক্‌রের আরও একটি স্তর আছে, তাহা সওয়াব ও আযাবের স্মরণ রাখা। কেননা, কোরআনে ও হাদীসে স্থানে স্থানে সওয়াব আযাবের স্মরণ রাখার নির্দেশও রহিয়াছে। ইহা যেক্‌রুল্লাহ্‌র স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তর বিশেষ। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্‌র হুকুমগুলি পালন করাও আল্লাহ্‌র যেক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, হুকুমগুলির মধ্যেই তো আল্লাহ্‌র আনুগত্য নিহিত রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, যেক্‌রুল্লাহ্‌র বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে এই কারণেই মাশায়েখে কেরাম যেক্‌রের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

॥ মৌলিক যেক্‌রের স্তরসমূহ ॥

আমাদের চিশতীয়া তরীকার শায়খগণ মৌখিক যেক্‌রেও ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া থাকেন। বার তাসবীহ্‌র মধ্যে প্রথমে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ -এর যেক্‌র তা'লীম

দিয়া থাকেন। প্রাথমিক অবস্থার সালেকদের জন্য ইহাই উপযোগী। কেননা, তাহার মন এখনও 'গায়রুল্লাহ্‌র' স্মরণে পরিপূর্ণ। অতএব, তাহার প্রয়োজন—সমস্ত 'গায়রুল্লাহ্‌কে মনে হাজির করিয়া 'لا'-এর তরবারি দ্বারা ধ্বংস করিয়া দেওয়া। যখন সেই সমস্তের বিনাশ সাধন হয় এবং মন 'গায়রুল্লাহ্‌' হইতে একদম পবিত্র হইয়া যায়, তখন اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ, 'এস্‌বাতের' যেকের করা সমীচীন। কিন্তু اِلَّا اللّٰهُ যেকরের সময়ও মনে এক প্রকার 'গায়রুল্লাহ্‌র' উপস্থিতি পাওয়া যায়। কাজেই অতঃপর اللّٰهُ اللّٰهُ যেকর শিক্ষা দিয়া থাকেন। তখন শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্ত্বার প্রতিই মনোযোগ থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রেও নামের মাধ্যমেই মনোযোগ হইয়া থাকে। এই কারণেই এই তরীকার কোন কোন পীর অতঃপর هُوْ - هُوْ এর যেক্‌র শিখাইয়া থাকেন। তখন শুধু আল্লাহ্‌র সত্ত্বার প্রতিই মনোযোগ হয়। নামের মধ্যস্থতাও থাকে না—والله اعلم

আল্লামা ইব্‌নে তাইমিয়াহ্‌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ছাড়া উপরোক্ত সর্বপ্রকারের যেক্‌রই বেদ্‌আৎ বলেন। কেননা, হাদীসে এগুলির কোন প্রমাণ নাই। আমি যদি তখন থাকিতাম, তবে আদবের সহিত তাঁহার নিকট জানিতে চাহিতাম, ধর্মের ওলামায়ে কেরাম এই মাস্‌আলা সম্বন্ধে কি বলেন? এক ব্যক্তি কোরআন শরীফ হেফ্‌য্‌ করিবার সময় اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ আয়াতটিকে পৃথক পৃথক ভাবে এইরূপে 'ইয়াদ করিতেছে প্রথতঃ اِذَا السَّمَاءُ اِذَا السَّمَاءُ اِذَا মুখস্থ করিতেছে অতঃপর فَطَرَتْ فَطَرَتْ মুখস্থ করিতেছে। অতঃপর উভয় অংশকে মিলাইয়া اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ পূর্ণ বাক্যটি উচ্চারণ করিতেছে। অতএব, এইরূপে আয়াতটিকে মুখস্থ করা তাহার পক্ষে জায়েয হইতেছে কি না? এখানে সন্দেহের একমাত্র কারণ ইহাই যে, اِذَا السَّمَاءُ শব্দটি অর্থহীন এইরূপে فَطَرَتْ শব্দটিও অর্থহীন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, ইব্‌নে-তাইমিয়াহ্‌ ইহাকে অবশ্যই জায়েয বলিতেন। কারণ ইহাই বলিতেন যে, ইহা তেলাওয়াত নহে। তখন তেলাওয়াত করা উদ্দেশ্যও নহে; বরং মনের মধ্যে জমানই উদ্দেশ্য। অতএব, আমি বলি, তবে اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا اللّٰهُ আওড়ান কেন বেদ্‌আৎ হইবে? ইহা দ্বারাও তো যেক্‌রুল্লাহ্‌কে মনে জমাইয়া লওয়াই উদ্দেশ্য। আমি দাবী করিয়া বলিতে পারি, এবং আমার অভিজ্ঞতা আছে, যেক্‌রকে মনে দৃঢ়রূপে জমাইবার জন্য এই প্রণালী বিশেষ উপকারী। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কাহারও সন্দেহ থাকিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।

এখন যদি তাঁহার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, "এই ব্যক্তি যেমন কোরআন ইয়াদ করিতেছে, তেলাওয়াত করিতেছে না; বরং তেলাওয়াতের জন্য প্রস্তুতি করিতেছে তদ্রূপ لا الله যেক্‌রকারীও তো তদবস্থায় যেক্‌রকারী হইল না; বরং যেক্‌রের জন্য

প্রস্তুতি করিতেছে বলিতে হইবে।" তখন আমি বলিব, নামাযের জন্য অপেক্ষাকারী নামাযী বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং যেক্‌র প্রস্তুতিকারীও যাকের বলিয়াই গণ্য হইবে। দুঃখের বিষয় ইব্‌নে তাইমিয়ার সম্মুখে এ সমস্ত কথা কেহ বলে নাই। কাজেই এরূপ খণ্ড খণ্ড যেক্‌রকে বেদ্‌আত বলা সম্বন্ধে তিনি মা'যূর। আরও মজার ব্যাপার এই যে, তাঁহার সম্মুখে জাহেল সূফীদের ভুল যুক্তিই উত্থাপিত হইয়াছে। যেমন, কোন কোন সূফী الله। الله। যেক্‌র জায়েয হওয়ার পক্ষে এই আয়াতটি দ্বারা দলিল পেশ করিয়াছে। قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ "আপনি বলুন, 'আল্লাহ্‌' অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ খেলার মধ্যে ছাড়িয়া দিন।" সূফিয়ায়ে কেরামের এই দলিল শুনিয়া ইব্‌নে তাইমিয়াহ্‌ তাঁহাদের যথেষ্ট খবর লইয়া ছাড়িয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই আয়াতটি দ্বারা প্রমাণ উত্থাপনও করা যাইতে পারে না। কেননা, এই আয়াতে الله শব্দটি قل ক্রিয়ার কর্ম নহে। অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌' বলিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। কেননা, قول ক্রিয়ার কর্ম কখনও একটি শব্দ হয় না ; বরং পূর্ণ বাক্য হইয়া থাকে। এখানে الله শব্দটি نزل উহ্য ক্রিয়ার কর্তা। বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্কের সঙ্কেত হইতে উহা বুঝা যাইতেছে। কেননা, তৎপূর্বে বলা হইয়াছে :

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاۤؤُكُمْ - قُلِ اللّٰهُ اَىْ قُلْ اَنْزَلَهُ اللّٰهُ -

"আপনি জিজ্ঞাসা করুন : মূসা (আঃ) যে কিতাব লইয়া আসিয়াছে, যাহা নূর ছিল এবং হেদায়েত ছিল মানুষের জন্য, যাহা তোমরা পাতা পাতা করিয়া মানুষকে দেখাইয়াছ এবং উহার অনেক বিষয়কে গোপন রাখিয়াছ এবং উহার সাহায্যে তোমাদিগকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহা তোমরাও জানিতে না, তোমাদের বাপ-দাদারাও জানিত না তাহা কে নাযিল করিয়াছে ? আপনি বলিয়া দিন : আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করিয়াছেন, অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী খেলিবার জন্য ছাড়িয়া দিন।" অতএব, এই আয়াত দ্বারা খণ্ড খণ্ড যেক্‌র জায়েয হওয়ার প্রমাণ কোন মূর্খ সূফীই দিয়া থাকিবে। ফলে ইব্‌নে তাইমিয়াহ খুব সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং ভালরূপে তাহাদের খবর লইয়া ছাড়িয়াছেন, কিন্তু আনাড়ী চিকিৎসক ভুল করিয়া থাকিলে উহাতে মাহমুদ খাঁন এবং আবদুল মজিদ খাঁনের মত বিচক্ষণ চিকিৎসকের উপর খারাপ ধারণা করা জায়েয হইবে না। হাঁ, মউত খাঁকে মন্দ বলেন তো আমরাও আপনার সঙ্গে আছি। এটা কেমন কথা! আনাড়ীদের সঙ্গে

তত্ত্ববিদদিগকেও একই লাক্‌ড়ী দিয়া তাড়া করা হইতেছে। তত্ত্ববিদগণের প্রমাণাদি শ্রবণ করিলে ইব্‌নে তাইমিয়াহ্‌ সূফিয়ায়ে কেরামকে মন্দ বলিতে সাহস পাইতেন না।

সারকথা এই, মৌখিক যেক্‌রের একটি স্তর এই যে, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর। দ্বিতীয় স্তর এই যে, নামের মাধ্যমে তাঁহার সত্তাকে স্মরণ কর। তৃতীয় স্তর এই যে, নামের মধ্যস্থতাও থাকিবে না, কেবল আল্লাহ্‌র সত্তাকে স্মরণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে আল্লাহ্‌ তা'আলার সহিত সম্পর্কের একটি স্তর এই যে, যদি তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, কোন গুনাহর কাজের জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। যাহা ইচ্ছা করিতে থাক। তবুও সে তাঁহার কোন আদেশ লঙ্ঘন করিবে না; বরং যদি ইহাও বলিয়া দেওয়া হয় যে, তুমি আনুগত্য করিলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে এবং বিরোধিতা করিলে বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। তথাপি সে বিরোধিতা করিবে না। এতদ্ভিন্ন যদি বলিয়া দেওয়া হয় যে, কুফরী অবস্থায় তোমার মৃত্যু হইবে, তবুও আমলে ত্রুটি করিবে না।

যেমন কোন এক বুযুর্গ লোক যেক্‌রে রত ছিলেন, এমন সময় গায়েবী আওয়ায আসিল, যাহা ইচ্ছা কর, তোমার মৃত্যু কাফের অবস্থায়ই হইবে। তিনি খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যেক্‌র, নামায প্রভৃতি কিছুই ছাড়িলেন না; বরং পীরের খেদমতে যাইয়া বলিলেন। পীর বলিয়া দিলেন: "কাজে লাগিয়া থাক; এই আওয়ায শুনিয়া অস্থির হইও না। ইহা মহব্বতের গালি, মাহ্‌বুবের অভ্যাস—আশেককে এইরূপে অস্থির করিয়া থাকে।

بدم گفتی و خر سندم عفاک الله نکو گفتی + جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا

"তুমি আমাকে মন্দ বলিয়াছ, আমি বেশ খুশী আছি। ভালই বলিয়াছ, আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন, পদ্মরাগ সম মিষ্টভাষী ঠোঁটেই তিক্ত জবাব শোভা পায়।" অস্থির করাও মহব্বতের এক ঢং।

ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست + کس را رسد نه چون و چرا در قضاے ما

"আমি দুশ্‌মনকে প্রতিপালন করি এবং বন্ধুকে বিনাশ করি, আমার বিধানে কাহারও আপত্তি করার বা কৈফিয়ত তলব করার অধিকার নাই।"

আমার ওয়ালেদ ছাহেব শিশুদিগকে কোলে কম লইতেন। কোন সময় অধিক মহব্বতের জোশ আসিলে শিশুদের চোয়াল ধরিয়া চাপ দিতেন তাহাতে শিশু কাঁদিয়া উঠিত। তখন মহিলারা বলিতেন, আপনার মহব্বত তো বড় অদ্ভুত। শিশুদের কোলে লওয়া বা খাওয়ানোর নাম নাই, চোয়াল চাপিয়া কাঁদাইতে আসেন, কিন্তু তিনি ইহাতেই আনন্দ পাইতেন। আমিও শিশুদের লইয়া হাসিঠাট্টা করিতে ভালবাসি, যাহাতে তাহারা সময় সময় রাগান্বিতও হইয়া পড়ে। তাহাদের এসময়কার দৃষ্টিভঙ্গি বা ভ্রূভঙ্গি আমার খুব ভাল লাগে।

এইরূপে, বিনা তুলনায়, মনে করুন, কোন কোন মানুষকে মহব্বতের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নানা প্রকারে পেরেশান করিয়া থাকেন। তাহাদের কান্নাকাটি ও চীৎকার তিনি খুব পছন্দ করেন। কাহারও বা হাসি পছন্দ করেন তাহাকে হাসান, কাহারও কান্না পছন্দ করেন তাহাকে কাঁদান।

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خندان ست + بعندلیب چه فرمودهٔ که نالاں ست

"ফুলের কানে কানে কি বলিয়া দিয়াছ যে, সে হাসিতেছে? বুলবুলকে কি বলিয়াছ যে সে কান্দিতেছে?" আর—

ما پروریم دشمن و ماسی کشیم دوست + کس را رسد نه چون و چرا در قضاے ما

"আমি দুশ্‌মনকে প্রতিপালন করি এবং বন্ধুকে হত্যা করি, আমার বিধানে কাহারও কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই।"

এই বিবরণ হইতে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, বেহেশ্‌ত, দোযখ এবং শাস্তি ও আযাবের স্মরণ করাও আল্লাহ্ তা'আলাকেই স্মরণ করা। কেননা, যেক্‌রের স্তর বিভিন্ন।

॥ যেক্‌রের হাকীকত ॥

অতএব, যেক্‌রের হাকীকত এই যে, যেমন কোন লোক স্বভাবের তাড়না সত্ত্বেও চুরি করে না, খাজানা পরিশোধে শৈথিল্য করে না। কেননা, একটি বস্তু তাহার স্মরণে আছে, অর্থাৎ শাস্তি, জেল প্রভৃতি। এইরূপে যে বস্তু নাফরমানী ও গুনাহের কাজ হইতে নিবৃত্ত করে এবং এবাদতের প্রেরণা ও হিম্মত দান করে, সে বস্তু স্মরণ রাখাই 'যেক্‌রুল্লাহ্'। যদি কাহাকেও الله। الله। যেক্‌র করা নাফরমানীর কাজ হইতে বিরত রাখে, তবে ইহাই তাহার জন্য যেক্‌রুল্লাহ্। আর যদি الله। الله। করা কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজ হইতে নিবৃত্ত না করে, তবে তাহার জন্য ইহা প্রকৃত যেক্‌রুল্লাহ্ হইবে না; যেক্‌রের বাহ্যিক রূপের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহার অবস্থার উপযোগী প্রকৃত যেক্‌র কোন তত্ত্ববিদের দ্বারা নির্বাচন করিয়া লইতে হইবে। যেমন, কাহারও নাফ্‌সের উপর আর্থিক জরিমানা করিলে উহা তাহাকে গুনাহের কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখে; তাহার জন্য আর্থিক দণ্ডই প্রকৃত যেক্‌র। ইহাই যেক্‌রের হাকীকত। ইহাই সর্বপ্রকার তরীকতের মূল; বরং সমস্ত শরীয়তেরও।

॥ আ'মলের প্রাণ ॥

এখন আমি কয়েকটি আয়াত বর্ণনা করিয়া শেষ করিব। এই আয়াতগুলি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, যাবতীয় আমলের উদ্দেশ্যই যেক্‌র এবং ইহাই সমস্ত আমলের প্রাণ এবং ভিত্তি।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন: أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى ইহাতে বুঝা যায়, নামাযের উদ্দেশ্য যেক্‌র। রোযা সম্বন্ধে বলেন: وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ "আল্লাহ্ যাহার প্রতি তোমাদিগকে হেদায়ত করিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ্‌র তাক্‌বীর পাঠ কর।" আর হজ্জ সম্বন্ধে বলিয়াছেন: فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ "মহান প্রতীকের অর্থাৎ, মুয্‌দালেফার নিকট আল্লাহ্‌র যেক্‌র কর।" আর:

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ

"এবং নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে আল্লাহ্‌র যেক্‌র কর।" আর:

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

"কোরবানীর সারি বাঁধা জান্‌ওয়ারগুলির উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম যেক্‌র কর।" আর যদি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তবে সর্বপ্রকারের আ'মলের মধ্যেই 'যেক্‌র' বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যাইবে।

এই তো দিলাম প্রকাশ্য আমলগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত। এখন বাতেনী আমলগুলির মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখুন, সেখানেও দেখিবেন, যেক্র বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ্ বলেন: اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

'যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌র যেক্‌র করা হয়, তখন অন্তরসমূহ ভীত হইয়া যায়। আর যখন তাহাদের সম্মুখে আমার কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়া দেয়।" ইহাতে বুঝা যায়, সেই ভয় ভীতিই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গ্রহণীয় যাহার উদ্দেশ্য হয় যেক্‌রুল্লাহ্। এই সমস্তই 'মোকামাত'-এর বর্ণনা। কেননা, আমলগুলিকেই মোকামাত বলা হয়। এখন 'হাল'সমূহের মধ্যে চিন্তা করুন। দেখিবেন, সেখানেও যেক্‌কের দখল রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন: اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ "আল্লাহ্‌র যেক্‌রেই কল্‌বের শান্তি লাভ হয়।" শান্তির দুইটি স্তর আছে। একটি 'মোকাম' যাহা অন্তরের বিশ্বাসের স্তর। আর একটি 'হাল'। ইহাকে নিরুদ্বেগ ও মহব্বতও বলা যায়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ শান্তির জন্য যেকররুল্লাহ্‌কে কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উহার ব্যাপকতার মধ্যে উপরোক্ত মোকাম ও হাল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর যদি ব্যাপকতার দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ নাও করা হয়, তবুও চাক্ষুষ দর্শন স্বয়ং উহার প্রমাণ রহিয়াছে। কেননা, বাস্তবিক অন্তরের আরাম ও শান্তি যেক্‌রুল্লাহ্‌র দ্বারাই ভাগ্যে জুটিয়া থাকে।

মাওলানা বলেন :

گر گریزی بر امید راحتے + ہم ازاں جا پیشت آید آفتے

ہیچ کنج بے دوزخ دام نیست + جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

"যদি তুমি শান্তির আশায় অন্যত্র পলাইয়া যাও। সেই জায়গায়ও তুমি বিপদের সম্মুখীন হইবে। কোন স্থানই অপরের সংস্রব ও ফেৎনা হইতে মুক্ত নহে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নির্জন স্থান ভিন্ন আর কোথাও আরাম নাই।" আল্লাহ্ তা'আলার নির্জন স্থান বলিতে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনই উদ্দেশ্য। ইহা যেক্‌রুল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ স্তর। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, যাকেরগণ কেমন শান্তিতে আছেন! তাঁহারা কোন অবস্থাতেই অস্থির হন না। কেননা, একমাত্র সত্তার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক। যাহাকিছু তাঁহাদের উপর আসে, উহাকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মনে করিয়া তাঁহারা সর্বদা নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন :

موحد چہ بر پائے ریزی زرش + چہ فولاد ہندی نہی بر سرش

امید وہراسش نباشد زکس + ہمیں است بنیاد توحید وبس

"এক খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী, চাই কি তাঁহার পায়ের সম্মুখে স্বর্ণের স্তুপ রাখিয়া দাও, কিংবা মাথার উপর ভারতীয় তরবারী ধারণ কর কাহারও প্রত্যাশাও করিবে না, কাহাকেও ভয়ও করিবে না। ইহাই তাওহীদের ভিত্তি। আর কিছু নহে।"

যেক্‌রের কোন সীমা নাই ॥

যেক্‌রের অবস্থা যাহাকিছু বর্ণনা করিলাম ইহাতে আপনারা বুঝিয়া নিবেন যে, যেক্‌রের কোন সীমা নাই। অথচ নামাযের জন্যও একটি সীমা আছে যে, নিষিদ্ধ সময়ে নামায হারাম। রোযার জন্যও সীমা আছে পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। যাকাত এবং ছদ্‌কার জন্য সীমা আছে خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى "অবস্থাসম্পন্ন অবস্থার দান সর্বোত্তম" হজ্জের জন্য সীমা আছে। যেমন, ফরয হজ্জ আদায় করার পর এমন ব্যক্তির জন্য নফল হজ্জ জায়েয নাই যাহার হজ্জের দরুন পরিবার পোষ্যবর্গের হক নষ্ট হয়। কিন্তু যেক্‌রে হাকীকীর জন্য কোন সীমা নাই যাহার হকীকত খোদাকে স্মরণ রাখা যেমন, হাদীস শরীফে আছে, হুযুর (দঃ) সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র করিতেন يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْ كُلِّ اَحْيَانِهٖ এবং যেক্‌রুল্লাহ্ অত অসীম যে, পায়খানা-প্রস্রাবখানায় বসিয়া মুখে যেক্‌র করা যদিও নিষিদ্ধ, কেননা, মুখ পায়খানায় প্রস্রাবখানায় রহিয়াছে। কিন্তু তথায় থাকিয়া অন্তরে আল্লাহ্‌র যেক্‌র করা নিষিদ্ধ নহে এবং যেক্‌রে হাকীকী, কেননা, কল্‌ব্ পায়খানায় নহে। এখান হইতে ছুফিয়ায়ে কেরামের এই কথার একটি সূক্ষ্ম পোষকতা পাওয়া যায় যে, কল্‌বের পবিত্র

করণ দেহের বাহিরে। কল্‌ব অন্য জগতে অবস্থিত। এই কারণেই পায়খানায় বসিয়া কলব দ্বারা যেক্‌র করা নিষিদ্ধ নহে। কেননা, কল্‌ব্‌ সেখানে নাই। এই বিশ্লেষণটি যদি কেহ না বুঝে না মানে, তবে সে এইরূপে বুঝিতে পারে যে, যেক্‌রকারীর কল্‌ব্‌ খোলে ঢাকা তাবীযের ন্যায়। খোল দ্বারা আবৃত্ত তাবীয যেমন পায়খানায় লইয়া যাওয়া জায়েয। তদ্রূপ যেকেরকারীর কল্‌ব্‌ও পায়খানায় সঙ্গে থাকা জায়েয আছে। আর জিহ্বা যদিও আবৃত কিন্তু ঠোঁট এবং দাঁতের নড়াচড়া ব্যতীত জিহ্বা দ্বারা যেক্‌র হইতে পারে না এবং ঠোঁট দাঁত নাড়াচাড়া করিলে জিহ্বা আবৃত থাকিবে না, উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। আর যদি কেহ পায়খানায় বসিয়া দাঁত ও ঠোঁট নাড়া ব্যতীত এবং মুখ খোলা ব্যতীত জিহ্বা দ্বারা যেক্‌র করিতে পারে, তবে তাহা জায়েয হইবে। কিন্তু তাহা তো যেক্‌রই নহে। কেননা, যেক্‌র ও তেলাওয়াতের জন্য হরফগুলি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করা আবশ্যক। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আওয়াযও অপরে শুনিতে পাওয়া আবশ্যক। এতটুকু শব্দ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইলে তাহা মুখ না খুলিয়া সম্ভব হয় না। এতভিন্ন যে যেক্‌র হইবে উহাকে যেক্‌রের হুকুমের মধ্যে গণ্য করা হইবে, হাকীকী যেক্‌র হইবে না।

এখান হইতে মানুষের অক্ষমতা বুঝা যাইতেছে। অর্থাৎ, মানুষ ঠোঁট ও দাঁত না নাড়িয়া কথা বলিতে ও যেক্‌র করিতে অক্ষম। ইমাম আবুহানীফা (রঃ) জনৈক ক্ষমতাবাদীকে এই জবাবই দিয়াছিলেন যে, "তুমি যে বলিতেছ মানুষের যাবতীয় কার্য মানুষেরই সৃষ্ট, আমি একথা তখনই মানিব যদি তুমি ض অক্ষরটির উৎপত্তিস্থল হইতে ص অক্ষর কিংবা 'ص' অক্ষরটির উৎপত্তিস্থল হইতে ض অক্ষরটি বাহির করিতে পার। বস্, ইহাতেই সে অক্ষম হইয়া গেল।

এই কারণেই দুধের শিশু পেয়ার করিতে পারে না, কেননা, পেয়ার করিতে হইলে মুখকে যেভাবে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন শিশু তাহা করিতে অক্ষম। আমি একবার এক শিশুকে পেয়ার করিয়া আবার তাহাকে বলিলাম, "তুমিও পেয়ার কর।" সে মুখ ঘুরাইতে লাগিল, পেয়ার করিতে পারিল না। মোটকথা, মানুষ ঠোঁট ও দাঁত না নাড়িয়া কথা বলিতে পারে না এবং ঠোঁট ও দাঁত নাড়িলে জিহ্বা মুক্ত হইয়া পড়ে, আবৃত থাকে না। কাজেই পায়খানায় বসিয়া মুখে সশব্দে যেক্‌র করা নিষিদ্ধ; কিন্তু কল্‌বের যেক্‌র জায়েয আছে। কেননা, কল্‌ব্‌ দেহের বাহিরে, কিংবা আবৃত।

॥ প্রশ্নের উত্তর ॥

এখানে দুইটি প্রশ্ন উত্থিত হয়। একটি এই যে, আপনি বলিয়াছেন, সমস্ত আমলের প্রাণ যেক্‌র। ইহাতে একথা অনিবার্য হয় যে, যেব্যক্তি যেকর আয়ত্ব করিয়াছে,

তাহার আর আমলের প্রয়োজন নাই। কেননা, আমলের প্রাণবস্তুই তো হাছিল হইয়া গিয়াছে।

ইহার উত্তর এই যে, একথা যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, আমলের দ্বারা শুধু রূহ্‌ই উদ্দেশ্য, উহার বাহ্যিকরূপ কাম্য নহে তবেই এই প্রশ্ন উত্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইহা ভুল। কেননা, আমরা দেখিতেছি যে, সন্তানের কেবল রূহ কাম্য হয় না। অন্যথায় রূহ তো মৃত্যুর পরেও স্থায়ী থাকে; বরং রূহ এবং রূপ উভয়ই কাম্য! এই কারণেই সন্তানের মৃত্যুর পর সুরত চক্ষুর অগোচর হওয়ার জন্য দুঃখ ও শোক হয়। নচেৎ রূহ্‌ যে মৃত্যুর পরেও বাকী আছে, এই বিশ্বাস সকলেরই আছে। দ্বিতীয়ত, উপরে বলা হইয়াছে যে, যেকরে হাকীকী সমস্ত আমলের মূল এবং শাখা ভিন্ন মূল কোন কাজেরই থাকিতে পারে না। এইরূপে শুধু যেকর অন্যান্য আমল ভিন্ন কোন কাজেই লাগে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আপনি এক ওয়াযে প্রত্যেক আমলের সীমা বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাপকতার মধ্যে যেক্‌রও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর অন্যকার ওয়াযে আপনি বলিতেছেন যেক্‌রের কোন সীমা নাই। অতএব, আপনার উভয় ওয়ায পরস্পর বিরোধী।

ইহার একটি জবাব এই যে, উক্ত ব্যাপকতার মধ্যে যেক্‌র অন্তর্ভুক্ত নহে। আর একটি জবাব এই—যেকরের জন্যও হদ্‌ বা সীমা আছে। কিন্তু তাহা বড়ই প্রশস্ত এবং তদ্রূপ সীমাবদ্ধতা কচিৎই হইয়া থাকে। মনে করুন যদি যেক্‌র করিতে কাহারও কষ্ট বোধ হয়। অর্থাৎ, তদবস্থায় মুখেও যেকর করিতে পারে না, কলব দ্বারাও পারে না এবং এরূপ অবস্থা তাহারাই অনুভব করিতে পারে যাহারা শারীরিক পীড়ায় পীড়িত অর্থাৎ, যেমন কাহারও মস্তিষ্ক দুর্বল। মস্তিষ্কের দুর্বলতা বশতঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া কল্পনাও করিতে পারে না, কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় এরূপ লোকের পক্ষে যেক্‌র করা জায়েয নাই। কেননা, ইহাতে যেক্‌রের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিতে পারে।

এই মাস্‌আলা আপনারা অন্য কাহারও মুখে শুনিতে পাইবেন না। কেননা, প্রথমত একথা কাহারও বুঝেই আসিবে না যে, ধ্যানেও কষ্ট হইতে পারে। আর যদি কেহ ইহা বুঝিতে পারিয়া থাকে, তবে একথা তাহার বুঝে আসিবে না যে, কষ্ট সহকারে যেক্‌র করিলে যেকরের প্রতি ঘৃণা কেন উৎপন্ন হইবে? কিন্তু আমি অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। কোন কোন সময় ধ্যানে এত কষ্ট হয় যে, তখন যে বস্তুর উপরই ধ্যান জমাইতে চেষ্টা করা হয়, সে বস্তুর প্রতি মনের অসন্তোষ উৎপন্ন হইতে থাকে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী পীর এরূপ অবস্থায় ধ্যান করিতে নিষেধ করিয়া দিবেন। যাহাতে যেক্‌রের প্রতি মহব্বত বাকী থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই অবস্থা অবশ্যই খুব কচিৎ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আমার এই কথা বলা ঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে যে, যেক্‌রের জন্যও সীমা আছে, কিন্তু তাহা বড় প্রশস্ত সীমা।

এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে যেক্‌রের তাওফীক দান করুন এবং প্রকৃত যেক্‌র হাছিল করিবার সৌভাগ্য দান করুন এবং ইহাকে সমস্ত শাখা-প্রশাখার মূল ভিত্তি করিয়া দিন ঃ

آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ○

ব্যাখ্যা

এই ওয়াযটি খতম হওয়ার পূর্বক্ষণে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে যে, অনুসন্ধানে জানা যায়, সমস্ত আমলের মধ্যে যেক্‌রে হাকীকীর বড় অধিকার কিংবা বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে এবং কোরআন মজীদ হইতে ইহার কয়েকটি প্রমাণও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তখন আমার অন্ত্র নামিয়া পড়িল, (হার্ণিয়া) কিছুক্ষণ সহ্য করিলাম কিন্তু কষ্ট যখন বাড়িতে লাগিল এবং মন অশান্ত হইয়া পড়িল। ওয়ায সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। এখন অবশিষ্ট আরও কয়েকটি কোরআনিক প্রমাণ উহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতেছি।

১। আলোচ্য বাক্যটির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر

"নামায কায়েম কর। নিশ্চয়, নামায অশ্লীল ও মন্দ কথা এবং কার্য হইতে বিরত রাখে।" ইহার সহিত আলোচ্য আয়াতটির ঘনিষ্ট সম্পর্ক এই যে, এই আয়াতে নামাযের মাধ্যমে যেক্‌রের কথা উল্লেখ রহিয়াছে ঃ "নামাযে আল্লাহ্‌র যেক্‌র আছে এবং আল্লাহ্‌র যেক্‌র অতি মহান। অতএব, যেক্‌রের ফলেই নামায অশ্লীল ও মন্দ কথা এবং কার্য হইতে বিরত রাখে।

২। আরও বলিয়াছেন ঃ وذكر اسم ربه فصلى "এবং তাঁহার প্রভুর নাম যেক্‌র করিয়াছে, তৎপর নামায পড়িয়াছে।" এখানে নামাযকে যেক্‌রের স্তর পর্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, নামাযের মধ্যে যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

৩। আরও বলিয়াছেন ঃ أقم الصلوة لذكري "আমার যেক্‌র করার উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।" ইহার বর্ণনা ওয়াযের মধ্যে হইয়া গিয়াছে।

৪। আরও বলিয়াছেন : وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ইহার বিবরণও ওয়াযের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

৫। আরও বলিয়াছেন :

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ

ইহা হজ্জ সম্বন্ধীয়। ইহার বিবরণও ওয়াযের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে :

৬; আরও বলিয়াছেন :

لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ — المنفقون

ইহাতে দানের নির্দেশের পূর্বে যেক্‌রের নির্দেশ রহিয়াছে। অতঃপর দানের নির্দেশ থাকায় প্রকাশ্য ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, দানের মধ্যে যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। যেমন, কোরআনের স্থানে স্থানে اٰمَنُوْا-এর পরে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ উল্লেখ করায় বুঝা গিয়াছে যে, নেক কাজের মধ্যে ঈমানের দখল রহিয়াছে। তদ্রূপ এখানেও যেক্‌রের নির্দেশের পরে দানের নির্দেশ আনাতে বুঝা যায় যে, দানের মধ্যে যেক্‌রের পুরাপুরি দখল রহিয়াছে।

৭। আরও বলিয়াছেন :

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ (وَقَوْلُهٗ) فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ - الاية

'যখন তোমরা আ'রাফা হইতে দলে দলে বাহির হইয়া আস, তখন মাশ্‌আরে হারাম অর্থাৎ, মুয্‌দালেফায় আল্লাহ্‌র যেক্‌র কর এবং তিনি যেরূপ যেক্‌র করিতে হেদায়ত করিয়াছেন তদ্রূপ তাঁহার যেক্‌র কর। আরও বলিয়াছেন : "তোমরা যখন হজ্জের কার্যগুলি সমাধা করিবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র করিবে।" যেহেতু হজ্জ কতিপয় আ'মলের সমষ্টি, অতএব, স্থানে স্থানে যেক্‌রের নির্দেশ দিয়াছেন, যেন প্রত্যেক আ'মলে উহা হইতে সাহায্য পাওয়া যায়।

৮। আরও বলিয়াছেন :

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ❋

এই আয়াতে কোরবানীকেও যেক্‌রুল্লাহ্‌ হইতে শূন্য ছাড়েন নাই, যাহাতে উহার সমস্ত বিধান এবং সীমার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং লক্ষ করা সহজ হয়।

৯। আরও বলিয়াছেন :

ان المسلمين والمسلمات (الى قوله) والذاكرين الله كثيرا والذاكرات

এই আয়াতে ইস্‌লাম, ঈমান, কুনূত, সততা, ছবর, ভয়, বিশ্বাস, রোযা ও সতীত্ব রক্ষার উল্লেখ রহিয়াছে এবং এই সমুদয়ের বর্ণনা শেষ করিয়াছেন যেকরুল্লাহ্‌র সহিত। ইহাতে ইঙ্গিত হইতে পারে যে, যেক্‌রুল্লাহ্‌ দ্বারা বর্ণিত সমস্ত কার্যই সহজ হইয়া যায়।

১০। আরও বলিয়াছেন :

والذين اذا فعلوا فاحشة اوظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

এখানে যেক্‌রের পরে এস্তেগ্‌ফারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, যেক্‌র এস্তেগ্‌ফারের কারণ হয়, ইহা সুস্পষ্ট।

১১। আরও বলেন :

انَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

ইহাতে বুঝা যায়, শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসার স্পর্শ হইতে রক্ষা পাওয়ার মধ্যে যেক্‌রুল্লাহ্‌র দখল রহিয়াছে।

১২। আর ও বলিয়াছেন :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ

পূর্ববর্তী আয়াতে যাহা বুঝা যায়, ইহাতেও তাহারই প্রমাণ রহিয়াছে।

১৩। আরও বলিয়াছেন :

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"তাহারাই মো'মেন যাহাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌ তা'আলার যেক্‌র করা হইলে তাহাদের অন্তর ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, ভয়রূপ আভ্যন্তরীণ আ'মলের মধ্যে যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

১৪। আরও বলিয়াছেন :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ

"যাহারা মো'মেন, তাহাদের অন্তর যেক্‌রুল্লাহ্‌র দ্বারা প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া থাকে।" এই আয়াতে বুঝা যায়, অন্তরের শান্তির মধ্যে যেকরুল্লাহ্‌র দখল

রহিয়াছে। অন্তরের শান্তিও 'হাল' এবং মোকামের মধ্যে বিভক্ত। ইহার বর্ণনা ওয়াযের মধ্যে করা হইয়াছে।

১৫। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

"তোমরা আমার যেক্‌র কর। আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং তোমরা আমার শোক্‌রগুযারী কর এবং আমার কুফরী করিও না।" বাহ্যিক বাক্য বিন্যাস হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শোকরগুযারীর মধ্যে যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। ইহা মোকামাতের (আধ্যাত্মিক স্তর বিশেষ)-এর অন্তর্গত।

১৬। আরও বলিয়াছেন :

يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله

كثيرا لعلكم تفلحون -

"হে মুমেনগণ! তোমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদলের সম্মুখীন হও, তখন দৃঢ়-পদ থাক এবং প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র কর। তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হইবে।" যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখে দৃঢ়-পদ থাকা অতি উচ্চ স্তরের ছবর। সহজে তাহা আয়ত্ত করার জন্য যেক্‌রের আদেশ করা হইতে বুঝা যায় যে, ছবরের মধ্যেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। ইহাও মোকামাতের অন্তর্গত।

১৭। আরও বলিয়াছেন :

يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق

السموت والارض — الاية

"তাহারা আল্লাহ্‌র যেক্‌র করে দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং পার্শ্বের উপর শয়ন করিয়া। আর চিন্তা করে যমিন ও আসমানসমূহের সৃষ্টির মধ্যে।" এই আয়াত হইতে বুঝা যায়, ফেক্‌রের মধ্যেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। ইহাও মোকামাতের অন্তর্গত।

১৮। আরও বলিয়াছেন :

اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

"মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইতিপূর্বে তাহারা কিছুই ছিল না।" এই আয়াতটিকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বিশ্বাস্য বিষয়াবলীর মধ্যেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

১৯। আরও বলিয়াছেন :

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ

(اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ❋

"আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে পানি নাযিল করিয়াছেন এবং উহাকে যমিনের মধ্যে নহররূপে জারী করিয়া দিয়াছেন ·····নিশ্চয়, ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য উপদেশ রহিয়াছে।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ না হওয়ার ব্যাপারেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

২০। আরও বলিয়াছেন :

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ

"নিশ্চয়, ইহার মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে—সেই ব্যক্তির জন্য যাহার হৃদয় আছে, অথবা উপস্থিত মনে কর্ণপাত করিয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়, প্রাচীন যুগের উম্মতগণের ধ্বংস-কাহিনী হইতে উপদেশ গ্রহণেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

২১। আরও বলিয়াছেন :

يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

"তাহারা লোক দেখান এবাদত করে এবং আল্লাহ্‌র যেক্‌র খুব অল্পই করিয়া থাকে।" ইহাতে বুঝা যায়, অধিক পরিমাণে যেক্‌র করাই রিয়ার ঔষধ।

২২। আরও বলিয়াছেন :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ

"তোমরা সে-সমস্ত লোকের ন্যায় হইও না যাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদেরকেও ভুলাইয়া দিয়াছেন।" ইহা হইতে বুঝা যায়, নফ্‌সের হক্ আদায়ের ব্যাপারেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। যেক্‌র না করিলে নফ্‌সকে ভুলা হয়। আর যেক্‌র করিলে সকলের হক্ স্মরণ থাকে।

২৩। আরও বলিয়াছেন :

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا

"যে ব্যক্তি রাহ্‌মানের যেক্‌র হইতে গাফেল থাকে, তাহার উপর আমি শয়তানকে চাপাইয়া দেই।" ইহাতে বুঝা যায়, শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচিবার জন্য যেক্‌রের দখল রহিয়াছে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

অদ্যকার ওয়াযের মধ্যে এই বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সওয়াব ও আযাবকে স্মরণ করাও আল্লাহ্ তা'আলারই স্মরণ বটে। এই কারণেই কোরআনের আয়াতসমূহে কোথাও স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত, কোথাও দুনয়াবী কিংবা পারলৌকিক সওয়াব এবং আযাবের সহিত যেক্‌রের সম্পর্ক উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন আরও সওয়াব ও আযাবের সহিত যেক্‌রের সম্পর্কের কয়েকটি স্থান উল্লেখ করিয়া ইহাকে ওয়াযের পরিশিষ্ট করিতেছি।

১। فاذكروا آلاء الله "আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহের স্মরণ কর।"

২। واذكروا إذ جعلكم خلفاء "স্মরণ কর—যখন আমি তোমাদিগকে খলীফা বানাইয়াছি।"

৩। وذكرهم بأيام الله — الآية। এখানে যাবতীয় নেয়ামত এবং আযাব উভয়ের কথাই ব্যাপক ভাবে তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে বলা হইয়াছে।

৪। واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون -

এই আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করান হইয়াছে।

৫। فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا "অদ্য আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইব যেমন তাহারা তাহাদের অদ্যকার এই সাক্ষাৎকে ভুলিয়া রহিয়াছিল।" এই আয়াতে সওয়াব ও আযাবের দিন অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬। لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب এই আয়াতে হিসাব-নিকাশের দিনের কথা স্মরণ না রাখার দরুন কঠিন শাস্তির ধমক দেওয়া হইয়াছে।

সম্পূরক ও পরিশিষ্ট মিলাইয়া মোট ৩৫টি আয়াত হইল, নমুনার জন্য এই প্রমাণগুলিই যথেষ্ট। যদি কেহ ইহার সহিত আরও অন্ততঃপক্ষে ৫টি আয়াত সংযোগ করিয়া দেন, তবে "চেহেল্‌ হাদীসের" ন্যায় এবিষয়ে একটি "চেহেল্‌ আয়াত" হইয়া যাইবে। [কিতাবের যে সংস্করণের অনুবাদ করা হইয়াছে উহাতে আয়াত ৩০টীই আছে। বাকী ৫টী আয়াতের সন্ধান পাওয়া গেল না।]

॥ সঙ্কলনকারী ও খতীব কর্তৃক কতিপয় ব্যাখ্যা ॥

১। ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة اعمى

"যে ব্যক্তি আমার যেক্‌র হইতে মুখ ফিরাইবে তাহার জীবিকা সঙ্কীর্ণ হইবে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে অন্ধরূপে হাশর করিব।" ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র যেক্‌র হইতে মুখ ফিরান জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ।

২। رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة ط وايتاء الزكوة ط يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ط والله يرزق من يشاء بغير حساب ط

"কতক লোক এমনও আছে—ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র যেক্‌র করা, নামায আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা হইতে বিরত রাখিতে পারে না। তাহারা সেই দিবসকে ভয় করে, যেদিন অন্তরসমূহ ও চক্ষুসমূহ চঞ্চল ও অস্থির থাকিবে যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের উত্তম আমলের পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে নিজ দানের মাত্রা বাড়াইয়া দেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা, বেহিসাব রুযী দান করিয়া থাকেন।" এই আয়াতে নামায আদায়ে ও যাকাত প্রদানে গাফলত না করার উপর যেক্‌র হইতে গাফ্‌লত না করাকে অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, যেক্‌রের ব্যাপারে গাফ্‌লত না করাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। অতঃপর আযাব ও সওয়াবের উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, আযাবের ভয় এবং সওয়াবের আশাও আল্লাহ্‌র যেক্‌রের অন্তর্গত।

৩। فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون -

"জুমআর নামায সমাপ্ত হইলে তোমরা যমিনে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্‌র দান অন্বেষণ কর এবং প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র যেক্‌র করিতে থাক। নিশ্চয়ই তোমরা সফলকাম হইবে।" ابتغوا। শব্দের তাফসীর রেযেক অন্বেষণ কর। তৎসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র করিতে নির্দেশ দেওয়ায় একথার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, জীবিকা নির্বাহে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায়ও যেক্‌র হইতে অমনোযোগী থাকা উচিত নহে। এতদ্ভিন্ন এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, যেকরের ফলে রেযেকের মধ্যে বরকত হইয়া থাকে। لعلكم تفلحون শব্দে 'ফালাহ্'-এর ব্যাখ্যা ইহাই হইতে পারে।

৪। فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِكُمْ

"নামায শেষ করিয়া তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র কর দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং পার্শ্বের উপর শয়ন করিয়া। এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নামায শেষ করিয়াই নিজেকে যেক্‌র হইতে অবসর প্রাপ্ত মনে করা যাইবে না; বরং সদাসর্বদা যেক্‌রের মধ্যে মশ্‌গুল থাকিতে হইবে।

৫। إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ — الاية

"নিশ্চয়, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি কার্যের এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে সে সমস্ত জ্ঞানবান লোকের জন্য নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার যেক্‌র করে"........,ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রমাণ গ্রহণ শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও যেক্‌রের দখল রহিয়াছে। তাহা এইরূপে যে, যেক্‌রের ফলে বুদ্ধির মধ্যে জ্যোতির আবির্ভাব হয়। সেই জ্যোতির বদৌলতে প্রমাণ গ্রহণে ভুল করা হইতে বুদ্ধি সুরক্ষিত থাকে। পূর্বোক্ত ৩৫টি আয়াতের পরে এই পরিশিষ্টের মধ্যে এই আয়াতগুলি যোগ করার ফলে "চেহেল আয়াত" অর্থাৎ ৪০টি আয়াত পূর্ণ হইয়া গেল।

॥ সংকলনকারীর নিজস্ব সংযোগ ॥

আল্লাহ্ জানেন, ওয়াযের মধ্যে ما تصنعون বাক্যটির ব্যাখ্যা কেন করা হয় নাই। এমন কি পূর্ববর্তী বাক্যের সহিত উহার যোগ-সূত্রও বর্ণনা করা হয় নাই। সুতরাং সংক্ষেপে আমি তাহা বর্ণনা করিতেছি। এই বাক্যটির মধ্যে যেক্‌রুল্লাহ্‌র প্রণালী বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ এই বিষয়টিকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিতে হইবে যে, "আমার যাবতীয় কার্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন।" এই ধ্যান সর্বদা অন্তরে জাগ্রত থাকিলে আল্লাহ্‌র যেক্‌র অতি সহজেই হাছিল হইয়া যাইবে এবং ইহাতেই যাবতীয় আমলের পূর্ণতা সাধিত হইবে। কেননা, আমাদের

সমস্ত কার্যের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ যে, আমরা না বুঝিয়া না ভাবিয়াই সমস্ত কার্য করিয়া থাকি। আমরা যদি একথা চিন্তা করিয়া কাজ করি যে, আমরা কিরূপ কাজ করিতেছি তাহার সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলা জানিতে পাইতেছেন, তবে কাজ আমাদের দ্বারা অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইবে। আর এই ধ্যান দৃঢ় হইয়া গেলে গুনাহের কাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকা সহজ হইয়া যাইবে। এখান হইতে ইহাও বুঝা গেল যে, শুধু মুখের যেক্‌র প্রকৃত যেক্‌র নহে; বরং ইহা অন্য বস্তু যাহা আল্লাহ্ তা'আলার এল্‌মের মোরাকাবা দ্বারা হাছিল হইয়া থাকে। মোরাকাবা এইরূপেও হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আ'মল সম্বন্ধে অবগত আছেন। কাজে ত্রুটি করিলে তিনি শাস্তি প্রদান করিবেন, কিংবা এইরূপেও হইতে পারে যে, মাহ্‌বুব আমার এবাদত সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল আছেন এবং তিনি এই অবস্থায় আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

———

আখেরুল আ'মাল

হিজরী ১৩৩৬ সনের ২০ শে রবিউল আউয়াল, মোতাবেক ১৯১৮ ইংরেজী ৪ঠা জানুয়ারী রোজ শুক্রবার, কানপুর জামে মসজিদে, প্রায় দুই হাজার শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, শেষ আ'মল সম্বন্ধে হযরত থানভী (রহঃ) এই ওয়ায করিয়াছিলেন। দই ঘণ্টা তেইশ মিনিটে ওয়াযটি সমাপ্ত হয়। মোহাম্মদ মোস্তফা বিজ্‌নৌরী ছাহেব উহা লিপিবদ্ধ করেন।

o

আ'মলের নামই দ্বীন। রিয়াযত, মুজাহাদা বা সাধনার নাম দ্বীন নহে। অবশ্য সাধনা আ'মলের জন্য প্রাথমিক কর্তব্য। সাধনা ও পরিশ্রমের শেষ আছে, আ'মলের শেষ নাই। সুতরাং ধর্ম-কর্মের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা কোন সময়েই বন্ধ হওয়া উচিত নহে।

●

خطبة ماثورة

بسم الله الرحمن الرحيم *

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم -

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم -

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله - والله رءوف بالعباد -

॥ উপক্রমণিকা ॥

পরশু দিন বুধবারের রাত্রিকালের ওয়াযে আমি যে আয়াতগুলি পাঠ করিয়াছিলাম এই আয়াতটি উহাদের মধ্য হইতে একটি। উক্ত আয়াতগুলির ভাবার্থের সাহায্যে একটি বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছিল এবং উহাদিগ হইতে অন্য একটি বিষয় আবিষ্কার করা হইয়াছিল যে, আ'মলের মধ্যে কতক প্রাথমিক এবং কতক আন্তিক। উক্ত ওয়াযে প্রাথমিক স্তরের বিষয়টি নির্দিষ্ট করিয়াও বলা হইয়াছিল যে, উহা তওবা। আমি উহা কিতাবী ও যৌক্তিক প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছিলাম। আর ইহা বলিয়াছিলাম যে, ইহার চেয়ে অধিক বর্ণনা করার জন্য এই মজলিস যথেষ্ট নহে, কাজেই আমি অক্ষম। শুধু প্রাথমিক কার্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। এতদ্ভিন্ন আরও একটি মজলিসের আশা করা গিয়াছিল, এই কারণেও শুধু একটি অংশ বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলাম। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আজ সেই সুযোগ আসিয়াছে। আজ উক্ত আয়াতগুলির দ্বারা প্রমাণকৃত দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ আন্তিক আমলসমূহের বিবরণ পেশ করিতেছি। আর উক্ত ওয়াযে আমি একথাও বলিয়াছিলাম যে, আয়াতসমূহের দুইটি অংশের মধ্যে নির্দিষ্টরূপে একটিকে গ্রহণ করার মধ্যে একটি ভুলের সংশোধন করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্য। তাহা এই যে, কোন কার্যের প্রাথমিক স্তর জানিয়া না লইলে, উহা শুদ্ধ করিয়া সমাধা করা যাইতে পারে না। কেননা, প্রাথমিক অংশ ভিত্তি-এর ন্যায়। যে দালানের ভিত্তি দুর্বল হয়, সে দালানের কোন নির্ভর নাই। দালানের বাহ্যিক সৌন্দর্য, নক্‌শা নমুনা প্রভৃতি সব কিছুই বেকার। উহার স্থায়িত্বের কোনই আশা নাই। এইরূপে এই আন্তিক স্তরের বর্ণনার একটি উদ্দেশ্য আছে, কোন বস্তুর অন্ত বা পরিণাম জানা না থাকিলে, উহার উন্নতি নির্ণয়ের কোন পথ থাকে না। অদ্য সেই আন্তিক স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

॥ তওবার গুরুত্ব ॥

এই প্রাথমিক স্তরের আ'মলটি নির্দিষ্টরূপে বলিয়া দিবার জন্য পুর্বে তেলাওয়াত কৃত আয়াতগুলির পোষকতায় নিম্নোক্ত আয়াতটিও পাঠ করিয়াছিলাম। উহাতে মুমেনদের গুণাবলী উল্লেখ রহিয়াছে :

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ *

'তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, মসজিদে অবস্থানকারী, রুকূকারী, সেজ্‌দাকারী, ভাল কাজের আদেশকারী, মন্দকাজ নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহ্‌র

নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষাকারী, ইহাতে মুমেনের অনেকগুলি গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু তওবাকে সমস্ত গুণের উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টতঃ পোষকতা পাওয়া যায় যে, তওবা যাবতীয় আ'মলসমূহের মধ্যে প্রথম। এই কারণেই তওবাকে এবাদতের উপরও অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। অতঃপর সম্মুখের দিকের গুণগুলি এবাদতেরই ব্যাখ্যা, এইরূপে উক্ত আয়াতগুলির পোষকতায় এখন আরও একটি আয়াত মনে পড়িয়াছে। তাহাও এই বর্ণনার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতেছি :

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ
مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰۤئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰۤئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا -

"নবী যদি তোমাদিগকে তালাক দেন, তবে অচিরেই তাঁহার প্রভু তোমাদের পরিবর্তে তাঁহাকে দান করিবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবী মুসলমান, মুমেন, ফরমাঁ-বরদার, তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, বিবাহিতা এবং কুমারী।" এখানেও দেখা যায়, তওবা গুণটিকে এবাদতের উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে, উক্ত আয়াতগুলি এবং উহাদের পরিপোষক এই আয়াতসমূহ দ্বারা একথা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয় যে, তওবা সর্ব প্রকারের এবাদতের অগ্রবর্তী, সুতরাং তওবাই সর্বপ্রথম কর্তব্য।

॥ তওবার প্রয়োজনীয়তা ॥

ইহার অর্থ এই নহে যে, তওবা ছাড়া কোন এবাদত শুদ্ধ হইবে না। কখন কখন কেহ কেহ এরূপ ভুলে পতিত হইতে পারে যে, "গুনাহের কাজ তো আমি পুরাপুরি ছাড়িতে পারিতেছি না। আর গুণাহের কাজ হইতে তওবা করা ভিন্ন এবাদত শুদ্ধ হয় না। সুতরাং নামায পড়িয়া এবং রোযা রাখিয়া কি লাভ? অতএব, তাহাও ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। কেননা, আমি নামায-রোযা করিতে রহিলাম এবং তাহা শুদ্ধ হইল না, তবে বৃথাই কষ্ট করিলাম।" বরং তওবা সর্বপ্রথম কর্তব্য হওয়ার অর্থ এই যে, তওবা ভিন্ন এবাদত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। যেমন, আমি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম যে, তওবার সহিত এবাদতের সম্পর্ক যেমন ভিত্তির সহিত দালানের সম্পর্ক। ভিত্তি মজবুত করা ব্যতীত দালান নির্মাণ তো করা যাইতে পারে, কিন্তু উহার অবস্থা এইরূপ হইবে যে, একবারও সামান্য কিছু ব্যাপার ঘটিলে, একটু অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে, কিংবা একটু ভূমিকম্প আসিলে সমস্ত দালানটি এক মুহূর্তে বিনাশ হইয়া যাইবে। এই ব্যাপক ভুল ধারণা সংশোধনের জন্যই এসম্বন্ধে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ এবাদতে বেশ চেষ্টা করে এবং উহা দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্টও হয়; কিন্তু ভিত্তি দৃঢ় ও মজবুত করে না, এই কারণে কোন কোন সময় তাহাদের এবাদতের উপর এমন এক

বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় যে, উহার ফলে সমস্ত এবাদত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন আক্ষেপ হয় যে, হায়! কি করিলাম, সারা জীবন চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই কি হইল ?" অনিয়মে চেষ্টা করিলে এরূপ দশাই হইয়া থাকে, ইহা একটি মোটা কথা। দালানের ভিত্তি পূর্ণরূপে মজবুত না করিয়া যদি উহার উপরের গাঁথুনীর কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং উত্তম উত্তম মসলা লাগান হয়, তবে, উহা কখনও ভূমিকম্পের ঝাঁকুনী সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না এবং এই দালানের পরিণাম আফসুস ও আক্ষেপ জনক হওয়ার আশঙ্কা অবশ্যই থাকে।

মোটকথা, 'পূর্ণরূপে তওবা করিয়া নিষ্পাপ না হওয়া পর্যন্ত কোন এবাদতই করা উচিত নহে' এরূপ ধারণা করা নিতান্ত ভুল। ইহা নাফ্‌সের ধোকা মাত্র। এই বাহানায় সে এবাদত হইতেও নিবৃত্ত রাখিতে চায়। গুনাহ্‌র কাজে তো লিপ্ত ছিলই, এখন এবাদত হইতেও বঞ্চিত থাকুক। তওবার প্রয়োজনীয়তার অর্থ এই যে, অন্যান্য আ'মলের সহিত তওবাও করা উচিত। ইহা হইতে অমনোযোগিতা কেন হইবে ? যাহা হউক, তওবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এই আয়াতটি দ্বারা উহার পোষকতাও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আরও পোষকতার জন্য এখন এই শেষোক্ত আয়াতটিও মনে পড়িল। তবে (عسى ربه ان طلقكن الاية) আয়াতটির উপর একটি প্রশ্ন হইতে পারে।

॥ ঈমান ও আ'মলের সম্পর্ক ॥

তাহা এই যে, تائبات (তওবাকারিণী) শব্দটিকে عابدات (এবাদতকারিণী) শব্দের উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, তওবা এবাদতের চেয়ে অগ্রবর্তী, কিন্তু তওবা যাবতীয় আ'মলের অগ্রবর্তী হওয়া এই আয়াত হইতে বুঝা যায় না। কেননা, উহার পূর্বেও আরও কয়েকটি শব্দ রহিয়াছে مسلمات - مؤمنات - قانتات এই পর্যায়ক্রমিক উল্লেখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে যে, চতুর্থ পর্যায়ে তওবার স্থান। তওবা যাবতীয় আ'মলের অগ্রবর্তী তখনই বুঝা যাইত যখন التائبون الخ। আয়াতের ন্যায় এখানেও সমস্ত গুণাবলীর উপর التائبات শব্দটি অগ্রবর্তী করা হইত।

ইহার উত্তর খুবই স্পষ্ট, কেননা, উক্ত ওয়াযে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তওবা সর্বপ্রাথমিক আ'মল হওয়ার অর্থ ঈমান এবং ইস্‌লাম ভিন্ন আর সমস্ত আ'মলের উপর তওবা অগ্রবর্তী। ঈমান এবং ইস্‌লাম যে সর্ববিধ আ'মলের চেয়ে অগ্রবর্তী কর্তব্য তাহা অনস্বীকার্য কথা। কেননা, যাবতীয় নেক আমল শুদ্ধ ও গ্রহণীয় হওয়ার জন্য প্রথমে ঈমান ও ইস্‌লাম থাকা শর্ত। যাবতীয় আ'মল যত সুন্দর এবং যত ভালই হউক না কেন ঈমান ও ইসলাম ভিন্ন উহাদের অবস্থা ঠিক তদ্রূপই হইবে যেমন কোন একজন রাজবিদ্রোহী লোক প্রজা সাধারণের যথেষ্ট সেবা করিতেছে। সমাজ হিতকর

বড় বড় কাজ করিতেছে। জন সাধারণের হিতার্থে প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিতেছে। দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সঙ্কটকালে খুব সাহায্যও করিতেছে। কিন্তু সে রাজদ্রোহী বলিয়া তাহার এসমস্ত জনহিতকর কার্য সবই নিষ্ফল। বিদ্রোহ ত্যাগ পূর্বক গভর্ণমেণ্টের অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার এসমস্ত জনহিতকর কার্যের কোনটিই গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে অনুমোদনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এইরূপে ঈমান ও ইস্‌লামের অবস্থা উহাদের ছাড়া কোন আ'মলই শুদ্ধও হইতে পারে না, নূরানিয়াত (জ্যোতি) উৎপন্ন হওয়া তো দূরেরই কথা। এই আয়াতে تائبات শব্দের পূর্বে তিনটি শব্দ অগ্রবর্তী রহিয়াছে। مسلمات - مؤمنات এবং قانتات প্রথম দুইটি শব্দ অর্থাৎ, مسلمات ও مؤمنات কে অগ্রবর্তী করার কারণ তো আমার উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারাই পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন সন্দেহ রহিল শুধু قانتات শব্দের মধ্যে। ইহার উত্তর এই যে, একটি বিশেষ কারণে قنوت অর্থাৎ, আনুগত্যকে তওবার উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। কেননা, তওবা শব্দের অর্থ কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। আর আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা ভিন্ন অনুতাপ আসিতে পারে না। কেননা, যে পর্যন্ত নম্রতা, অবনত হওয়া এবং অক্ষমতার ভাব মনে উৎপন্ন না হইবে, তখন পর্যন্ত কোন পাপ কার্যের জন্য অনুতাপ আসিবে না। আর قنوت এর অর্থও ইহাই বটে। অতএব, তওবা অর্থাৎ অনুতাপ সর্বদা আনুগত্যের পরেই হইবে। কাজেই যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, তওবা হাছিল হওয়ার জন্য কুনূত্ শর্ত। এই কারণে قانتات শব্দকেও এই আয়াতে تائبات -এর উপর অগ্রবর্তী করা হইয়াছে। অতএব, তওবা সমস্ত নেক আ'মলের চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়ার সারমর্ম এই দাঁড়াইল যে, ইস্‌লাম ও ঈমান ছাড়া আর সমস্ত আ'মলের উপরই তওবা অগ্রবর্তী, তবে তওবার জন্য যেহেতু কুনূত্ অর্থাৎ আনুগত্য শর্ত ; সুতরাং কুনূত তওবার উপর অগ্রবর্তী।

॥ ধর্মীয় চিন্তার অভাব ॥

পূর্ববর্তী মজলিসের ওয়াযের সারমর্ম এই ছিল যে, যাবতীয় আ'মলের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য তওবা শর্ত এবং তাহাতে এই অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, মানুষ সমস্ত কার্যের জন্যই চেষ্টা ও গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে কিন্তু তওবার প্রতি গুরুত্ব দেয় না। নামায পড়ে, রোযা রাখে কিন্তু পাপ কার্যে লিপ্ত। হিংসা, পরনিন্দা, হারাম মাল, মিথ্যা, সংসারের মোহ, নাশোকরী, বে-ছবরী মোটকথা, যাহেরী-বাতেনী সর্বপ্রকারের পাপ কার্যই আছে। এবাদতের সহিত এসমস্ত গুনাহের কাজ যেমন নাজাত প্রদান-কারী আ'মলের সহিত ধ্বংসকারী কার্যের সমাবেশ, আর স্বর্ণ-রৌপ্য ও হীরা জহরতের সহিত দংশনকারী বড় বড় বিচ্ছু এবং অজগরের সমাবেশ। ইহারা কোন সময় দংশন করিলে স্বর্ণ ও হীরা জহরত যথাস্থানে পড়িয়া থাকিবে, কোন কাজে লাগিবে না। হীরা

জহরত ও স্বর্ণ-রৌপ্য তখনই কাজে আসিবে যদি উহাকে এসমস্ত দংশনকারী সাপ বিচ্ছু হইতে পৃথক করিয়া নিরঙ্কুশ করা যায়। অন্যথায় উহা কোন কাজেরই নহে। যাহার শরীরে শত শত সাপ-বিচ্ছু জড়াইয়া রহিয়াছে, ধন-দৌলত দ্বারা সে কি শান্তি লাভ করিতে পারে? তাহার চেয়ে সেই গরীব লোকই ভাল, যে গরীব অনাহারে আছে। কিন্তু তাহার দেহে কোন সাপ-বিচ্ছু জড়াইয়া নাই। কেননা, তাহার প্রাণ প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন এবং শঙ্কাগ্রস্ত নহে।

পরশু দিনের ওয়াযের সারমর্ম ছিল এই বিষয়ের অভিযোগ যে, আ'মলের সঙ্গে উহার প্রাথমিক ও ভিত্তিক স্তর কেন নাই? অদ্য আ'মলের শেষ পরিণামের বিষয় বর্ণনা করিব। এই বর্ণনারও একটি পরিণতি এবং উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তাহা হইল একথার অভিযোগ যে, দুনিয়ার কাজ আমরা এমন সুচারুরূপে করিয়া থাকি যে, শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছা ব্যতীত ক্ষান্ত হই না; বরং উহার পরবর্তী পর্যায়কেও পূর্ণ করিয়া থাকি।

যেমন, বাড়ী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে শুধু ভিত্তি স্থাপন করিয়া ছাড়িয়া দেই না; দেওয়ালের গাঁথুনি করি, ছাদ পিটাই, চুনের আস্তর লাগাইয়া উহাকে পরিপাটি করি। উপরে বালাখানাও নির্মাণ করি। প্রত্যেক মৌসুমের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের কামরাও প্রস্তুত করি। গ্রীষ্মকালের জন্য আঁধার মাণিক, বর্ষাকালের জন্য বালাখানা, আর শীত কালের জন্য চুল্লী প্রভৃতি সর্ববিধ উপকরণ পূর্ণ করিয়া থাকি। বৈদ্যুতিক আলো এবং পাখারও ব্যবস্থা করি। প্রয়োজন পর্যন্তও নির্মাণ কার্য সীমাবদ্ধ থাকে না। ছাদ পিটানের এবং বালাখানা প্রস্তুত করার পরেও আবার ছাদের উপর চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্দার দেওয়ালকে উঁচু করিয়া দেই যেন কোন সময় ইচ্ছা হইলে ছাদের উপর খোলা বাতাসে শয়ন করিতে পারি। ইহার মধ্যেও আবার একটি কল্পিত প্রয়োজন আবিষ্কার করিয়া লওয়া হয় যে, এই দেওয়ালটি এদিকে দৃষ্টি করার প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িয়াছে। কোন সময় প্রতিবেশীদের সহিত কথাবার্তা বলার প্রয়োজনও হইতে পারে। কিংবা অধিক বাতাসের প্রয়োজনও হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে উক্ত দেওয়ালে জানালারও ব্যবস্থা করি।

মোটকথা, বাড়ী প্রস্তুত করার সময় দূর হইতে দূরবর্তী প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখি এবং সেকারণে উহাকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণ করিয়া থাকি। যেখানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে, সেখানে বৈদ্যুতিক আলো এবং বৈদ্যুতিক পাখাও লাগাইয়া থাকি, পানির পাইপও বাড়ীতে আনয়ন করি। ইহাতেও বাড়ীর কাজ সম্পূর্ণ হইল না; বরং সদাসর্বদা ইহাতে কিছু না কিছু সংস্কার এবং সংযোগ করিতেই থাকি, এমনকি, সারা জীবন ব্যাপিয়া এই কাজেই লাগিয়া থাকি। কাজ কখনও শেষ করি না। সামান্য কিছু ত্রুটি হইয়াছে টের পাইলে তাহা দূর করিয়া বাড়ীকে

সর্বাঙ্গীন পূর্ণ করার জন্য সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুত হইয়া যাই, তথাপি বাড়ীর নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে দেখিতে পারি না, সর্বদা এই ধ্যানই মনে লাগা থাকে।

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম-কর্মের পূর্ণতা সাধনের জন্য এরূপ অধ্যবসায় নাই কেন? ব্যস্! আমার শুধু এই অভিযোগ। ইহা হইতেই আমি বলি, ধর্মের জন্য মোটেই পরোয়া নাই। দেখিয়া লউন, যেকাজের পরোয়া আছে উহার সহিত ব্যবহার কিরূপ? এই তো হইল মোটামুটি অভিযোগ।

॥ ধর্মীয় চিন্তার অবস্থা ॥

অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দুই প্রকারের বেপরোয়া ভাব রহিয়াছে। প্রথমতঃ ভিত্তি-পর্যায়ের প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করিতেছি না। যেমন, আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, তওবাই যাবতীয় ধর্ম-কর্মের ভিত্তি, অথচ সেই তওবার প্রতি আমাদের মনে কোন গুরুত্ব নাই; অতি অল্প লোকের মনেই তওবার প্রয়োজনীয়তা বোধ আছে।

দ্বিতীয়তঃ, কাজের প্রতি যদিও ভাল-মন্দ কিছু গুরুত্ব আছে, কিন্তু উহাতে উন্নতি লাভের চেষ্টা নাই। পরিমাণেও না প্রকারেও না, অবস্থায়ও নহে। যেমন, নামায পড়ে এবং রোযা রাখে। কিন্তু একবার তাহা যেমনটি আরম্ভ করিয়াছে বরাবর সেইরূপেই করিয়া যাইতেছে। যদি উহার জন্য আকর্ষণ ও অধ্যবসায় থাকিত, তবে শুধু ফরয এবং সুন্নত সমাধা করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, নফল নামাযও পড়িত, নফল রোযাও রাখিত, কোরআন শরীফও তেলাওয়াত করিত। তাজ্‌বীদও কিছু কিছু মশ্‌ক্ করিত। দালায়েলুল্ খায়রাতও পড়িত, মুনাজাতে মাক্‌বুলের মঞ্জিলও আরম্ভ করিয়া দিত, হেযবুল বাহারও পড়িত, তাস্‌বীহে ফাতেমীও হইত। কোন না কোন ওযীফা পড়িত, (ধর্মের উন্নতির জন্য ওযীফা পড়াই এখানে উদ্দেশ্য। দুনিয়া হাছিল করার জন্য নহে। আজকাল অধিকাংশ লোক দুনিয়া হাছিলের জন্যই ওযীফা পাঠ করিয়া থাকে।) দোআও করিত। মোটকথা, যাহাকিছু জানিতে পারিত যে, ইহাও ধর্মের কাজ, উহাই গ্রহণ করিতে থাকিত। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইত যেমন কোন কঠিন রোগী যে কোন চিকিৎসককে পায় তাহার নিকট হইতেই একটি ব্যবস্থা পত্র লিখাইয়া লয়। কোন ঔষধের অভিধান পাইলে এবং উহাতে কোন ব্যবস্থা পত্রের বিবরণ দেখিলে তাহাই লিখিয়া লয় এবং داشته آید بکار "রক্ষিত বস্তু সময়ে কাজে লাগে" মনে করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দেয়। এমনকি, কোন ঔষধ বিক্রেতার নিকট হইতে কোন ব্যবস্থা-পত্রের কথা শুনিলে তাহাও স্মরণ করিয়া রাখে। রোগ নিরাময়ের চিন্তায় তাহার (ধ্যান লাগিয়া থাকে এবং বলে, جوینده یابنده "অন্বেষণকারীই পায়"—বিচিত্র কি? এমনও হইতে পারে যে,

এইরূপে ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ করিতে করিতে এক দিন হয়ত কোন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা-পত্রই পাওয়া যাইবে এবং তখন রোগ দূরীভূত হওয়ার সময়ই হয়ত আসিয়া যাইবে। ইহাকেই বলে ধুন্ বা আকর্ষণ।

ধর্ম-কর্মে কোথাও ইহার নামচিহ্ন পর্যন্ত নাই। তবে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ধর্মের পরোয়া আছে? এই তো হইল পরিমাণে উন্নতি করার অবস্থা। আর অবস্থা বা রকমের উন্নতি এই যে, যেমন বাড়ী নির্মাণ করা হয়, এবং পরিমাণে ও সংখ্যায় উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, যতটি কামরা উহাতে হওয়ার প্রয়োজন ছিল তাহা সমস্তই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গোসলখানা, পায়খানা, বৈঠকখানা, কোঠরী, বাবুর্চিখানা সবকিছু। কিন্তু এসমস্ত নির্মাণ করিয়াও ক্ষান্ত হয় না, আবার এইগুলির মধ্যে চুন-বালুর আস্তর করা হয়। ব্রাশ দ্বারা সাদা মাটির পোঁচ্‌রা দেওয়া হয়। কিংবা কালাই করা হয় এবং ইহাকেও কোন সাধারণ স্তরে মনে করা হয় না; বরং এই অবস্থার সংশোধন ও উন্নতি সাধনের প্রতি খাছ্ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এমন কি, ইহার জন্য কোন কোন সময় মূল দালানের গাঁথুনীর কাজেও সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। যেমন, কোন কামরা নির্মিত হওয়ার পরে দেখা গেল যে, আলো কম হইতেছে, যদিও তাহা প্রয়োজন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট, তথাপি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া জানালা করিয়া দেওয়া হয় এবং বলে, ইহার যথেষ্ট অভাব ছিল, আলো তো ছিলই না। ইহাকে বলা হয়, অবস্থা বা রকমের উন্নতি। আমরা কাহাকেও দেখি নাই যে, এই জানালা খোলার ব্যাপারে সাহস বা উদ্যম হারাইয়াছে এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছে যে, প্রয়োজন নির্বাহের উপযোগী সমস্ত কাজ তো হইয়াই গিয়াছে। একটি জানালা না হইলে আর কী ক্ষতি হইবে? আর ধর্ম-কর্মের অবস্থা এই যে, নামায পড়া হইতেছে কিন্তু খোদা-ভীতি নাই। কাহারও মনে এরূপ কল্পনা হয় না যে, ইহার জন্যও চিন্তা করি, কিংবা রোযা রাখিয়া আসিতেছি কিন্তু রোযা অপবিত্র হইতেছে, পরনিন্দা এবং হারাম মাল হইতে নিবৃত্ত থাকা হয় না। এরূপ কল্পনা হয় না যে, রোযাকে পাক করিয়া লই। কিংবা এতটুকু খেয়ালও হয় না যে, নামাযে قل هو الله। সূরা পাঠ করি। উহাকে কোন একজন কারীর নিকট সংশোধন করিয়া লই। ইহা হইতেছে অবস্থার উন্নতি।

॥ ধ্যান-ধারণার আবশ্যকতা ॥

আল্লাহ্‌র বান্দা খুবই কম—যাহাদের ধর্ম-কর্মের জন্য ধ্যান আছে। ধ্যান শব্দে একটি কথা মনে পড়িল, আমার প্রাথমিক কিতাবসমূহের একজন ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহার মনে দুইটি বস্তুর ধ্যান ছিল। এক ধ্যান ছিল কিতাবের। আট দশ

দশ টাকা মাহিনায় চাক্‌রী করিতেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আলেম এবং কামালিয়াতবিশিষ্ট বুযুর্গ, কিন্তু অল্পতে সন্তুষ্ট থাকিতেন। আট দশ টাকায় তাঁহার জীবিকা নির্বাহ হওয়াই ছিল কষ্টকর। কিন্তু কিতাব সংগ্রহের এমন আগ্রহ ছিল যে যে কিতাবই যেখানে পাইতেন, নিজের খাদ্য-ব্যয় সংকুচিত করিয়া এবং অনাহারে থাকিয়া সেই কিতাব অবশ্যই সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার এন্তেকালের পর তাঁহার গৃহ হইতে তিন সহস্র টাকা মূল্যের কিতাব বাহির হইল। আর তাঁহার লেখারও আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। যদিও চোখে কম দেখিতেন, তথাপি চক্ষুর সহিত কাগজ মিলাইয়া লিখিতেন। এই অবস্থায়ও তিনি অনেক কিতাব লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহারই জনৈক আত্মীয় বলিয়াছেন, তাঁহা কর্তৃক এক রাত্রে লিখিত একটি গুলেস্তাঁ কিতাবের কপি তাঁহার কুতবখানায় পাওয়া গিয়াছে—(ইহা কারামত বটে)। দেখুন এক মাত্র ধোন বা মোহের বদৌলতেই একজন আট দশ টাকার চাক্‌রীজীবি তিন সহস্র টাকা মূল্যের কিতাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একটি মোহ ছিল—এল্‌ম হাছিল করার। যেখানেই কোন পূর্ণ জ্ঞানী ব্যক্তির সংবাদ শুনিতে পাইতেন সেখানেই যাইয়া পৌছিতেন। তিনি মাওলানা আহ্‌মদ আলী সাহারানপুরীর নিকট হাদীসের সার্টিফিকেট লইতে গেলেন, অথচ হাদীসের সার্টিফিকেট তাঁহার নিজেরও হাছিল ছিল। কেননা, তিনিও একজন আলেম ছিলেন। কিন্তু বরকত লাভের জন্য শ্রেষ্ঠতর আলেম হইতে উচ্চ পর্যায়ের সার্টিফিকেট লাভ করার আগ্রহ হইল। এখন সার্টিফিকেট কেমন করিয়া লাভ করিবেন? মাদ্রাসায় চাক্‌রী করিতেন, চাক্‌রী ত্যাগ করিলে সার্টিফিকেট লাভ করিতে পারেন, কিন্তু আগ্রহ ছিল আশ্চর্য ধরনের। আগ্রহই তাঁহাকে কাজের প্রণালী শিখাইয়া দিল। থানাভোয়ান হইতে সাহারানপুর চব্বিশ ক্রোশের পথ। তিনি এই উপায় করিলেন যে, মাদ্রাসার মাহিনা হয় ২৪ দিনের। কেননা, মাসের দিনের নিশ্চিত সংখ্যা উনত্রিশ। তাহা হইতে অন্ততঃ পক্ষে চারিটি শুক্রবার বন্ধের দিন বাহির হইয়া গেল। আর এক দিন গেল পরীক্ষা গ্রহণের। উনত্রিশ দিন হইতে পাঁচ দিন বাহির হইয়া গেলে, ২৪ দিন রহিল। অতএব, মাওলানা এই উপায় বাহির করিলেন যে, শুক্রবারের ছুটি ভোগ করিতেন না এবং একাধারে ২৪ দিন পড়াইয়া মাসের কর্তব্য সমাধা করিতেন এবং সে সমস্ত সাপ্তাহিক ছুটি একত্রিত করিয়া মাসের শেষভাগে ভোগ করিতেন। এই ছয় দিনের মধ্যে আসা-যাওয়ায় ২ দিন, বাদ বাকী ৪ দিন সাহারানপুরে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। এইরূপে কয়েক মাস পর্যন্ত পড়িয়া অবশেষে সার্টিফিকেট লাভ করিলেন। ইহাকেই বলে ধোন বা মোহ। যাহার মনে ধোন হয় সে কাজ সম্পন্ন করিয়াই ফেলে।

এই ঘটনা হইতে মাওলানার নিজত্ববোধ শূন্যতা এবং নম্রতা কি পরিমাণ বুঝা গেল। একজন যোগ্য আলেম হওয়া সত্ত্বেও আবার তালেবে এল্‌ম হইলেন।

আজকাল আমরা একটু তরজমা করিতে পারিলেই আর তালেবে এল্‌ম হওয়া পছন্দ করি না। কাহারও সম্মুখে কিতাব ধরিয়া পড়া বলিয়া লওয়া তো দূরের কথা, কোন মাস্‌আলা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। ইহা তো আমার সম্মুখের ঘটনা।

আমি মাওলানার সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্ববর্তী কালেরও একটি ঘটনা আছে। তাহা এই যে, 'ঝান্‌ঝানা' নামক স্থানে হাফেয আবদুর রায্‌যাক নামে এক বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি মস্‌নবী কিতাবেরও হাফেয ছিলেন। তিনি মাওলানা এলাহি বখশ্‌ ছাহেব হইতে ফয়েয প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি ছিলেন 'খাতেমে মস্‌নবী' বা মস্‌নবীর সম্পূরক অর্থাৎ মসনবীর অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। তিনি মাওলানা রুমীর রূহ হইতে ফয়েয লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মাওলানা এলাহি বখশ্‌ ছাহেবের নিকট যাইয়া হাফেয আবদুররায্‌যাক ছাহেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হাফেয ছাহেব মস্‌নবীর এত আশেক ছিলেন যে, যাহাকে পাইতেন তাহাকেই মস্‌নবী পড়াইতে প্রস্তুত হইয়া যাইতেন এবং নিজে মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন: "মস্‌নবী পড়িয়া লও।" এমন কি 'কারীমা' কিতাব পড়ুয়া ছেলেদিগকেও বলিতেন: "মিঞা! মস্‌নবী পড়িয়া লও। কারীমা যেমন সহজে পড়িতেছ, মস্‌নবীও তেমনি সহজেই পড়িবে। মস্‌নবী কিতাব এমন কি কঠিন? মোটকথা, তিনি মসনবী কিতাবের বিখ্যাত ওস্তাদ ছিলেন। আমাদের পীর হযরত হাজী ছাহেব এবং তাঁহার বিবি ছাহেবা উভয়ে এই হাফেয ছাহেবের নিকটই মসনবী শরীফ পড়িয়াছিলেন। আমার ওস্তাদ উক্ত মাওলানা ছাহেবও উক্ত হাফেয ছাহেবের খেদমতে মসনবী পড়িবার জন্য ঝান্‌ঝানায় যাইতেন এবং সমগ্র মসনবী শরীফ তাঁহারই নিকট পড়েন। প্রতি বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে মাদ্রাসা ছুটি দিয়া যাত্রা করিতেন এবং ঝান্‌ঝানার কোন কবরস্থানে কিংবা মসজিদে রাত্রি যাপন করিতেন। (আহা! আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের কেমন বিচিত্র জীবন! এত বড় একজন কামেল লোক হইয়াও নিজের কামালিয়াত কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, শুধু নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন।) এইরূপে রাত্রি যাপন করিয়া শুক্রবার দিন প্রাতঃকাল হইতে আছরের সময় পর্যন্ত একাধারে মসনবী পড়িতেন। মাঝখানে কেবল জুমআর নামাযের জন্য উঠিতেন। এতদ্ভিন্ন সর্বক্ষণ ওস্তাদ শাগে্‌রদ উভয়ে সবক পড়ার মধ্যেই মশ্‌গুল থাকিতেন এবং আছরের নামায পড়িয়া ফিরিতেন। অতঃপর থানাভোয়ান পৌঁছিয়া এশার নামায পড়িতেন। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এইরূপে পড়িয়া অবশেষে মস্‌নবী শরীফ খতম করেন। শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে হযরত হাফেয ছাহেব বলিলেন: এখনও মসনবী কিতাবের অনেকটা বাকী রহিয়াছে। মাদ্রাসা হইতে কিছু দিনের ছুটি লইয়া ইহা শেষ করিয়া ফেল। ফলতঃ তিনি মাস-দেড় মাসের ছুটি লইয়া হাফেয ছাহেবের নিকট থাকিয়া মসনবী শরীফ খতম করিলেন।

মসনবী শরীফ খতম হওয়া মাত্র হাফেয ছাহেবের এন্তেকাল হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি করার মধ্যে হাফেয ছাহেবের এই হেকমত ছিল যে, তিনি নিজের মৃত্যু নিকটবর্তী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের নিজ শাগেরদের প্রতি কি স্নেহ! কাজ পূর্ণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

॥ মৃত্যুকালীন কষ্টের রহস্য ॥

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ নিজেদের মুরীদানের সহিত অসীম মহব্বৎ রাখেন। এখান হইতেই একথার রহস্য বুঝা যায় যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের সময় অধিক কষ্ট কেন হইয়াছিল? কেহ কেহ মৃত্যুকালীন কষ্টকে নাপছন্দ করেন এবং উহাকে মন্দ লক্ষণ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার কোন ভিত্তি নাই। এই কারণেই তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন যে, মৃত্যু কালীন কষ্টের ভিত্তি দৃঢ় মহব্বত ও সম্পর্কের উপর স্থাপিত। দৈহিক সম্পর্কই হউক কিংবা রূহানী সম্পর্কই হউক। দৈহিক সম্পর্কের অর্থ—যাহার মধ্যে মৌলিক আর্দ্রতা অধিক পরিমাণ রহিয়াছে—যেমন শিশুদের মধ্যে এবং পাহ্‌লোয়ানদের মধ্যে দেখিয়া থাকিবেন—শিশুদের মৃত্যু কালে এই কারণেই কষ্ট অধিক হইয়া থাকে, অথচ তাহারা এখন পর্যন্ত কোন গুনাহ্‌র কাজই করে নাই। যক্ষ্মা রোগে যাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে মৃত্যুকালে তাহার কষ্ট আদৌ হয় না! তাহার শরীরে রস বলিতে কিছুই থাকে না। সংসার বিরাগী লোকদের মৃত্যুকালীন কষ্ট কম হইয়া থাকে, চাই কি তাহারা নেককারই হউক কিংবা বদকার। কেননা, তাহাদের রূহানী সম্পর্ক বলিতে কিছুই নাই, আর আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম যেহেতু উম্মতবৃন্দের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে রূহানী সম্পর্ক রাখেন, (ইহা স্নেহের সম্পর্ক; স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির সম্পর্ক নহে) এই কারণে মৃত্যুকালে তাঁহাদের অধিক কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

॥ জনসেবার গুরুত্ব ॥

এই উদ্দেশ্যে আম্বিয়ায়ে কেরাম মানুষের হিত সাধনের জন্য বাঁচিয়া থাকা পছন্দ করিয়াছেন। এইরূপে কোন কোন ওলীআল্লাহ্‌ও নিজের মুরীদানের সহিত রূহানী স্নেহের সম্পর্ক রাখিতে থাকেন। মুরীদানের ক্ষতি চিন্তা করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহাদেরও কষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য কোন কোন ওলীআল্লাহ্ এই সম্পর্ক হইতে মুক্তও থাকেন, যেমন মাওলানা আহ্‌মদ জাম বলেন:

احمد تو عاشقی بمشیخت ترا چه کار + دیوانه باش سلسله شد شد نه شد شد

'আহ্‌মদ! তুমি আশেক, পীরী-মুরীদীর সহিত তোমার কি কাজ? পাগল হও, পীরী-মুরীদী সম্পর্ক চালু হউক বা না হউক।'

আবার কেহ কেহ যাহাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, মানুষের সেবায় খুব মস্ত থাকেন, তাঁহারা এইরূপ বলেন :

طریقت بجز خدمت خلق نیست + به تسبیح و سجاده و دلق نیست

"মানুষের খেদমত ব্যতীত তরীকত কিছুই নহে। তাস্‌বীহ, মুছল্লা এবং তালি দেওয়া দরবেশী পোশাকের নাম তরীকত নহে।" এতদুভয় প্রকারের ওলীর মধ্যে তাঁহারাই অধিক কামেল যাঁহাদের অবস্থা আম্বিয়ায়ে কেরামের সদৃশ। কেননা, আম্বিয়ায়ে কেরামও কামেলই ছিলেন। দেখুন, আহ্‌মদ জাম তো বলিয়া দিয়াছেন, به مشیخت ترا چه کار "মুরীদ মু'তাকেদে তোমার কি কাজ?" কিন্তু হুযুর (দঃ) তো এরূপ বলিতে পারেন না। কেননা, মানুষের হিত সাধনে তাঁহার তো এত মহব্বৎ ছিল যে, সে সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন : لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين অর্থাৎ, "আপনি সম্ভবতঃ এই দুঃখেই প্রাণ দিয়া দিবেন যে, তাহারা ঈমান আনিতেছে না।" ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হুযুর (দঃ) মানুষের হিত সাধনের জন্য এত অনুরক্ত ছিলেন যে, নিজ জানেরও পরোয়া করিতেন না। মোটকথা, হুযুর একথা বলেন নাই যে, ইহারা চুলোয়ে যাউক। ঈমান আনুক বা না আনুক তাতেআমার কিআসে যায়? এইরূপে কামেল লোকেরা নিজেদের মুরীদানকে অত্যধিক ভালবাসেন। তাহাদের হিত সাধনের কোন পন্থাই বাকী রাখেন না। অতএব হাফেয ছাহেব আমার ওস্তাদ মাওলানা ছাহেবকে ছুটি লইয়া মসনবী শরীফ খতম করার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহাও এই মহব্বতের কারণেই ছিল। ফলতঃ, তিনি মসনবী কিতাব শেষ করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।

॥ আগ্রহের ফল ॥

এই কাহিনীটি এই জন্য বর্ণনা করিলাম যেন আপনারা অনুমান করিতে পারেন আগ্রহ কাহাকে বলে। এইরূপে কিতাব সংগ্রহ করাও মাওলানার অতিশয় আগ্রহ ছিল। এমন নহে যে, বিশেষভাবে সে-সমস্ত কিতাবে তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল। যেমন, তিনি একবার খুব মূল্যবান কিতাব আনাইলেন এবং আনন্দের সহিত আমাকে বলিলেন : "নাও, তুমি ইহা পাঠ করিও।" সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত কিতাবটি তিনি আমাকে দিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, আপনি নিজে যখন খুলিয়াও দেখেন নাই, তবে কিতাব খরিদ করার এত শওক্ কেন? তিনি বলিলেন, কি বলিব, ইহা আমার একটি শওক্। যেমন, কোন কোন লোকের ঘুড়ি উড়াইবার অভ্যাস থাকে। কাহারও বা মোরগের লড়াই খেলার বদভ্যাস থাকে। তদ্রূপ আমারও কিতাব সংগ্রহের শওক্ বা ঝোঁক। কেহ বলিল : "অনেক কিতাব সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। এত কিতাব হেফাযৎ করাও কঠিন। ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া যাওয়া ছাড়া আর এগুলি দ্বারা কি কাজ হইবে?"

তিনি বলিলেন: কিতাব এমন বস্তু যে, যেখানে যাইবে সেখানেই কাজ করিবে। মোটকথা, ঝোঁক বা শওক্ ইহাকেই বলে। অতএব বলুন, কোন আল্লাহ্র বান্দার মনে ধর্মের পূর্ণতা সাধনের জন্যও ঝোঁক বা শওক্ আছে কি?

এইরূপে উক্ত মাওলানা ছাহেব কেরাআত শিখিবার জন্য খুব আগ্রহান্বিত হইয়া পানিপথ যাইয়া পৌঁছিলেন এবং মাসের পর মাস ধরিয়া তথায় পড়িয়া রহিলেন। অথচ জীবিকা নির্বাহের কোন উপকরণ সঙ্গে ছিল না। বিচিত্র ব্যাপার! মাওলানার এমন বিরাট ব্যক্তিত্ব। কিন্তু বাহ্যিক জাঁকজমক ও আড়ম্বর কিছুই নাই। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিল না। কাজেই খাওয়া লওয়ায় তাঁহার বেশ কষ্ট হইতে লাগিল। খোদার মহিমা, মহল্লায় একজন লোক মারা গেল। সেখানে নিয়ম ছিল—কেহ মারা গেলে ৪০ দিন যাবৎ কোন একজন গরীব লোককে খাওয়ান হইত। সেই খানা মাওলানার জন্য আসিতে লাগিল। এক 'চিল্লা' পর্যন্ত তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই চিল্লা শেষ না হইতেই আর একজন লোক মারা গেল। আবার ৪০ দিনের আহারের ব্যবস্থা হইয়া গেল। দ্বিতীয় চিল্লা শেষ না হইতে আবার একজন মৃত্যু মুখে পতিত হইল। মোটকথা, তাঁহার রুটির ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কারী ছাহেব মহল্লার লোকদিগকে বলিলেন: এই লোকটির খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দাও। অন্যথায় তিনি গোটা মহল্লাই খাইয়া ফেলিবেন। লোকে তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও বন্ধ হইয়া গেল। অভাবী লোককে দান করিতে কখনও ক্রুটি করিবে না। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি খারাব ধারণা পোষণ করিবে না। তিনি যাহা গ্রহণ করিবেন—উহার পরিমাণ পূর্ণ করিয়া লন। কেহ স্বেচ্ছায় দান না করিলে এইরূপে তিনি উশুল করিয়া লন। তবে স্বেচ্ছায় কেন দান করিবে না?

মাওলানার আরও একটি ঘটনা আছে। তাহাও তাঁহার কিতাব সংগ্রহের শওক্ সম্বন্ধে। ডিপুটি নাস্রুল্লাহ্ খাঁন নামে এক ব্যক্তি রঞ্জন শিল্প সম্বন্ধে একখানা কিতাব লিখিয়াছিলেন। উহার নাম দিয়াছিলেন: "নোমুউওস্সাব্বাগীন।" কিতাবটি মাওলানার দৃষ্টিগোচর হইতেই তিনি উহা নকল করিয়া লইলেন। উক্ত কিতাবটি মাওলানার কুতুব খানায় সংরক্ষিত ছিল। বেহেশ্তী জেওরের ১০ম খণ্ডে রং করার প্রণালীসমূহ আমি উহা হইতেই লিখিয়াছি। ইহা দেখিয়া কোন অজ্ঞ লোক বলিবে, মাওলানা বড় লোভী লোক ছিলেন, কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার কাজকর্ম এবং জীবনযাপন প্রণালী হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই কাজটিও তাঁহার দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। কেননা, তাঁহার কার্যাবলীর মধ্যে ধর্মভাবের প্রাবল্য এইরূপ ছিল যে, মাওলানা কখনও পা ছড়াইয়া শয়ন করিতেন না; বরং জড়াইয়া সড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেন। তিনি যেক্র ফেক্রও প্রচুর পরিমাণে করিতেন। অবস্থা এইরূপ

ছি যে, আল্লাহ্, আল্লাহ্ করিতে থাকিতেন। কেহ একটুখানি সজাগ হইয়া উঠিতেই মাওলানা চুপি চুপি শুইয়া পড়িতেন। তিনি যেক্‌র করিতেছেন বলিয়া যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না পায়। আর কোন সময় ভাল খাদ্য প্রস্তুত হইলে তাহা ছাত্রদিগকে খাওয়াইয়া দিতেন এবং উদ্বৃত্ত সামান্য কিছু নিজে খাইতেন। এমন লোক সম্বন্ধে কেমন করিয়া ধারণা করা যায় যে, তিনি দুনিয়ার জন্য লোভী ছিলেন।

এই কাহিনীগুলি বলিলাম ধোন সম্বন্ধে। ধর্ম-কর্মের ধোন এরূপই হওয়া উচিত, তবেই উন্নতি লাভ হইবে। আর যাহারা উন্নতিকামী তাহাদের তো বিরতিই নাই। যেমন, ঘরবাড়ী নির্মাণের সৌখীন লোকদিগকে আপনারা দেখিতেছেন যে, সর্বদা তাহাদের ভাঙ্গা-গড়া লাগাই থাকে। কিন্তু ধর্ম-কর্মে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। যাহাদের মনে এরূপ ধোন চাপিয়া থাকে, ধর্মের প্রতি আগ্রহ না থাকার কারণেই তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখে না। ধর্মের এক একটি অংশকে এক একজন লইয়া বসিয়া আছে এবং এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট আছে যে, আমরা 'দ্বীনদার'। কাহারও নামাযের জন্য আগ্রহ আছে, কিন্তু রোযা নাই। কেহ রোযা রাখে কিন্তু হজ্জ করে না। কোন সময় কল্পনাও করে না যে, আমার উপর হজ্জ ফরয। কেহ হাজীও হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু পরের হকের কোন পরোয়া নাই। পরের হক্‌কে অনেকে এরূপ মনে করে যে, ইহার সহিত ধর্মের কি সম্পর্ক? ইহা তো মানুষের পারস্পরিক ব্যাপার।

॥ দ্বীনদার লোকের পরিচয় ॥

ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানে আমাদের অবস্থা ঠিক সেইরূপ, যেমন অন্ধদের শহরে একবার একটি হাতী আসিয়া পড়িল। তাহা দেখিবার জন্য বহু অন্ধ আসিয়া একত্রিত হইল। চক্ষু তো তাহাদের ছিলই না, সকলে হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কাহারও হাত হাতীর পেটের উপর পড়িল, কাহারও বা লেজের উপর, কাহারও বা কানের উপর, কাহারও বা পায়ের উপর, কাহারও কোমরের উপর। অতঃপর সকলে একত্রিত হইলে একে অন্যকে হাতী দেখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল—হাতী কেমন ছিল? যাহার হাত শুঁড়ের উপর পড়িয়াছিল সে বলিল, হাতী সাপের মত, যাহার হাত লেজের উপর পড়িয়াছিল সে বলিল, হাতী খুব মোটা রজ্জুর মত। কেহ বলিল, হাতী তখ্‌তের মত। অপর একজন বলিল, না হাতী স্তম্ভের ন্যায়। ফলকথা, এই লইয়া তাহাদের মধ্যে খুব ঝগড়া বাধিয়া গেল।

চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে ইহাদের ঝগড়া ছিল শাব্দিক। সকলেই মিথ্যা বলিতেছিল এবং সকলেই সত্য বলিতেছিল। সত্যবাদী এই জন্য ছিল যে, তাহারা হাতড়াইয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছিল তাহাই বলিয়াছে। ইহাতে আবার মিথ্যা কিসের? আর মিথ্যাবাদী এই জন্য যে, হাতীকে সেই একটুখানি আকৃতির মধ্যে

সীমাবদ্ধ বলিয়া কেন মানিয়া লইল, যাহা তাহারা হাতড়াইয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল? অর্থাৎ, হাতীর একটি অংশকে গোটা হাতী কেন মনে করিল? হাতী—একটি অংশের নাম নহে। যদি তাহারা সকলে এইরূপ বলিত যে, "আমরা প্রত্যেকে এক একটি অংশ হাতড়াইয়া দেখিয়াছি। সেই অংশগুলি একত্রিত করিলে হাতী হইবে।" তবে কোন ঝগড়াই ছিল না।

ধর্মেরও আমরা এই দশাই ঘটাইয়াছি। এক এক অংশ এক এক দলে গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে দ্বীনদার মনে করিতেছি। আবার এই অংশটির মধ্যে ধর্মকে এমন ভাবে সীমাবদ্ধ মনে করিতেছি যে, যেই অংশটিকে আমরা ধর্ম মনে করিতেছি, সেই অংশ যাহার মধ্যে না থাকে তাহাকে বে-দ্বীন মনে করিয়া থাকি এবং তাহাকে হেয় মনে করি।

আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়েক ব্যক্তি যদি জামা পরিতে চায়, তবে কি এমন হইবে যে, কেহ জামার ঝুল পরিল, কেহ আস্তিনের মধ্যে হাত ঢুকাইল, কেহ গলার অংশ গলায় ঢুকাইয়া লইল। এইরূপভাবে ভাগ করিয়া লওয়ার পর প্রত্যেকের পক্ষে এরূপ কল্পনা করা কি ঠিক হইবে যে, আমি জামা পরিধান করিয়াছি? তাহাদের কেহই তো জামা পরিধান করে নাই। জামা তো ঝুল, আস্তিন এবং গলা প্রভৃতি অংশের সমষ্টিকে বলা হয়। যে ব্যক্তি সকল অংশ সম্বলিত জামা পরিয়াছে কেবল তাহাকেই জামা পরিধানকারী বলা যাইবে। এইরূপে দ্বীনদারও সেই ব্যক্তিই হইবে যাহার মধ্যে ধর্মের সমস্ত অংশ পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। যে কোন একটি অংশ অবলম্বনকারীকে কখনও দ্বীনদার বলা যাইবে না।

॥ দ্বীনদারদের ত্রুটি ॥

অল্প বিস্তর গোটা দুনিয়া এই ভুলের মধ্যে রহিয়াছে। প্রথমতঃ ধর্মের এক একটি অংশকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে এবং সেই অংশও অপূর্ণ। যেমন, যাহারা রোযা-নামাযের পাবন্দ আছেন, কোন সময় ত্যাগ করেন না এবং নিজদিগকে দ্বীনদার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের এই আ'মলগুলিও অসম্পূর্ণ, কোন কোন অংশ নাই। যেমন নামাযে খোদাভীতি ও নম্রতা নাই। দেখুন, কয়জন দ্বীনদার এমন আছে যাহাদের নামাযে খোদাভীতি এবং নম্রতা রহিয়াছে? এদিকে এত বে-খবর যে, ওযূ এবং নামাযের যাহেরী আহ্‌কাম অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ইহা কখনও জিজ্ঞাসা করে না যে, খুযূ এবং খুশূ কি বস্তু? তাহা কিরূপে লাভ করা যায়? যেহেতু ঐ সমুদয় নামাযের অংশ কি না সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। কাজেই এই নিম্ন স্তরের অংশকেই বড় কামালিয়াত মনে করিয়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও প্রধান অংশকে উহার মোকাবিলায় হীন ও নগণ্য মনে করিয়া থাকে। ইহার কি ঔষধ

করা যাইতে পারে ? এসম্বন্ধে কাহারও চিন্তা নাই। জনৈক আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক এসম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন :

ریا حلال شمارند وجام باده حرام + زهے شریعت وملت زهے طریقت وکیش

শুষ্ক দরবেশদিগকে কবি বলিতেছেন যে, তাহাদের মতে শরাব তো হারাম এবং রিয়ার ন্যায় নিকৃষ্টতম গুনাহ্‌র কাজ, যাহাকে প্রচ্ছন্ন শিরক্ বলা হইয়াছে, ইহা হালাল। এই জঘণ্য পাপে সর্বক্ষণ মগ্ন রহিয়াছে। আদৌ কোন পরোয়া করে না। জানাব ! নিজের দরবেশী ও এবাদতের ধোকায় ভুলিবেন না। আমাদের অবস্থা তো এইরূপ যে, বাহিরে পরহেয্‌গারী এবাদত আছে। মৌলবী ও আলেম আছি, পীর আছি। সবকিছুই আছে, কিন্তু ভিতরের খবর খোদাই অবগত আছেন। বাহিরে যে পরিমাণ গুণ আছে তদপেক্ষা অধিক দোষ ভিতরে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অবস্থা সম্পূর্ণ এইরূপ :

ازبروں چوں گور کافر پر حلل + واندروں قہر خدائے عز وجل
ازبروں طعنه زنی بر بایزید + وز درونت ننگ می دارد یزید

"বাহিরে কাফেরের ন্যায় সুসজ্জিত এবং ভিতরে মহান খোদা তা'আলার গযবে পরিপূর্ণ। বাহিরের বেশভূষায় হয়ত বায়েযীদ বস্তামীকেও হার মানাইতেছে এবং ভিতরের নিকৃষ্ট স্বভাব ইয়াযীদকেও লজ্জিত করিয়া দিতেছে।" আসল কথা এই যে, ধর্মের মধ্যে কাটছাট করিতেছ। কোন আ'মল করিতেছ, কোন আ'মল ত্যাগ করিতেছ। আর যে আ'মল করিতেছ তাহারও এক অংশ আছে অপর অংশ নাই। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা যায় যে, অংশগুলির মধ্যে যে সকল অংশ আ'মলে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তাহা অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক এবং যাহা আসল এবং প্রধান অংশ তাহাই নাই।

মোটকথা, প্রত্যেক আ'মলেরই একটি বাহ্যিক রূপ আর একটি কল্‌ব এবং প্রাণ আছে। শুধু বাহিরের রূপকেই গ্রহণ করা হয় এবং প্রাণ বস্তু হইল, কি না হইল, উহার আদৌ পরোয়া নাই। আবার ধর্মীয় আ'মলের কতটুকুই গ্রহণ করিয়াছে—তাহাও বে-পরোয়াইর সহিত লওয়া হইয়াছে। উহার কাইফিয়তের উন্নতির জন্যও চেষ্টা নাই। সংখ্যা বা পরিমাণের উন্নতির জন্যও চেষ্টা নাই। বস্—যতটুকু সহজে আয়ত্ত হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। উহার অতিরিক্ত কিছু করাকে ঝামেলা ও জঞ্জাল মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছে। কিংবা বলিতে পারেন যেটুকুর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ধর্মের জন্য অভ্যাস পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে নাই। আমি বলি, ইহার কারণ কি ? কেহ কেহ শরাব পান করে কিন্তু জুয়া খেলে না। জুয়ার নাম শুনিলে কানে আঙ্গুল দেয় এবং জুয়ারিগণ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। কোন সময় জুয়ার নাম উঠিলে বলে,

মুসলমানদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ জঘন্য কাজ হইতে রক্ষা করুন। এমনও অনেক আছে যাহারা শরাবও পান করে না জুয়াও খেলে না এবং ধার্মিক বলিয়া বিবেচিত হয়। আর নিজেও নিজের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করে। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করার ক্ষমতাও কোন ব্যক্তির নাই কিন্তু কেহ কেহ গুপ্ত পাপে লিপ্ত রহিয়াছে। উহার খবর তাহার সাথী এবং সজাতিরাও জানে না। এই কারণে তাহারা তাহাকে ভাল দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

যেমন, কুদৃষ্টি একটি গুনাহের কাজ। তাহা এত সহজে করা যায় যে, হাটিতে হাটিতে আড় চোখে সম্পন্ন করা যায়। কেহ সন্দেহও করিতে পারে না। সে জানে কিংবা খোদা জানেন। ইহা যাবতীয় গুনাহের মধ্যে নিকৃষ্টতম। কিন্তু সে তাহা ত্যাগ করে না। তাহার পবিত্রতার পশ্চাতে এই চোর বিদ্যমান। যদি সে খোদার ভয়ে শরাব এবং জুয়া ত্যাগ করিয়াছে, তবে পরের স্ত্রীর প্রতি আড় চোখে দৃষ্টি করা কেন ত্যাগ করে না ? খোদার নিকট তো ইহাও গুনাহের কাজ। শরাবকে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন, তদ্রূপ এই আড় চোখের দৃষ্টিকেও তো তিনিই নিষেধ করিয়াছেন।

॥ সম্মান এবং পোশাক ও চাল-চলনের পরিপাটির খেয়াল ॥

আসল কারণ এই যে, যে সমস্ত গুনাহের অভ্যাস হয় নাই এবং যে সমস্ত পাপ কার্যে বংশজাত সম্মানে ও মর্যাদায় দাগ লাগে এই কারণে তাহা করে না। কিন্তু অপরের স্ত্রীর প্রতি চুপি চুপি তাকাইলে বংশের দুর্নাম হয় না। এই কাজটি বাপ-দাদাও করিয়া গিয়াছে, অপর কেহই জানিতে পারে নাই। সুতরাং ইহাতে বংশ-মর্যাদায় কোন ব্যতিক্রম হয় না। কাজেই ইহা হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য তেমন চেষ্টা নাই। অতএব, বুঝা গেল যে, আসল উদ্দেশ্য মর্যাদাবোধ। যে পাপ মর্যাদার খেলাফ তাহা ত্যাগ করা হয়। নামে মাত্র উহার সঙ্গে আল্লাহ্‌র ভয় যোগ করা হয়। আর যে গুনাহের কাজ মর্যাদার খেলাফ নহে ; সেখানে খোদা কিছুই নহে। কিংবা এমন অনেক শরীফ লোক আছেন যে, বাহিরের চাল-চলন তাহাদের খুবই পরিপাটিপূর্ণ। লম্পটতা ও ভ্রষ্টামীর কাছেও ঘেষে না। জীবনে কখনও যেনা করে নাই, কিন্তু দ্বিধাহীন ভাবে গীবত বা পরনিন্দায় লিপ্ত আছে অথচ ইহা যেনা হইতেও নিকৃষ্ট। উহা সম্বন্ধে স্পষ্টভাষায় হাদীসে উল্লেখ আছে যে, اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "পরনিন্দা যেনা হইতেও নিকৃষ্টতম।"

অতঃপর কারণ শুধু ইহাই যে, পরনিন্দায় মানুষ দুর্নামগ্রস্ত হয় না। সারা জীবন পরনিন্দা করিতে থাকুক কিন্তু বুযুর্গের বুযুর্গী থাকিবে। আর যেনা দ্বারা দুর্নাম হয়। এসমস্ত কাজে লিপ্ত হওয়া বংশগত চাল-চলনের খেলাফ। মোটকথা, লোকে বংশগত মর্যাদা এবং চাল-চলনেরই অধিক খেয়াল রাখে, তাহাই লোকের আসল

লক্ষ্যস্থল। বংশের মর্যাদা এবং চাল-চলন ঠিক থাকিলে আর কিছুই চাই না। (ইহার অর্থ এরূপ বুঝিও না যে, বংশগত চাল-চলন এবং মর্যাদা কোন বস্তুই নহে। বৃথাই বংশের মর্যাদা বিগ্‌ড়াইয়া দাও। বংশের চাল-চলন ঠিক রাখাও উদ্দেশ্যমূলক বিষয় বটে। মানুষ যদি শুধু বংশের মর্যাদা এবং চাল-চলনের খেয়ালেই যেনার মত জঘন্য পাপ কার্য হইতে বিরত থাকিতে পারে, তবে মন্দ কি ? বিরত তো রহিল! সারকথা এই যে, বংশ-মর্যাদাকে মূল লক্ষ্যস্থল করিও না। উহার সহিত শরীয়তের প্রতিও লক্ষ্য রাখিও। অর্থাৎ, বংশ-মর্যাদার খেয়াল যত গুরুত্বের সহিত রাখিতেছ শরীয়তের খেয়ালও তদ্রূপ গুরুত্বের সহিতই রাখিও। বংশ-মর্যাদার খেয়ালে যেমন কোন কোন গুনাহ্‌র কাজ হইতে বিরত থাকিতেছ, তদ্রূপ শরীয়ত এবং খোদার ভয়ের খেয়ালে যাবতীয় গুনাহের কাজ হইতে বিরত থাক।

মোটকথা, আমাদের ব্যবহারে বুঝা যায় যে, আমরা খোদার ভয়ে গুনাহের কাজ ত্যাগ করিতেছি না। যে সমস্ত গুনাহ্‌র কাজ হইতে বিরত রহিয়াছি তাহাতে অন্য কোন কারণ আছে। অন্যথায় গুনাহের কাজ সবগুলিই সমান। একটি ত্যাগ করা আর সবগুলিকে করিতে থাকার কি অর্থ হইতে পারে ? সেই অন্য কারণটি এই বংশমর্যাদা, বংশগত অভ্যাসই এবং ধর্মের প্রতি বেপরোয়াই বটে।

॥ ধর্ম-কর্মে অল্পেতে তৃপ্তি কেন ॥

যদি ধর্মের পরোয়া থাকিত, তবে প্রথমতঃ গুনাহ্‌র কাজ করিতই না এবং মনুষ্যত্বের চাহিদা অনুযায়ী গুনাহ্‌র কাজ হইয়া পড়িলেও উহার ক্ষতিপূরণ বা সংশোধন করিয়া লইত। কিন্তু উহার কোন পরোয়াই নাই। ইহাতেই তৃপ্ত। অভ্যাস যেমন হইয়া গিয়াছে তেমনই চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, দুনিয়ার কোন কাজেই অল্পে তৃপ্তি হয় না। এমনকি কাপড়েও না। আবশ্যক পরিমাণ কাপড় রহিয়াছে, কিন্তু গত বৎসরের বানান। এখন আফ্‌সুসের সহিত বলে, "এ বৎসর হাতে টাকা-পয়সার এত অভাব যে, একটি ওয়াচকোট এবং আচ্‌কান বানাইতে পারিলাম না।" ঘর-বাড়ীর ব্যাপারেও অল্পে তৃপ্তি নাই। এতটুকুও তো নাই যে, প্রতি বৎসরই দালানে চুনের পোঁচরা দেওয়া হয়, এবার না হয় নাই হইল। চুনের পোঁচরায় এমন কি আছে। সমস্ত নিশ্চিন্ততা কেবল ধর্মীয় ব্যাপারে এবং অল্পে তৃপ্ত হওয়ার কোন ক্ষেত্র থাকে তো তাহা ধর্মে-কর্মে। ইহাতে কোন প্রকার উন্নতি লাভের চিন্তাও নাই। উহার ক্ষতিতেও কোন পরোয়া নাই। অথচ দুনিয়ার ব্যাপারে একটি পয়সা ক্ষতি হইলে মনে কষ্ট হয় আর ধর্মে-কর্মে রাশি রাশি বিনাশ হইলেও—বস্তুতঃ হইয়াও থাকে—তাহাতে কোন আক্ষেপ নাই। উহার কোন খবরও থাকে না। ধর্ম যেন অবস্থার ভাষায় বলিতেছে :

قلق از سوزش پروانه داری × ولے از سوزما پروانه داری

"পতঙ্গ আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে, উহার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেছ। কিন্তু আমাদের পুড়িয়া মরার কোন পরোয়াই রাখ না।"

ধর্ম কি এতই অপদার্থ যে, উহার কোন পরোয়াই করা হইবে না। আপনি জানেন কি ? ধর্ম কেমন বস্তু ? আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের নাম দ্বীন বা ধর্ম। কাহারও কি এমন সাহস আছে যে, বিনা দ্বিধায় মুক্ত মনে বলিতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক, স্থায়ী রাখার বস্তু নহে। ফলকথা, আমরা ধর্মে কেমন অবস্থায় আছি সে সম্বন্ধে আমাদের কোনই পরোয়া নাই। ইহাই সেই অভিযোগ যাহার উদ্দেশ্যে এই সভার আয়োজন করা হইয়াছে এবং যাহা দূর করা একান্ত জরুরী। উহার উপর ধর্ম-কর্মের সর্বশেষ পর্যায় সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা যেখান পর্যন্ত পৌঁছা ব্যতীত ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না তাহা জানিতে পারিলে মানুষ উহার পূর্বে ক্ষান্ত হইবে না।

॥ ধর্মের পূর্ণতা সাধনের উপায় ॥

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি দিল্লীর যাত্রী, সে দিল্লী না পৌঁছা পর্যন্ত তাহাকে অবিরাম চলিতেই হয়। অবশ্য তাহাকে দিল্লীর নিদর্শনসমূহ বলিয়া দেওয়া উচিত যেন সে উক্ত চিহ্ন দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত চলা বন্ধ না করে। অন্যথায় সে মধ্য পথেই থাকিয়া যাইবে। যে স্থানকেই সে দিল্লী মনে করিবে সেখানেই সে গতি বন্ধ করিয়া দিবে। এই কারণে দ্বীনের (ধর্মের) শেষ পর্যায় বলিয়া দেওয়া একান্ত জরুরী।

কেহ কেহ এই ধোকায় পতিত হয় যে, সাধনা (মুজাহাদা) করিতে করিতে যখন কোন স্বভাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল কিংবা কোন নীচ স্বভাবের সংশোধন হইয়া গেলে যদি তাহাকে সাধ্যসাধনা কমাইয়া দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সে মনে করে যে, আমি কামেল হইয়া গিয়াছি। ফলে সে ধর্ম-কর্মে গুরুত্ব কমাইয়া দেয়। তাহার বুঝা উচিত, আ'মলের সমষ্টির নাম ধর্ম, মুজাহাদার নাম ধর্ম নহে। হাঁ, তবে বিভিন্ন প্রকারের মুজাহাদা ও পরিশ্রম আ'মলসমূহের পূর্ববর্তী কর্তব্য। অতএব, মুজাহাদা ও পরিশ্রমের তো শেষ সীমা হইতে পারে, কিন্তু আ'মলের কোন শেষ সীমা হইতে পারে না। অতএব, ধর্ম-কর্মের গুরুত্ব কোন সময়েই লোপ হওয়া উচিত নহে।

ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই দৃষ্টান্তটি হইতে পাওয়া যাইবে যে, বাড়ী যখন প্রস্তুত করা হয়, উহা পূর্ণরূপে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত উহার প্রতি কেমন মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, পূর্ণ বা সমাপ্ত হওয়ার পরে আর উহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। অন্যথায় উহার অর্থ এই হইবে যে, ঘর নির্মাণ করিয়া উহাকে খালি ও অব্যবহৃত ফেলিয়া রাখা। এমনকি উহার মধ্যে কেহ বসবাস না করা এবং মনে করা যে, উদ্দেশ্য ছিল এমারত নির্মাণ করা, উহা

সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব, উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে। এখন ঘরের কাজ আর কি বাকী রহিয়াছে, না ; বরং সদাসর্বদা উহার প্রতি মনোযোগ রাখিতে হইবে। তবে উভয় সময়ের মনোযোগের মধ্যে পার্থক্য থাকিবে। প্রথমে মনোযোগ ছিল উহা পূর্ণ ও সমাপ্ত করার প্রতি, আর এখন মনোযোগ হইবে উহাকে স্থায়ী রাখার এবং উহা হইতে উদ্দেশ্য হাছিল করার প্রতি। বাড়ী নির্মাণের পর মানুষের ইচ্ছা হয় উহাতে বসবাস করিতে, উহার আবহাওয়া উপভোগ করিতে এবং উহা নির্মাণের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা হাছিল করিতে। চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহাই প্রকৃত মনোযোগ। নির্মাণ-কালীন মনোযোগ ছিল শুধু মাত্র ইহার সূচনা।

এইরূপেই এক কালে ধর্মের প্রতি মনোযোগ ছিল পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে। পূর্ণ হওয়ার পর এখন মনোযোগ দেওয়া উচিত উহার স্বাদ উপভোগের দিকে। সেই মনোযোগ ছিল "মুজাহাদাহ্" অর্থাৎ, চেষ্টা ও পরিশ্রম, আর পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী মনোযোগ হইবে, "মুশাহাদাহ্" অর্থাৎ, 'আন্‌ওয়ার' এবং 'ফুয়ুয' অবলোকন করা। সাধনা ও পরিশ্রমের দ্বারা কেবল ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধামিক বা দ্বীনদার হওয়ার সময় এখন আসিয়াছে, তবে কি ইহার অর্থ এই হইবে যে, ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হইলেই ধর্মকে ছাড়িয়া দিতে হইবে ?

দেখুন, কেহ কাপড় বানায় এবং উহার শেষ পর্যায়ের অবস্থা সে অবগত আছে। তবে কি ইহার অর্থ এই যে, সেই শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া কাপড় ছাড়িয়া উলঙ্গ হইয়া যাওয়া উচিত ? কিংবা উহার অর্থ এই যে, কাপড়ের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সফল করা। আমরা তো এমন কাহাকেও দেখি নাই যে, কাপড় প্রস্তুত হইয়া যাওয়ার পর ইহাকে শেষ পর্যায় মনে করিয়া উহাকে ভাঁজ করিয়া উঠাইয়া রাখিয়া দেয়, পরিধান করে না। বোকার চেয়ে বোকা ব্যক্তি একথা জানে যে, সিলাই তো শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আসল উদ্দেশ্য মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। যত দিন কাপড়ের অস্তিত্ব আছে ইহার শেষ কোথাও নাই। আর ধর্মের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান অনেক আছে যাহারা ধর্মের শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া উহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া বসে এবং মনে করে যে, আমরা 'ফানা' হইয়া গিয়াছি। এখন আমাদের আ'মল করার প্রয়োজন নাই।

॥ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল ॥

এরূপ খেয়ালের লোকও বিদ্যমান আছে যে, ধর্মের কোন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়া নিজেকে আযাদ মনে করিতে আরম্ভ করে এবং শাহ্ সাহেব সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। নামাযও পড়ে না রোযাও থাকে না। এদিকে ভক্তবৃন্দ বলে, ফকিরের ব্যাপার ফকিরই বুঝে। তিনি শাহ্ সাহেব তো হইয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহার পরিশ্রমের কি

প্রয়োজন ? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শাহ্ সাহেব পরিধেয় কাপড় নির্মাণের শেষ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া উহা পরিধান করা ত্যাগ করেন নাই।

আমাদের ওখানের একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি বাড়ী নির্মাণ করিতে চাহিল, কিন্তু হাতে টাকা ছিল না। অতএব, জনৈক মহাজন হইতে টাকা কর্জ লইয়া বাড়ী নির্মাণ করিল। কিছু দিন পরে মহাজন আসিয়া তাগাদা শুরু করিল। কিছুদিন দেই দিচ্ছি করিয়া কাটাইয়া দিল, যখন তাগাদা পুরা মাত্রায় শুরু হইল, তখন সে কি করিল: রাগান্বিত হইয়া বাড়ীর গাথুনী খুলিল এবং বলিল, আমি ঋণের টাকায় নির্মিত বাড়ীই রাখিব না যে, দিন দিন তাগাদা চলিতে থাকিবে। তাহার মতে তো সে ঋণের মূলই উৎপাটন করিয়া ফেলিল, কেননা, বাড়ীর কারণেই তো তাগাদা চলিতেছিল সেই বাড়ীই রাখিলাম না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাগাদা ফুরাইল কি ? মোটেই না। তাগাদা ঠিক রহিল, মাঝখান হইতে সে বাড়ীটি হারাইল। এইরূপে শাহ্ সাহেবও ধারণা করিয়া বসিয়াছেন যে, শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। যেন ধর্মের ঘর পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। এখন উহাতে বাস করার এবং উহার স্বাদ উপভোগ করার সময় হইয়াছে, কিন্তু তিনি সেই ঘর ধ্বংস করিয়া দিলেন অর্থাৎ, নামায রোযা ছাড়িয়া দিলেন। অংশের স্থায়িত্বের দ্বারাই প্রত্যেক বস্তু স্থায়ী হইয়া থাকে। ধর্মের অংশ রোযা নামাযই যখন রহিল না, তখন ধর্মের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে ? ইহা তো ঠিক ঘর ধ্বংস করার মতই হইল, এই দৃষ্টান্তের সহিত উহার কি পার্থক্য দেখিয়া লউন। ধর্মের জন্য মুজাহাদা ও পরিশ্রম শেষ হওয়ার পর ধর্মীয় আ'মল ছাড়িয়া দেওয়া আর তৈরী ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা একই কথা। উচিত ছিল—এই মনে করিয়া আল্লাহ্র শোক্র করা—মেহ্নত শেষ হইয়াছে, ধর্ম পূর্ণ হইয়াছে, এখন উহার স্বাদ উপভোগ করার সময় আসিয়াছে।

॥ মুজাহাদার স্বাদ ॥

মুজাহাদার ও পরিশ্রমের সময়টুকু স্বাদ উপভোগের সময় নহে; বরং তাহা পরিশ্রমের সময়। পরিশ্রমেও অবশ্য এক প্রকারের স্বাদ আছে। সেই স্বাদ দিল্লীর হালীমের মজার মত। উহাতে ঝাল এত অধিক থাকে যে, খানেওয়ালা খাইতে থাকে আর একদিক হইতে অবিরত ধারায় নাকের ও চোখের পানি প্রবাহিত হইতে থাকে। এই পানি প্রবাহিত হওয়া অপছন্দনীয় এবং কষ্টদায়ক অবশ্যই। কিন্তু হালীম এত সুস্বাদু যে, এই কষ্টের কারণে উহাকে ত্যাগ করা যায় না। কিংবা মনে করুন, খুজলির স্বাদ, চুলকাইতে চুলকাইতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। কিন্তু এমন স্বাদ পাওয়া যায় যে, ত্যাগ করা যায় না।

কোন কোন কষ্টের মধ্যে মজাও আছে, এইরূপে ধর্মীয় কাজের কষ্টেও দুনিয়ার চেয়ে অধিক মজা রহিয়াছে। এই কারণেই ধর্মের জন্য পরিশ্রমকারিগণ আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া থাকেন এবং মজা হইতে মাহ্‌রূম থাকেন কিন্তু প্ররিশ্রম ত্যাগ করেন না, কিন্তু তবুও পরিশ্রমই মুজাহাদাহ্। সূচনায়ই যখন এই মজা তখন ভাবিয়া দেখুন, আসল বস্তুতে কি মজা হইবে। আমি বর্ণনা করিব যে, আসল বস্তু কি? এবং উহা কোন মুশ্‌কিল বিষয়ও নহে। অনেক লোকে এইরূপ বুঝিয়া বসিয়াছে যে, এখন এই যমানায় সেই বস্তু হাছিল হইতে পারে না। ইহা ভুল, নবুওতের তো এমন এক দরজা যাহা শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু বেলায়েতের দরজা শেষ হয় নাই। কবি বলেন :

هنوز آن ابر رحمت درفشان ست + خم وخم خانه با مهر ونشان ست

"এখনও সেই রহমতের মেঘ মুক্তা ছড়াইতেছে। শরাবের হাড়ি, শরাবখানা উহার অনুগ্রহ চিহ্নসহ বিদ্যমান।" অর্থাৎ বেলায়েত বন্ধ হয় নাই; এখনও হাছিল হইতে পারে। একথা আমি নিজের তরফ হইতে বলিতেছি না; বরং কোরআন শরীফে পরিষ্কার বর্ণিত আছে : أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ইহা আওলিয়া কেরামের জন্য খোশ-খবর। একটু পারে বলিতেছেন : الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ইহাতে বলা হইয়াছে আউলিয়া কাহারা? যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ঈমান এবং তাক্বওয়া উভয় কার্যই ইচ্ছাধীন। ইহার উপর বেলায়েতের ভিত্তি স্থাপিত। অতএব, বেলায়েতও ইচ্ছাধীন কার্যই হইল। তবে ইহা শেষ হইয়া যাওয়ার অর্থ কি? এখনও সবকিছু হাছিল হইতে পারে এবং সহজেই হইতে পারে। দুর হইতেই এই বস্তু কঠিন বলিয়া মনে হয়। অন্যথায় ধর্ম এমন আনন্দদায়ক যে, দুনিয়ার অন্য কোন কিছুই এমন আনন্দদায়ক হইতে পারে না। চিন্তা করিয়া দেখুন, যে বস্তুর জন্য চেষ্টা করাতে এত স্বাদ যে, মানুষ চেষ্টায় মগ্ন হইয়া তাহা ছাড়িতে পারে না। অতএব, স্বয়ং সেই বস্তুর মধ্যে কেমন স্বাদ হইতে পারে যাহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

মোটকথা, ধর্মের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম যখন শেষ হইবে, তখন বুঝিবেন যে, ধর্মের স্বাদ গ্রহণের সময় এখন আসিয়াছে। যে নামায হইতে লোকে পলাইয়া বেড়ায় এবং বোঝা স্বরূপ মনে করে, উহা এত মজাদার হয় যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না, এইরূপে রোযাও এত মজাদার হয় যে, তাহা একমাত্র উপভোগকারী ছাড়া আর কেহ জানিতে পারে না।

॥ দ্বীনের বরকত ॥

ফলকথা, দ্বীন এমন বস্তু, যাহার বদৌলতে প্রত্যেকটির মধ্যেই স্বাদ পাওয়া যায়। বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, এমনকি কসম করিয়া বলিতেছি হত্যার মধ্যেও

কোন প্রকারের অশান্তি বা অস্থিরতা আসে না। ইহার অর্থ এই নহে যে, ধার্মিক লোকের উপর কোন মুছিবত আসে না। তাঁহাদের উপরও সকল রকমের বিপদ আসিয়া থাকে। কিন্তু উহার সবকিছুই বিপদের বাহিরের রূপ, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের জন্য উহাতে আরাম এবং শান্তিই নিহিত থাকে। কেননা, তাঁহাদের বিশ্বাস এই; বরং তাঁহাদের স্বভাবগত অবস্থার মধ্যে একথা ঢুকিয়া যায় যে তাঁহাদের সবকিছুকেই মাহ্বুবে হাকীকীর তরফ হইতে মনে করে। বস্তুতঃ মাহ্বুবের কোন বিষয়ই হাবীবের নিকট অপছন্দনীয় হয় না। মুছিবতের সময় তাঁহারা বলেন ঃ

نا خوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

"তোমার দেওয়া কষ্টও আমার প্রাণে আনন্দবর্ষণ করে। কেননা, প্রাণে ব্যথা প্রদানকারী বন্ধুর জন্য আমার মন-প্রাণ উৎসর্গীত।" এবং মাহবুবকে সম্বোধন করিয়া বলে :

زندہ کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو + دل شدہ مبتلائے تو ہرچہ کنی رضائے تو

"জীবিত রাখ তোমার মেহেরবানী, মারিয়া ফেল, (আপত্তি নাই) প্রাণ তো তোমার জন্য উৎসর্গিতই রহিয়াছে। মন তোমাতে মগ্ন, যাহাকিছু কর, তোমার খুশী।" অতএব, কোন প্রকারের কষ্ট এবং মুছিবতের তাঁহারা কোন পরোয়াই করেন না। সকল ব্যাপারেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। কেননা, শান্তিকেও তাঁহারা আল্লাহ্র দান মনে করেন এবং মুছিবতকেও তাঁহারা আল্লাহ্র দেওয়া মনে করেন। অতএব, উভয়ই তাঁহাদের নিকট সমান। কাজেই সুখের সময় তাঁহাদের মনের যে অবস্থা হইবে দুঃখেও সেই অবস্থাই হইবে।

একজন আল্লাহ্ওয়ালা লোক পীড়াগ্রস্ত হইলে তাঁহার অসহনীয় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, সেই অবস্থায়ও তিনি বেশ আনন্দিত ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি অবস্থা? তিনি খুব হাসিলেন। রোগের কষ্টে তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, যেমন কাহারও প্রিয়জন তাহাকে চিম্টি কাটিতেছে, চিম্টি কাটার কষ্ট তাঁহার শরীর অবশ্যই অনুভব করিতেছে; কিন্তু মন আনন্দে নাচিতেছে এবং কলিজা খুশীতে ফুলিয়া উঠিতেছে। এমন সময় প্রিয়জন যদি তাহাকে বলে, আমি পৃথক হইয়া যাইতেছি। আর তোমাকে কষ্ট দিব না। তবে সে ব্যক্তি কবুল করিবে না এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবে ঃ

سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے + کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

"যবাহ করিবার সময় আমার মাথা প্রিয়জনের পায়ের নীচে রহিয়াছে, "আল্লাহু আকবার" কি সৌভাগ্য লুটাইয়া পড়ার স্থান।"

এ রূপ লোক সকল অবস্থাতেই কেবল স্বাদই পাইয়া থাকেন, অস্থিরতা বা অশান্তি তাহার কাছেও ঘেষিতে পারে না।" মুছিবত তাঁহাকে এমন স্বাদ প্রদান করিয়া থাকে যেমন প্রিয়জনের প্রেম-ছলনা।

॥ আশেকের কামনা ॥

ফলকথা, ধর্মের মহব্বৎ এমন বস্তু যাহার বদৌলতে বিপদেও স্বাদ এবং শান্তি পাওয়া যায়। অতএব, সে ব্যক্তি নামায-রোযায় স্বাদ এবং চোখের শান্তি কেন পাইবে না। কেননা, ইহাতে তো আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি সাহচর্য লাভ হয়। ইহার স্বাদ ঐ ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারিবে, যে কোন দিন প্রিয়জনের ছলনা ও সোহাগ দেখিয়াছে অতঃপর সেই প্রিয়জনের সাহচর্য ভাগ্যে জুটিলে তাহার কেমন অবস্থা হইবে। সে তো একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িবে। এখন হইতে ঐ সমস্ত লোকের ভুল অনুমান করুন যাহারা ধর্মের জন্য সাধনা সমাপ্ত করিয়া বসিয়া থাকে। মনে হয়, যেন তাঁহাদের অনুভূতিই নাই এবং উদ্দেশ্য অনুদ্দেশ্যের মধ্যে কোন প্রভেদই তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন হয় নাই। এই কারণেই তো তাহারা চেষ্টা পরিশ্রমকেই চরম লক্ষ্যস্থল মনে করিয়া লইয়াছে। স্বাদ গ্রহণের সময় তো এইমাত্র আসিয়াছে। সাধনার মধ্যে যৎসামান্য স্বাদ যাহা আছে উহাকেই ইহারা আসল স্বাদ মনে করিয়া বসিয়াছে।

বন্ধুগণ! ইহাদের দৃষ্টান্ত ঠিক তদ্রূপ যেমন পরিশ্রম করিয়া এবং নানা পেরেশানী ভোগ করিয়া বাড়ী নির্মাণ করিয়াছে এবং নির্মিত হওয়ার পরে যখন উহাতে বসবাস করার সময় আসিয়াছে তখন উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। এই ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রূপ, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছে যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার নাম লওয়ার যোগ্যতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং দ্বীনের সহিত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। এতটুকু বিষয় হাছিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছাড়িয়া বসিয়াছে। নামায-রোযা 'তাকে' উঠাইয়া রাখিয়াছে এবং কামেল সাজিয়া বসিয়াছে। ইহা তো সাধারণ জ্ঞানেরও বিপরীত, মহব্বতেরও বিপরীত। ইহা তো ঠিক তেমনই হইল যেমন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অন্বেষণ করার পর মাহ্বুব তাহাকে ধীরে ধীরে নিজের কাছে ঘেষিবার অধিকার দিয়াছেন। ব্যস, সে ব্যক্তি তাঁহার চেহারা দেখিয়াই لا حول الخ বলিয়া পলাইয়া গেল। কেন সাহেব! বলুন, এই ব্যক্তি আশেক হইলে নামায-রোযা ত্যাগ করা এশ্‌কের অবস্থারও বিপরীত। আশেক তো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি এরূপ সময়ে বলে, "সম্মুখে আস।" এমনকি ইহাও বলে যে, আমার হাতের উপর হাত রাখ, আমার কোমরে হাত দিয়া আমার সঙ্গে আলিঙ্গন কর। কাছে যাইয়া কি কোন দিন আলিঙ্গন ব্যতীত আশেকের মনে তৃপ্তি হয়।

کنار و بوس سے دونا ہوا عشق × مرض بڑھتا رہا جوں جوں دوا کی

"চুম্বন ও আলিঙ্গনে এশ্‌ক দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যতই ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে ততই রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।" আশেকের অবস্থা তো এইরূপ হয় যে, যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই তাহার চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এরূপ অবস্থার সম্বন্ধেই কবি বলিয়াছেন:

نگویم که بر آب قادر نیند + که بر ساحل نیل مستسقی اند

"আমি বলি না যে, পানি তাহাদের আয়ত্তে নহে। কেননা, পানি প্রার্থী নীল নদের তীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।" মাহ্‌বুবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাহ্‌বুবের অন্বেষণে পাগল।

دل آرام در بر دل آرام جوئے + لب از تشنگی خشک و بر طرف جوئے

"চিত্তের শান্তিদায়ক প্রিয়জন কোলে রহিয়াছে অথচ মনের শান্তি চাহিতেছে, পিপাসায় ওষ্ঠাধর শুষ্ক অথচ নদীর তীরে দণ্ডায়মান।"

মাহ্‌বুব বাহুর ভিতরে রহিয়াছে কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে না। আরও বিচিত্র অবস্থা এই যে, নিকটেই রহিয়াছে কিন্তু দূরে। এমনকি, দারুণ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঠিক মিলনের অবস্থায় বলে, ওহে অমুক। ওহে অমুক !! বল ত কি করি? এমতাবস্থায় যদি কেহ বলে, কাহাকে ডাকিতেছ? যাহাকে ডাক তাহার সঙ্গে তো তোমার মিলন হইয়াছে। এরূপ চাঞ্চল্যের কারণ এই যে, মিলনের যে পর্যায়ই তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে সে তদপেক্ষা আরও উচ্চ পর্যায়ের মিলনপ্রার্থী। প্রিয়জনের সম্মুখে থাকিয়াও তাহাকে নিকটে মনে করে না; বরং বহু দূরে মনে করে। এই কারণেই 'ফরিয়াদ' করিতেছে। ইহা হইল এশ্‌কের অবস্থা। মিলন উপভোগ করিতেছে তবুও অবস্থা এই যে, নাম বলিয়া ডাকিতেছে। নাম উচ্চারণে রসনা স্বাদ পাইতেছে আর নাম শুনিয়া কান স্বাদ পাইতেছে। মোটকথা, সর্বশরীর তাহাতেই মগ্ন। শরীরের কোন অংশকেই সেই সুখ উপভোগ হইতে বঞ্চিত রাখা পছন্দ হয় না। সাধ্য থাকিলে অন্তরের উপর বসাইয়া লইতেও প্রস্তুত। ফলকথা, আশেক কখনও তৃপ্ত হয় না। দুনিয়ার মা'শুকের সঙ্গে যখন এরূপ অবস্থা, তবে মাহ্‌বুবে হাকীকীর সঙ্গে আপনার কিরূপ খেয়াল? তাঁহারপ্রার্থীর কি এরূপ অবস্থাই হওয়া উচিত যে, যতই দিন বাড়িবে ততই অন্বেষণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং যেক্‌রুল্লাহ্‌র মধ্যেও উন্নতি হইতে থাকিবে। এমনকি, তাঁহার যেক্‌রের মধ্যে 'ফানা' হইয়া যাইবে? না এরূপ হইবে যে, প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত করিয়াই তৃপ্ত হইয়া যাইবে এবং মনে করিতে থাকিবে যে, মিলন হইয়া গিয়াছে? ইহা এশ্‌ক্ নহে। ইহা তো ঠাট্টা, ইহা তো বিদ্রূপ। ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন—পরিশ্রম করিয়া মাহ্‌বুবের দরজায় পৌঁছিল। যখনই দর্শন লাভের সুযোগ আসিল, তখন لاحول الخ। পড়িয়া পলাইয়া গেল। বন্ধুগণ! ইহাকে কি এশ্‌ক বলা যায়? ইহাকে কি মিলন

বলা যায় ? এরূপ আশেকের উপর তো মা'শুক এমন রাগান্বিত হইবেন যে, সারা জীবনে আর তাহাকে কাছে ঘেষিতে দেওয়া হইবে না ; বরং এই বে-আদবীর অপরাধে তাহাকে জেল খানায় পচাইয়া মারা হইবে।

॥ আল্লাহ্ তা'আলার মিলনপ্রাপ্ত ব্যক্তি ॥

আশ্চর্যের বিষয় ! এই শ্রেণীর লোকদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলন-প্রাপ্ত লোক মনে করা হয়। হাঁ, এক হিসাবে তাহাকে মিলনপ্রাপ্ত বলিলে ভুল হয় না। অর্থাৎ, জাহান্নামের সহিত মিলনপ্রাপ্ত ; আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নহে।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহেমাহুল্লাহুকে বলা হইয়াছিল, কতক লোক নামায-রোযা কিছুই করে না অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলনপ্রাপ্ত বলিয়া দাবী করে। তিনি জবাব দিয়াছিলেন : صَدَقُوْا فِى الْوُصُوْلِ وَلٰكِنْ اِلٰى سَقَرِ হাঁ, "তাহারা মিলনের দাবীতে সত্যবাদী : কিন্তু জাহান্নামের সহিত মিলিত হইয়াছে। জান্নাতের সহিত কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নহে।" কিন্তু এরূপ বিকৃত রুচির লোক আজকাল অনেক আছে। তাহারা এসমস্ত অবাস্তর লোকের ভক্ত এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলার সহিত মিলনপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। ইহারা খোদার সান্নিধ্য কেমন করিয়া লাভ করিবে ? জাহান্নামের সহিত অবশ্যই মিলিত হইবে।

হযরত জুনাইদ (রঃ) ইহাও বলিয়াছেন : 'আমাকে যদি হাজার বৎসরের আয়ু দান করা হয়, তবুও শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত এক ওয়াক্তের ওযীফাও কাযা করিব না। ইহা সে সমস্ত লোকের বাণী যাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলিত। যাহারা এক ওয়াক্তের অযীফা কাযা করাও পছন্দ করিতেন না, ধর্মের একান্ত জরুরী অংশ নামায-রোযা তো দূরেরই কথা।

হযরত জুনাইদ (রঃ)-এর হাতে তাস্বীহ্ দেখিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতে আপনার কি প্রয়োজন ? আপনি তো আল্লাহ্ তা'আলার সহিত মিলনই লাভ করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন : ইহার বদৌলতেই তো মিলন লাভ করিয়াছি, এমন বন্ধুকে ছাড়িয়া দিব ?

হযরত মুসা (আঃ) এক খণ্ড প্রস্তরকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ ?" বলিল : 'আমি শুনিয়াছি যে, পাথরকেও দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। এই ভয়ে কাঁদিতেছি।" হযরত মুসা(আঃ)ইহা শুনিয়া খুবই দয়াদ্র হইলেন এবং দো'আ করিলেন : "ইয়া আল্লাহ্ ! ইহাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দো'আ কবূল করিলেন এবং ওয়াদা করিলেন, উক্ত প্রস্তর খণ্ডকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিবেন। মূসা(আঃ)উহাকে এই খোশ্খবর শুনাইয়া নিজ

পথে চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিবার পথে দেখিতে পাইলেন পাথরটি এখনও কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেন কাঁদিতেছ? এখন তো তুমি মুক্তির ওয়াদা প্রাপ্ত হইয়াছ। সে উত্তর করিল, কান্নার বদৌলতেই তো এই নেয়ামত লাভ করিয়াছি, তবে আমি এমন আ'মলকে কেন ত্যাগ করিব যাহার এতটুকু বরকত রহিয়াছে?

মাওলানা লিখিয়াছেন, বিড়াল যদি কোন গর্ত হইতে এক দিন একটি ইঁদুর ধরিতে পারে, তবে প্রতি দিন সেই গর্তের মুখে আসিয়া বসিয়া থাকে। এখন বলুন, এ সমস্ত তালেবের কি অবস্থা হইবে—বিড়ালের সমান অনুভূতিও যাহাদের নাই? বাস্তবিক, কেমন আফ্‌সুসের কথা! যে বস্তুর বদৌলতে কামালিয়ত হাছিল হইল—উহাকেই যবাহ্ করিয়া দেওয়া হইল? আ'মলের দ্বারাই সম্মান পাওয়া গেল আর সেই আ'মলকেই বর্জন করা হইল! ইহা আকলেরও খেলাফ, কোরআনেরও খেলাফ, এশ্‌কেরও খেলাফ, সুস্থ স্বভাবেরও খেলাফ। সুতরাং সান্নিধ্য লাভের অবস্থায় আরও অধিক সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা কর। খোদার সান্নিধ্যের কোন শেষ সীমা নাই। খোদা জানেন, এ সমস্ত মিলনের দাবীদারগণ কোন্ বস্তু দেখিয়া উহাকে মিলন মনে করিয়া লইয়াছে। যদি প্রকৃত উদ্দেশ্যস্থল জানিতে পারিত, তবে কখনও গমনে ক্ষান্ত হইত না। গন্তব্যস্থল অনেক দূরে! সেই পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা কখনও শেষ হইতে পারে না। আসল বস্তুর পাত্তাই তাহারা এযাবৎ পায় নাই। উহার স্বাদের অনুভূতিই এখনও তাহাদের হয় নাই। অন্যথায় তাহারা কখনও চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারিত না। তাহারা শুধু চেষ্টা ও পরিশ্রমের অস্পষ্ট স্বাদ কিছুটা উপভোগ করিতে পারিয়াছে। চেষ্টা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দৌড়ও শেষ হইয়াছে। অথচ নিরঙ্কুশ মযা ছিল সম্মুখে।

॥ আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যের সীমা ॥

আমার এই বর্ণনাটিকে অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্যের বিরোধী মনে করিবেন না। কেননা, ওয়াযের উদ্দেশ্য এই বলিয়াছি যে, ধর্মের সর্বশেষ কর্তব্য কি? এই বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, কোন শেষ সীমাই নাই। অতএব, কথা এই যে, আমি যে বস্তুকে শেষ কর্তব্য বলিয়া দিব উহার উদ্দেশ্য এই হইবে না যে, সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া ধর্ম-কর্ম ছাড়িয়া দিবে; বরং উহার উদ্দেশ্য এই যে, সেই পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্যই লোকে চেষ্টা করে না। অথচ উহার পূর্বে ধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তবে একটি কথা এই থাকে যে, পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পরে কি করিতে হইবে? ইহা একটি স্বতন্ত্র মাস্‌আলা। এ সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি, অতঃপর কখনও ধর্মের কোন আ'মল ত্যাগ করিতে পারিবে না। পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তৎপূর্বে এক চেষ্টা করিতে হয়। তাহাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল। আর পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পরে এক চেষ্টা আছে। শেষের দিকে প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা আসিয়া পড়িয়াছিল।

প্রথম চেষ্টার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন বলা হইয়াছে—নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে দালানের নির্মাণ কার্য বন্ধ করা উচিত নহে। দ্বিতীয় চেষ্টার দৃষ্টান্ত এই যে, নির্মিত হওয়ার পরে উহার স্বার্থ উপভোগ করা বন্ধ করা যাইবে না। অতএব, বাড়ী বা গৃহ নির্মাণ কার্যের যেমন শেষ আছে, উহাতে বসবাস করার শেষ নাই। কেননা, একথা কেহ চায় না যে, নির্মিত গৃহে বসবাসের জন্য কোন শেষ সীমা নির্ধারিত হউক। নির্মাণের সময় প্রত্যেকেই চায় যে, এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা সমাপ্ত হউক। সত্বর এই ঝামেলা হইতে মুক্তি পাওয়া যাউক। বসবাসের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ হউক; বরং নির্মাণের চেষ্টায় যে স্বাদ পাওয়া যায়, তাহা ঐ স্বাদের আশায়ই পাওয়া যায়—যাহা ভবিষ্যতে উক্ত গৃহে বাস করিলে পাওয়া যাইবে।

এইরূপে ধর্মকে মনে করুন। উহার যোগ্যতা অর্জনের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হয় এবং উহার সময় সীমাবদ্ধ হইতে পারে। ধর্ম পূর্ণরূপে হাছিল হইয়া গেলে এবং আ'মলে স্বাদ পাওয়া আরম্ভ হইলে এই স্বাদ উপভোগের জন্য কোন মুদ্দত সীমাবদ্ধ হইতে পারে না; বরং যতই আ'মল করিতে থাকিবে ততই দিবা-রাত্রি উন্নতি হইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি এই স্বাদের একবার সন্ধান পায়, সে নিজেই আর কখনও উহা ছাড়িতে পারে না। আর যাহারা আ'মল ছাড়িয়া দিয়াছে তাহারা পূর্ণতা হাছিলের পরবর্তী স্বাদের অনুসন্ধানই পায় নাই। তাহারা শুধু ঐ স্বাদটুকুই অনুভব করিতে পারিয়াছিল যাহা চেষ্টা ও পরিশ্রমের সময় পাইয়াছিল। প্রথমে উন্নতি করার মধ্যে স্বাদ পাইয়াছিল আর এখন স্বাদের মধ্যে উন্নতি হইবে। কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই উন্নতি ত্যাগ করিবার বস্তু?

বলা বাহুল্য, যখন মাহ্বুব পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য পরিশ্রম করিয়াছে, তখন মাহ্বুবের নৈকট্য লাভ করিবার পর অধিক স্বাদ ও শান্তি উপভোগ করার প্রতি মনোযোগ কেন হইবে না? যেই আশেক মা'শুক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে তাহার পঞ্চাশ বৎসর কালও যদি মা'শুকের নিকটে অতিবাহিত হইয়া যায়, তবুও সে উহাতে তৃপ্ত হইবে না। কখনও তাহার এরূপ মনে হইবে না যে, অনেক দিন ধরিয়া মিলন স্বাদ উপভোগ করিয়াছি এখন শেষ করা উচিত। আশেক যেমন সারা জীবন মা'শুকের মিলন স্বাদ উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; বরং তাহার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া যায়। যতই মা'শুকের সান্নিধ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহার অবস্থা এইরূপ হইতে থাকে যে:

دل آرام دربر دل آرام جوے + چو مستسقی تشنه وبر طرف جوے

(ইহার অনুবাদ পূর্বে কয়েকবার দেওয়া হইয়াছে) তবে দুনিয়ার মাহ্বুবদের নৈকট্য সময় সময় সীমাবদ্ধ এই কারণে হইয়া যায় যে, মাহ্বুব নিজেই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে মাহ্বুবে হাকীকী স্বয়ং অনন্ত ও অসীম। সুতরাং তাঁহার নৈকট্যেরও সীমা হইতে পারে না।

কবি এই মর্মেই বলিয়াছেন :

اے برادر بے نہایت در گہیست + ہرچہ بروے می رسی بروے مایست

"হে ভাই। অসীম এক দরবার আছে। তুমি যে সীমায়ই পৌঁছ না কেন তাহা আমাদের চোখের সামনেই তো রহিয়াছে।"

বরং খোদাকে লাভ করার পথ দীর্ঘ হওয়া ব্যতীত এক বিশেষত্ব ইহাও আছে যে, উহাতে উন্নতিও বৃদ্ধি হইতে থাকে। কবি বলেন :

نہ گردد قطع ہرگز جادۂ عشق از دویدنہا

کہ می بالد بخود این رہ چون تاک از بریدنہا

"এশ্‌কের পথ দৌড়াইয়া কখনও শেষ করা যায় না। কেননা, এই পথ আপনাআপনি বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; যেমন, আঙ্গুরের লতা যত কাটা হয়, ততই বাড়িয়া যায়।"

এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখন শুনুন, এতদুভয় পর্যায়ের জন্য সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় দুইটি শব্দ আছে। সেই দুইটি শব্দ যদি আমি পূর্বে বলিয়া দিতাম, তবে একটি বিস্ময়কর বস্তু হইয়া দাঁড়াইত। আর মানুষ উহাকে খুবই কঠিন মনে করিত এবং জানি না কি বুঝিত। কিন্তু প্রথমে উহার তথ্য একেবারে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন শব্দ দুইটি শ্রবণ করুন। উহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা কোন অপরিচিত পরিভাষা নহে এবং খুবই সাদাসিধা শব্দ।

॥ আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ ॥

সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় মুজাহাদা অর্থাৎ চেষ্টা ও সাধনার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাকে 'আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ' বলা হয়। আর মুশাহাদাহ্ শব্দে যে ভ্রমণ বুঝায়, তাহা 'আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে ভ্রমণ' নামে অভিহিত। এই দুইটিই খুব মোটা কথা। উহার দৃষ্টান্ত আমাদের অভ্যাস এবং কথাবার্তায় বিদ্যমান আছে। যেমন দেখুন, যে পর্যন্ত তালেবে-এল্‌ম পাঠ্য কিতাব শেষ করে নাই, সে পর্যন্ত তাহার পড়াশুনাকে 'কিতাবের প্রতি ভ্রমণ' বলিতে পারি। আর শেষ করিবার পরে পুনরায় (কিতাবের স্বাদ উপভোগের জন্য এবং জ্ঞান বাড়াইবার জন্য) যদি পড়াশুনা করে, —কেননা, এল্‌ম একটি অতি বিচিত্র স্বাদের জিনিষ—তবে এই পড়াশুনাকে 'কিতাবের মধ্যে ভ্রমণ' বলিব। কিংবা যদি দিল্লী গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তবে তাহার এই দিল্লীর পথ অতিক্রম করাকে 'দিল্লীর প্রতি ভ্রমণ' বলিব। আর সে দিল্লী পৌঁছিয়া তথাকার মনোরম দৃশ্যসমূহ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে, তখন উহাকে 'দিল্লীর মধ্যে ভ্রমণ' বলিব। দেখুন, ইহা কেমন মোটা কথা! এই শব্দগুলিকেই মূর্খ ফকিরগণ সাধারণ লোকের সম্মুখে বর্ণনা করিয়া উহার অর্থের মধ্যে প্যাঁচ লাগাইয়া দেয় এবং

তাসাওফকে হাওয়া বানাইয়া দেয়। কিন্তু দেখুন, কেমন খোলা এবং নির্মল সূক্ষ্ম কথা। বাস্তবিক তাসাওফ এমন সহজ এবং প্রিয় বস্তু যাহা প্রত্যেক লোকের রুচির মধ্যেই স্বভাবগতভাবে বিদ্যমান আছে। খোদা কিন্তু মূর্খ পীরদের ভালই করুন, উহাকে এমন ভয়ানক পোশাকে আবৃত করিয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে ভয় লাগে। মোটকথা, আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ শব্দদ্বয়ের অর্থ এখন আশা করি আপনারা খুব ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন। দিল্লীর প্রতি ভ্রমণ এবং দিল্লীতে ভ্রমণ ইহার খুবই উপযোগী দৃষ্টান্ত। শুধু পার্থক্য এই যে, দিল্লী একটি সীমাবদ্ধ স্থান। কাজেই উহার ভ্রমণও সীমাবদ্ধ হইবে। আর খোদাওয়ান্দ করীমের সত্তা অনন্ত ও অসীম সুতরাং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ সীমাবদ্ধ হইতে পারে না।

نه حسنش غایتے دارد نه سعدی راسخن پایان × بمیرد تشنه مستسقی ودریا هم چنان باقی

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم + و از آنچه گفته ایم و از آنچه شنیده ایم

"তাঁহার সৌন্দর্যেরও সীমা নাই। সা'দীর কথারও শেষ নাই। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে এবং দরিয়া ঠিক তদ্রূপই রহিয়াছে। ওহে খোদা! তুমি কল্পনা, অনুমান, ধারণা ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে এবং যাহাকিছু আমরা বলিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি সবকিছু হইতে ঊর্ধ্বে।"

কবি আরও বলিয়াছেন :

مجلس تمام گشت وبپایان رسید عمر × ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم

"দুনিয়ার মজলিস শেষ হইয়াছে। আয়ু শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। আমরা সেই পূর্বের ন্যায় তোমার গুণানুবাদের প্রথম পর্যায়েই রহিয়া গিয়াছি।" প্রাথমিক অবস্থার কথা এবং খোদার দরবারের কথার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এখানে সবকিছুরই শেষ আছে কিন্তু আল্লাহ্‌র সেখানে শেষ নাই। অতএব, এই পার্থক্যটুকু মনে রাখিয়া দৃষ্টান্ত হইতে আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মোটকথা, এই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে কোন বস্তুর প্রতি ভ্রমণ এবং বস্তুর মধ্যে ভ্রমণের তথ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। এতটুকু কথা আরও স্মরণ রাখিবেন যে, সসীম বস্তুর মধ্যে ভ্রমণ শেষ হইতে পারে কিন্তু অনন্ত ও অসীম বস্তুর মধ্যে ভ্রমণ শেষ হইতে পারে না। এই মর্মেই কবি বলিয়াছেন :

قلم بشکن سیاهی ریز وکاغذ سوز ودم درکش

که حسن این قصهٔ عشق است در دفتر نمی گنجد

"কলম ভাঙ্গিয়া ফেল, কালি ঢালিয়া ফেল, কাগজ পুড়িয়া ফেল এবং ক্ষান্ত হও। কেননা, ইহা এশ্‌কের কাহিনীর সৌন্দর্য। ইহা এক দফতরে সঙ্কুলান হইবে না।"

কারণ এই যে, অসীম অনন্তের সহিত এশ্‌কে হাকীকীর সম্পর্ক। ইহাতে একটুও বাড়াবাড়ি নাই। ইহা এশ্‌কে হাকীকীর কাহিনী, এক দফতরে সঙ্কুলান

হইবে না। এখন আমি আল্লাহ্‌র মধ্যে ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কেননা, উহার তো কোন সীমাই নাই ; বরং আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ সম্বন্ধে বয়ান করিতেছি। কেননা, এই ভ্রমণ সীমাবদ্ধ এবং ইহার জন্যই শেষ সীমা হইতে পারে। আর আমাকে সর্ব শেষ কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে হইবে। অন্য কথায় এরূপ মনে করুন—আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের জন্য মুজাহাদা অর্থাৎ, চেষ্টা ও পরিশ্রম করাকে আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রমণ করা বলে। ইহারই শেষ সীমা বর্ণনা করিতেছি, যাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, আমার অভিযোগ কতটুকু ঠিক। আর দুনিয়ার কোন কাজেই শেষ হওয়ার পূর্বে তৃপ্তি আসে না। অথচ ধর্ম-কর্ম শেষ হওয়ার আগেই তৃপ্তি আসিয়া যায়। এই অভিযোগ তখনই ঠিক হইতে পারে এবং উহা দূর করাও তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন উহার শেষ সীমা সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা যাইবে। এই কারণেই উক্ত শেষ সীমা বর্ণনা করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

॥ দুস্তী বা বন্ধুত্বের শর্ত ॥

যে আয়াতটি এখন তেলাওয়াৎ করা হইয়াছে। উহাতে এই শেষ পর্যায়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, আমি প্রথমে আয়াতটির তরজমা বর্ণনা করিব। অতঃপর সারমর্ম উহা হইতেই বাহির হইবে। অতঃপর যথোপযোগী পরিমাণে উহার ব্যাখ্যা করিব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ ❋

অর্থাৎ, মানুষ অনেক প্রকারের আছে তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের লোকের বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতেই এক প্রকারের লোক এই যে, "কেহ কেহ নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দীর অন্বেষণে বিক্রয় করিয়া ফেলে।" বিক্রয় এমন একটি কার্য যাহার সম্পর্ক দুই বিনিময়ের সহিত হইয়া থাকে।

এক পক্ষ হইতে যখন নিজের নাফ্‌স্‌কে দান করিয়া ফেলা হয়, তখন অপরপক্ষ হইতেও উহার বিনিময় পাওয়া যাইবে। সে বিনিময়ের বিষয়ই পরবর্তী বাক্যে উল্লেখ করা হয় وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ "এবং আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের প্রতি বড়ই দয়ালু।" নির্দিষ্ট কোন বিনিময়ের বর্ণনা করার পরিবর্তে এই কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহার এমন বিনিময় প্রদান করা হইবে যাহা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীর শানের উপযোগী হইবে। رافة শব্দের অর্থ অত্যধিক মেহেরবানী। আল্লাহ্‌র রহমত সামান্য পরিমাণ হইলেও তাহা প্রচুর! অত্যধিক হইলে তাহার তো কথাই নাই। عباد বলিতে হয়ত নির্দিষ্ট প্রকারের বান্দা উদ্দেশ্য। তখন অর্থ এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বান্দাগণের সহিত অত্যধিক রহমত ও

মেহেরবানীর ব্যবহার করিবেন। আর যদি العباد বলিতে সাধারণ ভাবে সমস্ত বান্দাই উদ্দেশ্য, বলা বাহুল্য ইহাতেও সেই পূর্বোক্ত অর্থই দাঁড়াইবে। কেননা, তখন তরজমা এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণতঃ সমস্ত বান্দার প্রতিই মেহেরবান। ইহাতে অবধারিতরূপে এই অর্থ বাহির হয় যে, এই শ্রেণীর খাছ বান্দাগণের সহিত তো উত্তমরূপেই মেহেরবানীর ব্যবহার করিবেন। বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে নিজের নাফ্‌স্ বিক্রেতাগণকে বিনিময়ে এমন বস্তু প্রদান করা হইবে যাহার সহিত বান্দার কাজের কোনই সামঞ্জস্য নাই। আবার কি বিনিময় দান করিবেন তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই; বরং এখানে এতটুকু বলা ঠিক হইবে যে, পরিষ্কার করিয়া না বলার কারণ হইল সেই বিনিময়টি বুঝে আসার মত বস্তু নহে। ইহার বর্ণনা কি করা যাইবে? অতএব, উভয় বিনিময়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্যই হইবে না। এসম্পর্কে কবি বলিয়াছেন :

جمادے چند دادم وجاں خریدم × بنام ایزد عجب ارزاں خریدم

"কয়েক খণ্ড প্রস্তর দান করিয়া জান্ খরিদ করিয়াছি, আল্লাহ্‌র কসম, আশ্চর্যজনক সস্তায় খরিদ করিয়াছি।" আর এক কবি বলিয়াছেন :

متاع جان جاناں جان دینے پر بھی سستی ہے

"সমস্ত প্রাণসমূহের প্রাণের মূলধন জান্ দিয়া খরিদ করিলেও সস্তাই পাওয়া গেল বলিতে হইবে।" এই জান্ বাস্তবিকই উহার সম্মুখে এক খণ্ড মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা। উপরোক্ত বয়েতের বর্ণিত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সত্য :

جمادے چند دادم وجاں خریدم × بنام ایزد عجب ارزاں خریدم
خود کہ یابد ایں چنیں بازار را × کہ بیک گل می خری گلزار را

প্রথম বয়েতটির তরজমা একটু আগেই করা হইয়াছে, দ্বিতীয়টির তরজমা এই— "এমন সুন্দর বাজার কে পায় যেখানে একটি ফুলের বিনিময়ে গোটা ফুলের বাগিচা খরিদ করিতে পারা যায়?" কবি আরও বলেন :

نیم جاں بستاند وصد جاں دہد + آنکہ در وہمت نیاید آں دہد

"অর্ধ জান গ্রহণ করে এবং শত জান্ দান করে। যাহা তোমার কল্পনায়ও আসিবে না এমন বিনিময় প্রদান করে।"

আল্লাহ্‌র দান যখন এইরূপ, তখন বান্দার তরফ হইতে জান্ সমর্পণে কোন ইতস্তত: করা কি উচিত? আল্লাহ্‌র সম্মুখে সমর্পণ করায় তো কি ইতস্তত: হইবে! আল্লাহ্‌ওয়ালাদের হাতে সমর্পণ করা সম্বন্ধে কবি বলেন :

ہمچوں اسمعیل پیشش سر بنہ + شاد وخنداں پیش تیغش جاں بدہ

"ইস্‌মায়ীলের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে মস্তক রাখ, সন্তুষ্ট চিত্তে ও হাসিমুখে তাঁহার তরবারির সম্মুখে প্রাণ দাও, বিশেষত: সমস্ত বস্তুর উপর তো আল্লাহ্ তা'আলার

মালিকানা এবং স্বষ্টিকর্তার সত্ব রহিয়াছে। অতঃপর যদি কেহ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিল, তবে এমন কি এহ্‌সান করিল, জান তো তাঁহারই ছিল :

آنکه جاں بخشد اگر بکشد رواست

"যিনি প্রাণ দান করেন, তিনি যদি হত্যা করেন, তবে অসঙ্গত হইবে না।"

দেখা যায়, তুনিয়ার কোন মাহবূব কিংবা হাকিমের নিকট প্রাণ এবং সম্মানের কোন মূল্যই উপলব্ধি করা হয় না, অনুগত তাহাকেই মনে করা হয়, যে ব্যক্তি হুকুম তামিল করার সম্মুখে কোন বস্তুরই পরোয়া করে না। সিপাহী বাদশাহের নির্দেশে প্রাণ দান করে। একজন বেশ্যা বা বাজারী স্ত্রীলোকের প্রেমে মানুষ মান-ইয্‌যত ভুলিয়া যায়। জান্ মাল এবং মান-ইয্‌যৎ সবকিছুই উৎসর্গ করিয়া দেয়। অতএব, মাহবূবে হাকীকীর সম্মুখে এসমস্ত বস্তু উৎসর্গ না করিয়া যদি নিজের কাছে জমা রাখিয়া দেয়, তবে সে কি কাজের মানুষ ? সাধারণ মহব্বতেও এসমস্ত বস্তুর পরোয়া করা মরুওয়াতের খেলাফ।

একজন বুযুর্গ বলিয়াছেন, যদি কোন দোস্তের নিকট কর্জ চাহিলে সে জিজ্ঞাসা করে, কত ? তবে সে ব্যক্তি দোস্তের উপযুক্ত নহে। বন্ধুত্বের উপযুক্ত সে ব্যক্তিই যে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র নিজের সমস্ত ধন-দৌলত আনিয়া বন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত করে।

প্রাচীনকালের মানুষ ছিল কেমন ধরনের। তেমন দোস্তের অস্তিত্ব আজকাল কোথায় ? এক ব্যক্তির ঘটনা—নিজের বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রিকালে যাইয়া তাহাকে ডাকিল, পাঁচ মিনিট পরে সে ঘর হইতে বাহির হইল। এতটুকু বিলম্ব বাহ্য দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের খেলাফ ছিল। কিন্তু যে অবস্থায় সে ঘর হইতে বাহির হইল, তাহাতে বিলম্ব হওয়া অনিবার্য ছিল। সেই অবস্থাটি এই—বন্ধু স্বয়ং অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত, সম্মুখে সুন্দরী বাঁদী রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিতা এবং তাহার হাতে প্রদীপ, আর একটি গোলামও পাছে পাছে, তাহার কাঁধে কিছু বোঝা। আগন্তক এই ঝামেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

বন্ধু বলিল : "এরূপ সময়ে তোমার আগমনে আমার মনে কয়েকটি সম্ভাবনার উদয় হইয়াছে। একটি এই যে, হয়ত কোন সুন্দরী রমণী কাছে না থাকায় তুমি নির্জনে ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছিলে। সেজন্য এই বাঁদী তোমার সম্মুখে হাজির, অথবা হয়ত চাকরের প্রয়োজন হইয়াছে, তজ্জন্য এই গোলাম হাজির, আর যদি কোন শত্রু তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়া থাকে, তবে আমি আমার প্রাণ লইয়া উপস্থিত, কিংবা সম্ভবতঃ তোমার কিছু টাকা-পয়সার প্রয়োজন হইয়াছে, তবে এই স্বর্ণ-মুদ্রার থলিয়া প্রস্তুত।" আগন্তুক বলিল, আমার কিছুরই দরকার নাই। এই সমস্ত বস্তু আপনার জন্যই মঙ্গলজনক। এখন হঠাৎ আপনার চেহারা আমার মনে পড়িয়া যাওয়ায় আমি এমন অস্থির হইয়া পড়িলাম যে, আপনাকে একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এখন যান, আরাম করুন। দুই বন্ধুই আদর্শ বন্ধু ছিলেন। যেমন ছিলেন ইনি, তেমন ছিলেন তিনি। দুনিয়াদারদের মধ্যে ইহার তুলনা পাওয়া যাওয়া কি সম্ভব? আজকাল লোকে রসম বা প্রথা পালন করাকে মহব্বৎ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ বলিয়া থাকে। উপরোক্ত দুই বন্ধুর মধ্যে যেই ভাব দেখা গেল—তাহা কোন প্রথাধারী বন্ধুর ভাগ্যে জুটিতে পারে কি? কিংবা উক্ত দুই বন্ধুর মধ্যে এমন বন্ধুত্ব কি প্রথা পালনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে? মোটকথা, বন্ধুত্বের শর্ত এই যে, এরূপ বলা উচিত নহে, কি চাই? বরং ডাকা মাত্র কিছু না বলিয়া জানে মালে হাজির হইবে।

যখন পার্থিব বন্ধুর সহিত মহব্বতের এই দাবী, তখন খোদা তা'আলার সহিত সম্পর্কের দাবী কি হওয়া উচিত তাহা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মাহ্‌বুব মনে কর এবং তাঁহা হইতে জান, মাল এবং ইয্‌যতকে রক্ষা করা কখনও সমীচীন মনে করিও না:

এবং এরূপ করিও না: گر جان طلبی مضائقہ نیست + ورزر طلبی سخن درین است

"যদি জান্ চাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি টাকা-পয়সা চাও, তবে তাহাতে কথা আছে।"

॥ খোদার সহিত কার্পণ্য ॥

খোদা তা'আলার সহিত কৃপণতা করিও না। তাহা হইলে উহা তোমার নিজের সঙ্গে করা হইবে। কেননা, খোদার কোন বস্তুর অভাব নাই। তিনি তোমাদের দ্বারা যাহাকিছু ব্যয় করান তাহা তোমাদেরই হিতের জন্য। খোদা তা'আলার সহিত নিখুঁত এশ্‌কের ব্যবহার করা উচিত। এমন ব্যবহার নহে, যেমন কোন কৃপণ হইতে তাহার বন্ধু কিছু চাহিলে সে উত্তর দিয়াছিল, বন্ধুত্ব পবিত্র থাকুক, লেন-দেনের মুখে ছাই মাটি। তোমার আমার মধ্যে মহব্বৎ আছে তাহাই ভাল। লেন-দেন করিলে বিবাদ বাধিবে। এক কৃপণের ঘটনা—তাহার এক বন্ধু তাহাকে বলিল: আপনার স্মৃতিচিহ্নের জন্য আপনার এই আংটি আমাকে দিয়া দিন, উহা দেখিলেই যেন আপনার কথা স্মরণ হয়। সে বলিল: এত ঝামেলার কি প্রয়োজন? স্মরণ করার জন্য তো ইহাই যথেষ্ট যে, যখন তুমি নিজের অঙ্গুলি শূন্য দেখিবে তখনই আমার স্মরণ হইবে এবং মনে করিবে, আংটি চাহিয়াছিলাম দেয় নাই।

খোদার সম্মুখে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেও কোন ছল-চাতুরি করা উচিত নহে। জান খরচ করার বেলায়ও খোদার সম্মুখে চোর সাজা উচিত নহে।

যেমন, এক চাকরের ঘটনা. সে বড়ই কর্মবিমুখ ছিল। যখনই কোন কাজের আদেশ করা হইত, তখন এমন উপায় বাহির করিত যাহাতে কাজ করিতে না হয়। যেমন, এক দিন মনিব তাহাকে বলিল, একটু উঠানে বাহির হইয়া দেখ তো বৃষ্টি হইতেছে কি না। সে বলিল, হুযুর! বৃষ্টি হইতেছে। মনিব বলিল, তুমি বাহিরে তো যাও নাই

কেমন করিয়া বুঝিলে যে, বৃষ্টি হইতেছে ? সে বলিল, হুযুর এখনই বাহির হইতে একটি বিড়াল ঘরে ঢুকিয়াছে, দেখিলাম বিড়ালটি ভিজা। তাহাতেই বুঝিলাম যে, বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। (ইহাই ভিজা বিড়ালের কাহিনী) অতঃপর মনিব বলিল, প্রদীপ নিভাইয়া দাও। সে বলিল, হুযুর মুখ ঢাকিয়া লউন। চক্ষু বন্ধ করিলেই চক্ষের সামনে সবকিছু অন্ধকার দেখিবেন। দুনিয়াতে যাহাই হউক না কেন, হইতে দিন। বলিল : আচ্ছা, কপাট বন্ধ করিয়া দাও। সে বলিল : আমি দুনিয়ার সব কাজ করার জন্য আপনার চাকুরী গ্রহণ করি নাই। দুই কাজ আমি করিয়াছি। একটি কাজ আপনি করিয়া লউন।

কোন কোন বন্ধুও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং বন্ধুর কোন কাজেই আসেন না। আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গেও কি এরূপ ব্যবহার করা যথেষ্ট যে, তিনি কিছু খরচ করিতে বলিলে সেই কৃপণের ন্যায় বলিয়া দিবে—আমাকে এইরূপে স্মরণ করিয়া লইও যে, অমুক ব্যক্তি কৃপণতা করিয়াছে এবং দান করে নাই। মালের হক সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা যেই নির্দেশ দিয়াছেন তাহাকে প্রকৃত পক্ষে এরূপই তো করা হইতেছে। সেই কৃপণের কাহিনী শুনিয়া তো আমরা হাসিতেছি, অথচ নিজেরা সেইরূপই করিতেছি ; বরং এতটুকু পার্থক্যও আছে যে, সে তো এমন ব্যক্তিকে এরূপ জবাব দিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহার সমকক্ষ ছিল এবং তাহার নিকট তাহারই মাল চাহিয়াছিল। আর এখানে মালের হক আদায় না করায় এমন সত্তাকে তদ্রূপ জবাব দেওয়া হয় যিনি আমাদের সমান নহেন। আমরা বান্দা এবং তিনি খোদা। কৃপণতার দিকে দৃষ্টি না করিয়া শুধু এতটুকু সম্পর্কের দিকেই দৃষ্টি করুন, কত বড় বেআদবি। যদি একজন বিরাট বাদশাহ্ নগণ্য কোন মেথর বা মালীর কাছে কিছু চায় এবং সে তাঁহাকে এরূপ রুক্ষ জবাব দিয়া দেয়, তবে বাদশাহ্র কত বড় অপমান হইবে ? আর ইহা মালীর পক্ষে কত বড় দুঃসাহসিকতা। তদুপরি যে মাল আল্লাহ্ তা'আলা চান তাহা কাহারও বাবার নহে, স্বয়ং তাহারই মাল। তাহার নিষেধ করিবার বা ধরিয়া রাখিবার কি অধিকার আছে ?

আমাদের ব্যবহারে এই দুইটি বিষয় সেই কৃপণের ঘটনা অপেক্ষা অধিক আছে। ইহার উপর আল্লাহ্র সহিত মহব্বতের দাবী করা কেমন স্থানোপযোগী ? খোদার মহব্বতে মালের চিন্তা ; এইরূপে অন্যান্য হকের ব্যাপারে খোদার মহব্বতের দাবী এবং ইয্যৎ কিংবা জানের খেয়াল; ইহাই তো দোষ যাহা একেবারে সর্বনাশ করিয়া দিয়াছে। জানা আছে অমুক রসম খারাপ ; কিন্তু তবুও করিতেছি এবং বলিয়া থাকি, শরীয়তের কথা ঠিকই কিন্তু সমকক্ষ শ্রেণীর লোকদের নিকট হেয় হইতে হইবে। জনাব ! কেমন সমকক্ষ এবং কেমন হেয়তা :

نیاز د عشق را کنج سلامت + خوشا رسوائی کوئے ملامت

"এশ্‌কের জন্য শাস্তির কোণ শোভনীয় নহে। সালামত ও তিরস্কারের গলিতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া তাহার পক্ষে আনন্দদায়ক।"

॥ আশেকের ধর্ম ॥

আশেকের মধ্যে তিরস্কার কোনই ক্রিয়া করিতে পারে না ; বরং সে তো তিরস্কারে আরও আনন্দ পায়। তিরস্কারের ভয় করিলে তো বুঝিতে হইবে যে, এশ্‌কের বাতাসও লাগে নাই। এই মর্মেই কবি বলিয়াছেন :

در ره منزل لیلے که خطرهاست بجاں + شرط اول قدم آنست که مجنوں باشی

"লায়লার বাড়ীর পথে জানের উপর অনেক বিপদ আছে ; সেদিকে প্রথম পদক্ষেপের শর্ত এই যে, মজ্‌নু হইতে হইবে।" মজ্‌নু অর্থাৎ, আশেক হইলে আর কোনই ভয় থাকে না। আশেকের উপর কি প্রতিক্রিয়া হইবে যে, সে অপরের ন্যায় হইয়া যাইবে? 'সে তো অপরকে নিজের মত করিয়া লইতে চায়। যেমন সে পরামর্শ দিয়া বলে :

مصلحت دید من آنست که یاران همه کار + بگزرانند وخم طرۂ یارے گیرند

"আমি তো ইহাতেই মছলেহাৎ মনে করি যে, বন্ধুরা সকলে কাজ-কর্ম ছাড়িয়া কোন মা'শুকের যুল্‌ফের প্যাঁচ অবলম্বন করুক।" এশ্‌কের সামান্য একটু বাতাস লাগিলে কোনই মছলেহাৎ এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ থাকে না এবং মানুষ নিজের ইয্‌যৎ, প্রাণ, ধন-দৌলত সবকিছুই মাহবূবের সম্মুখে রাখিয়া দেয়। সে যদি তৎসমুদয় কবুল করিয়া লয়, তবে আশেক নিজকে অনুগৃহীত মনে করে। যাহাদের গায়ে এশ্‌কের বাতাসও লাগে নাই, তাহারা মছলেহাৎ এবং পলিসি লইয়া বেড়ায়। মছলেহাৎ ও পলিসির দরকার সেখানেই হয় যেখানে দুই বিপরীত পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। তখন ইহাকেও রাযী করিতে হয়, উহাকেও রাযী করিতে হয়। অতএব, এদিকেরও কিছু বলিতে হয় ওদিকেরও কিছু বলিতে হয়। আর আশেক হইলে, ব্যস এক জনকে গ্রহণ কর এবং সকলকে ত্যাগ কর। সেই একজনের সম্মুখে আর কাহারও কোন পরোয়া নাই। আশেকের আবার পরোয়া কি? আশেকের ধর্ম তো এইরূপ হইবে :

گرچه بدنامی ست نزد عاقلاں × ما نمی خواهیم ننگ ونام را

"যদিও জ্ঞানবানদের নিকট আমাদের দুর্নাম আছে, কিন্তু আমরা ইয্‌যত ও সুনামের প্রত্যাশী নই।" সাধারণ এশ্‌কের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে। আর যাহারা খোদার নাম যেক্‌র করে তাহাদের নিকট তো দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থিত সব কিছুই, কিছুই নহে। কিসের ইয্‌যত এবং কিসের সুনাম। আল্লাহ্‌র কসম সবকিছুই হাওয়া হইয়া যায়।

মাওলানা রুমী বলেন :

اے دوائے نخوت وناموس ما + اے تو افلاطون وجالینوس ما

"হে আমাদের অহংকার ও ইয্যতের ঔষধ। তুমি আমাদের আফ্লাতুন, তুমি আমাদের জালীনূস।" অহংকার এবং আত্মসম্মানবোধকে তো এই মহব্বৎ ফুঁ মারিয়া উড়াইয়া দেয়। উহাদের তো নাম-চিহ্নও থাকে না। এশ্কের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এই মছলেহাতের চিন্তা হইতে পারে না যে, হেট হইতে হইবে। আশেকের দৃষ্টি একমাত্র মা'শুকের উপরই থাকে, অপর কেহ তাহার দৃষ্টির সম্মুখে থাকেই না, যাহার সামনে হেট হইতে হইবে।

॥ বেহেশ্তের সদায় ॥

অতএব, খোদার নাম যখন লইয়াছ তখন তাঁহারই হইয়া থাক। তাঁহা হইতে পৃথক অবস্থায় কোন বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিও না। জান, মাল, ইযযৎ সবকিছু তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়া দাও। কি আশ্চর্যের কথা খোদার তরফ হইতে প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে:

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে বেহেশ্ত খরিদ করিয়াছি এবং উহার মূল্য স্বরূপ দিয়াছি আমাদের জান এবং মাল এবং আমরা বেহেশ্তের খরিদ্দার হইয়াছি। কিন্তু ইহা খুব ভাল খরিদ্দারী। সদায় লইয়াছি, কিন্তু দাম 'নাদারাদ'। বেহেশ্ত ইত্যাদি লওয়ার জন্য সকলেই সর্বক্ষণ এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে যে, যদি ডাকিয়া বলা হয় যে, বল, বেহেশ্ত কে কে খরিদ করিয়াছ? তখন সকলের আগে আমরাই বলিয়া উঠিব, 'আমরা'। আর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, দাম দিয়াছ কি? তখন আর কাহারও মুখে উত্তর থাকিবে না। একটু ইন্সাফ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদিগ হইতে কি খরিদ করিয়াছেন? নিজের জিনিসই। কেননা, কোন্ জিনিসটি তোমাদের আছে যে, তোমরা বিনিময় স্বরূপ দান করিতেছ? সমস্ত জিনিস তো তাঁহারই। শুধু কাল্পনিক বেচা-কিনি এবং তোমাদের মন খুশী করার জন্য ক্রয় নাম দিয়াছেন।

যে সমস্ত বস্তুকে আমরা নিজেদের বলিয়া থাকি উহার স্বরূপ এই যে, যেমন 'চারপায়ী' বা চৌকি বানাইয়া নিজেরই স্বত্বাধীনে রাখিয়া বলিলাম, ইহা নান্না মিঞার, ইহা মান্না মিঞার (দুই পুত্র)। ইহা কি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের? ইহা তো তাহাদের বাবার। অতএব, দুনিয়ার ধন-দৌলত এবং মাল-আস্বাব এইরূপেই আমাদের করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, শুধু উহাদের সহিত আমাদের নাম যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন, শিশুদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা 'নান্নার', 'ইহা মান্নার'। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বস্তুসমূহের মধ্য হইতে কোন কোনটির সহিত আমাদের নাম

যোগ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, এই বস্তুটি কি বিক্রয় করিবে? অথচ এখন উভয় বিনিময়ের বস্তু তাঁহারই। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন ত, উদ্দেশ্য কি? সে সমস্ত বস্তু যাহা আমাদের নামের সহিত যোগ করিয়াছেন, তাহা তো নেনই নাই, অধিকন্তু এই উপায়ে আরও জিনিস দান করিলেন। কেননা, এসমস্ত জিনিস নেওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি এগুলি দিয়া কি করিবেন? তিনি কি জান-মালের আচার তৈয়ার করিবেন? আর তাহাদের জান-মাল চাওয়ার এই অর্থ নহে যে, তিনি মানুষের আত্মত্যাগ চাহেন কিংবা তাহাদিগকে মাল হইতে পৃথক করিতে চাহেন। অর্থাৎ, তোমরা একেবারে নিঃস্ব হইয়া বস; বরং শুধু এতটুকু চাহেন যে, কিছু সীমা নির্ধারিত আছে, উহার মধ্যে তোমরা থাক। মুক্ত স্বভাব হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া ফেলিও না। শান্তি এবং সুখ উপভোগেয় বস্তুসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার নামে দান কর। পুনরায় ইহাও তোমাদিগকেই দিয়া দেওয়া হইবে।

যেমন, কোন শরীফ লোক বিবাহ শাদীতে এক টাকা সালামী লইয়া দুই টাকা প্রদান করেন। এরূপ শরীফ লোকের সম্মুখে এক টাকা সালামী দিতে কার্পণ্য করা নিজেরই ক্ষতি করা। দিবার সময় তো মাত্র এক টাকা তহ্‌বীল হইতে যায়। কোন সংকীর্ণমনা লোক যদি লোভের বশবর্তী হইয়া এই একটি টাকা দিতে হাত সঙ্কুচিত করিয়া লয়, তবে তাহা আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার বদান্যতার কথা অবগত আছে এবং এই এক টাকা দেওয়ার পরিণাম জানে, সে এক টাকা দিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবে না; বরং উহাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিবে। এক টাকা দিয়া মনে মনে এই ভাবিয়া খুশী হইবে যে, এই এক টাকা আরও এক টাকা সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গেও ঠিক এই ব্যাপার। এখন তিনি মানুষের জান-মাল অর্থাৎ, তাহাদের উপভোগের দ্রব্যাদির খরিদ্‌দার হইতেছেন। কিন্তু যত তিনি গ্রহণ করিতেছেন উহার দ্বিগুণ নহে, বরং বহু বহু গুণ অর্থাৎ, সহস্র সহস্র গুণ অধিক প্রদান করিবেন। মহব্বতের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দেখা যায় যে, আশেক ব্যক্তি দুঃখে-কষ্টে মরিয়া যাইতেছে:

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق × ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

نیم جان بستاند وصدجان دهد + آنکه در وهمت نیاید آن دهد

"যাহার হৃদয় এশ্‌কের দ্বারা যেন্দা হইয়াছে সে কখনও মরে না। আমার স্থায়ী জগতের দফতরে তাহার নাম স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা মহব্বতের ক্ষেত্রে মানুষের অর্ধেক প্রাণ গ্রহণ করেন, কিন্তু তৎবিনিময়ে তিনি তাহাকে শত শত জান দান করেন। যাহা তুমি কখন কল্পনাও কর নাই তাহা দান করেন।"

ফলকথা, এই বিক্রয় করাও ফরয। প্রকৃতপক্ষে তাহা দানই দান। যাহা হউক, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে বলিতেছেন—কতক লোক এমনও আছে যাহারা

আল্লাহ্ তা'আলার সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের জান-মাল বিক্রয় করে এবং উহার মূল্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের প্রতি খুবই মেহেরবান।

॥ তাসাওউফের রূপ ॥

তরজমা আপনারা শ্রবণ করিলেন। এখন আমি বলিতেছি, সেই সর্বশেষ পর্যায়টুকু কি, যাহা আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে? উহা আমি একটু বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করিব। এই মাস্‌আলাটি তরীকতের। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদগণ অধিকাংশ মোকামে অর্থাৎ, বাতেনী আ'মলসমূহে তরতীব অর্থাৎ, পর্যায়ক্রমিকতার বিধান করিয়াছেন। উক্ত মোকামসমূহের দৃষ্টান্ত পাঠ্য কিতাবের সবকের মতই। কোন কোন সবক এমনও আছে যে, উহাতে এবং অন্যান্য সবকে তরতীব রক্ষা করা জরূরী। যেমন 'আলিফ্-বে' এবং সিপারা। অর্থাৎ, এরূপ কখনও সম্ভব নহে যে, 'আলিফ-বে'কে সিপারার উপর অগ্রবর্তী করা না হয়। আর কতক সবক এমন আছে যে, কয়েক প্রকার হইতে পারে। যেমন, কাফিয়া এবং কুত্‌বী। মানুষ যেহেতু এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক হইয়া গিয়াছে। অতএব, নিয়ম-প্রণালী কিছুই জানে না। যে প্রণালী বুঝে আসে তাহাই অবলম্বন করিয়া লয় এবং দীর্ঘ দিন ধরিয়া পেরেশান ও অস্থির থাকে, কিছুই হাছিল হয় না।

যেমন, কোন ব্যক্তি ইহা জানে না যে, আগে আলিফ্-বে পড়িয়া পরে সিপারা পড়িতে হয়। সে যদি আলিফ-বে না পড়িয়াই সিপারা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং নিজের আয়ুর এক অংশ উহাতে কাটাইয়া দেয়, সে ব্যক্তি সিপারা পড়ায় যথোচিত সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তরতীবের সহিত পড়ে তাহার এত পরিশ্রমও করিতে হইবে না, দীর্ঘ সময়ও ব্যয় হইবে না এবং সফলতাও লাভ করিতে পারিবে। প্রথমোক্ত লোকটির নিকট সিপারা এত কঠিন বস্তু যে, উহা পড়িতে সময়ও ব্যয় হইল অনেক এবং মস্তিষ্কও শূন্য হইয়া গেল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট সিপারা পড়া কোনই মুশ্‌কিল নহে। আরামের সহিত পড়িয়াছে এবং সময়ও বেশী লাগে নাই, মনের মতন সফলতাও লাভ করিয়াছে। এই প্রণালীই ভাল, না প্রথম ব্যক্তির প্রণালী ভাল? তাসাওউফ শিক্ষা করা মুশ্‌কিল হওয়ার ইহাই মূল কারণ। অন্যথায় তাসাওউফ খুবই সহজ। যদি আগ্রহ থাকে তবে উহার প্রণালী শিখিয়া লউন। প্রত্যেক কার্য নিয়ম-প্রণালী দ্বারাই ঠিক হইয়া থাকে। বে-নিয়মে চলিলে অস্থিরতা পেরেশানী ভিন্ন আর কিছুই হাছিল হয় না। সেই প্রণালী তত্ত্বজ্ঞানী পীরগণই অবগত আছেন। অতএব, সেই নিয়ম প্রণালী মানিয়া চলাই যেন সঠিক পন্থা।

কবি বলেন :

گر هوائے این سفر داری دلا + دامن رهبر بگیر و پس بیا
در ارادت باش صادق اے فرید + تا بیابی گنج عرفان را کلید

গর হাওয়ায়ে ইঁ সফর দারী দেলা + দামানে রহ্‌বর বগির ও পস্‌ বিয়া
দর এরাদত বাশ ছাদেক আয় ফরীদ + তা বয়াবী গঞ্জ এরফাঁ রা কলীদ।

"হে মন! যদি এই সফরের ইচ্ছা রাখ, তবে কোন পথ প্রদর্শকের আঁচল ধর এবং তাঁহার অনুগমন কর, সংকল্পে অকপট হও, হে-ফরিদ! তবেই মা'রেফাতের ভাণ্ডারের চাবি প্রাপ্ত হইবে।" আরও বলিয়াছেন :

بے رفیقے هر که شد در راه عشق + عمر بگذاشت و نه شد آگاه عشق

"বে রফীকে হারকে শুদ্‌ দর রাহে এশ্‌ক + ওমর বগুজাশ্‌ত ও না শুদ আগাহে এশ্‌ক"

এশ্‌কের পথে যে ব্যক্তি বন্ধুহীন হইয়াছে তাহার সমস্ত আয়ু নিঃশেষ হইয়াছে কিন্তু এশ্‌কের কিছুই জানিতে পারে নাই।" অতএব, কাহারও সাহচর্য অবলম্বন কর এবং নিজেকে তাঁহার হাতে সপর্দ করিয়া দাও :

پیر خود را حاکم مطلق شناس + تا براه فقر گردی حق شناس
چون گزیدی پیر هم تسلیم شو + همچون موسی زیر حکم خضر رو
صبر کن در راه خضر اے بے نفاق + تا نگوید خضر رو هذا فراق

"নিজের পীরকে সকল সময় সকল অবস্থায় তোমার উপর হুকুমকারী বলিয়া জান, তাহা হইলে ফকীরীর পথে সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারিবে। পীর গ্রহণের পর নিজকে তাঁহার হাতে সপর্দ করিয়া দাও। মূসার (আঃ) ন্যায় খেযেরের (আঃ) আজ্ঞাধীন হইয়া চল। অকপট মনে খেযেরের পথে ছবর কর। খেযের যেন বলিতে না পারেন, 'চলিয়া যাও—ইহাই তোমার ও আমার বিচ্ছেদ'।"

॥ তাসাওউফের কুঞ্জী ॥

কিন্তু পীরকে প্রথমে যাচাই করিয়া লও। সকলের সাহচর্য অবলম্বন করিও না। এই দলে ডাকাত অনেক আছে। পীর কামেল হওয়া চাই। সুন্নত পালনকারী হওয়া চাই। শয়তানের অনুগামী যেন না হয়। নিজেও কামেল হয় অপরকেও কামেল বানাইবার ক্ষমতা থাকে। বাহিরের ও ভিতরের গুণাবলীতে সমভাবে গুণান্বিত হয়। তাহার ভিতর এবং বাহির কোনটিই যেন শরীয়তের বিপরীত না হয়। খুব যাঁচাই করিয়া লইবে। উহাতে তাড়াহুড়া করিবে না। পীর নির্ণয়ে যত বিলম্ব হইবে ততই লাভ অধিক হইবে। তদ্রূপ কামেলপীর পাইলে মনে-প্রাণে সম্পূর্ণরূপে নিজকে তাঁহার হাতে সপর্দ করিয়া দাও। আর তিনি যাহাকিছু বলেন, উহাকে সঠিক মনে করিবে, উহাতে কোন সন্দেহ করিবে না। তাহার হুকুমকে খোদার হুকুম মনে করিও। ইহা পীর পূজা নহে। তিনি খোদাও নহেন; বরং এই জন্য বলা হয় যে, তিনি যাহাকিছু

শিখান বা বলেন, তাহা খোদা ও রাসূলেরই হুকুম। সবকিছুই কোরআন এবং হাদীসের অনুরূপ।

কোরআন ও হাদীস তাসাওউফে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাসাওউফের প্রত্যেকটি মাস্আলা কোরআন ও হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা আমাদের বুঝের ত্রুটি, আমরা বুঝিতে পারি নাই। যেমন দেখুন, এই ধর্মের শেষ পর্যায়ের মাস্আলাটি কি? তাহা এই আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা আমি এখন বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই আয়াতটিকে সদাসর্বদা তেলাওয়াত করিয়াছি। কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ্ওয়ালাগণ বলিয়া দেন নাই, সে পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই যে, এই আয়াতে এই মাস্আলাটি রহিয়াছে। এই সমস্ত এল্ম কোরআন এবং হাদীস শরীফে বিদ্যমান কিন্তু তালাবদ্ধ। হাযারাত আল্লাহ্ওয়ালাগণের হাতে উহার চাবি। তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত সামান্য কথাও জানা সম্ভব নহে। তাঁহাদের অনুগ্রহ হইলে বড় হইতে বড় বিষয়ও সাধারণ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক অংশে তাসাওউফ দেখা যায়। এখন তো অবস্থা এইরূপ:

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش + من از رفتار پایت می شناسم

"তুমি যে রং-এর জামা ইচ্ছা, পরিধান কর। আমি তোমার পদক্ষেপেই তোমাকে চিনিয়া ফেলিব।" বরং ইহার চেয়ে আরও বাড়াইয়া বলা যায়:

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش × من انداز قدت را می شناسم

"... ... ..., আমি তোমার দেহের গঠন পরিমাণ চিনি।" এখন তো প্রত্যেক আয়াতে এবং প্রত্যেক হাদীসে দৃষ্টিগোচর হয় যে, এখানে তাসাওউফের অমুক কথা আছে, এখানে অমুক কথা আছে। ইহা সেই মহাপুরুষগণেরই দয়া। ইহাতে আমার কোন কামালিয়ৎ নাই। আমি এখানেও তাঁহাদের বাণী নকল করিতেছি।

॥ আজকালের তাসাওউফ ॥

অতএব, এবিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে যে, তরীকতের সর্বশেষ পর্যায়ের মোকাম কি? তরীকতের মধ্যে যেহেতু বহু মোকাম রহিয়াছে, আমাকে উহারই সর্বশেষ মোকাম সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে হইবে। অতএব, সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইতেছে, মোকাম শব্দের অর্থ-ই বর্ণনা করা। কেননা, এখান হইতেই নানাপ্রকারের ভুলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আজকাল তাসাওউফ সম্বন্ধে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এমন বিকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, কয়েকটি বৈচিত্রময় এবং সাধ্যাতীত বোঝার সমষ্টির নাম তাসাওউফ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে তাসাওউফের নাম শুনিয়া লোকে ভয় পায় এবং এই কারণেই শরীয়ত হইতে উহাকে পৃথক করা হয়। কেননা, শরীয়তের ব্যাপক এবং প্রথম মূলনীতি এই যে, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে উহার

সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট প্রদান করেন না।" আর বিকৃত তাসাওউফের আবিষ্কারকগণের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে—'সাধ্যাতীত'। তবে শরীয়ত এবং তাসাওউফ এক কেমন করিয়া হইতে পারে ? যেমন অনেকেরই ধারণা তাসাওউফের স্বরূপ এই যে, স্ত্রী পুত্র বাড়ী-ঘর এবং সহায়-সম্পত্তি সবকিছু ছাড়িয়া নির্জনতা অবলম্বন কর। তৎপর তরীকতের পথে পা রাখিও। (মানুষ তাসাওউফকে 'হাও' বানাইয়া রাখিয়াছে। যাহাতে লোকে ইহাকে দুর হইতে ভয় পায়।) অতএব, যাহাকেই তাহারা দেখিতে পায় যে, ইনি স্ত্রীও রাখিয়াছেন, থাকার জন্য বাড়ীও রাখিতেছেন। এরূপ লোককে সূফী মনে করে না ; বরং বলে, এই ব্যক্তি দুনিয়াদার। এরূপ লোককে পীর বলিয়া গ্রহণ করা তো দুরের কথা একান্ত নিম্নস্তরেরও গণ্য করে না। অথচ কোন তত্ত্বজ্ঞানী ও সুন্নতের পাবন্দ ছুফী কখনও এরূপ বলিতে পারেন না। কেননা, শরীয়তের নির্দেশ ইহার বিপরীত। যেমন, সংসার ত্যাগী হইতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে এবং থাকিবার জন্য ঘর রাখিতেও অনুমতি দিয়াছে। প্রাচীনকালের আউলিয়ায়ে কেরামের অনেকেই বাসগৃহ রাখিয়াছেন। বাড়ী তো বাড়ী, গ্রাম খরিদ করিতেও এবং তাহাও একখানি নহে বহু গ্রাম খরিদ করিতে এবং স্ত্রী একজন নহে, চারিজন পর্যন্ত রাখিতেও তত্ত্বজ্ঞানীরা নিষেধ করেন নাই। কোন ছুফীও আজ পর্যন্ত তাহা নিষেধ করেন নাই। তরীকতের কোন হালের প্রাবল্য বশতঃ নিজে ত্যাগ করা অন্য কথা। অনেক আল্লাহ্‌ওয়ালা মহাপুরুষ তাহাও করিয়াছেন এবং নাফসের সঙ্গে তাঁহারা বড় বড় জেহাদ করিয়াছেন। এমন কি, রাজ-সিংহাসন পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

॥ এশ্‌কের বিশেষত্ব ॥

কোন কোন শুষ্ক মেযাজের লোক এই হালের প্রাবল্য সম্বন্ধে মতভেদ করিয়া থাকে। কিন্তু হালের প্রাবল্য এমন একটি বিষয়, ইহার সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত লোকে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারে এবং দলিল-প্রমাণও তলব করিতে পারে। কিন্তু যখন সম্মুখীন হইবে, তখন দুনিয়ার কোন বস্তুই সেই হাল প্রাবল্যের মোকাবেলা করিতে পারে না। তোমার যদি হালের প্রাবল্য হয় তুমিও দুনিয়া এবং ঘর-বাড়ী ত্যাগ করিবে। যত প্রকারের বাদানুবাদ করিয়াছিলে সবকিছুই ভুলিয়া যাইবে। হালের প্রাবল্য হওয়া এবং না হওয়ার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন পোলাউ এবং ভাত। এক ব্যক্তি ভাত খাইতেছে খুব আগ্রহের সহিতই খাইতেছে। আর অন্যান্য মানুষের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে তাহারা পোলাউ খাইতেছে, ভাত স্পর্শও করে না। ইহা দেখিয়া সে আশ্চর্য বোধ করিতেছে এবং প্রশ্ন করিতেছে ইহারা এমন সুস্বাদু জিনিষ ত্যাগ করিতেছে ? জবাব এই হইতে পারে তাহার সামনেও এক রেকাবী পোলাউ রাখিতে দেওয়া হউক এবং তাহাকে এক লোক্‌মা পোলাউ খাইতে দেওয়া হউক। সে স্বাদ গ্রহণ করিতেই

আর ভাতের নাম মুখে আনিবে না। অথচ ভাত খাইতে কেহ তাহাকে নিষেধ করিবে না। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হউক ভাতের মত স্বাদের খাদ্য কেন ত্যাগ করিলে? উত্তর এই পাওয়া যাইবে যে, মিঞা ব্যস, ইহার সামনে ভাত কি বস্তু? এক লোক্মা তুমিও খাইয়া দেখ। তুমিও ইহাই বলিবে। খোদার রাস্তার অবস্থা এইরূপ যে, মানুষ দুর হইতে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে এবং আল্লাহ্ওয়ালাগণের উপর প্রশ্ন করিতে পারে। কিন্তু একবার সেদিকে একটু মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া লউন সেই প্রশ্ন কোথায় যায় এবং দুনিয়া কিরূপে তাহার মনে থাকে :

تا بدانی هر کرا یزدان بخواند + از همه کار جهان بیکار ماند

"যাহাকে খোদা বলে তাঁহার পরিচয় পাইলে দুনিয়ার যাবতীয় কার্য হইতে অকর্মন্য হইয়া যায়।"

তখন অবস্থা এই দাঁড়াইবে যে, দুনিয়া হইতে নিষেধ করা তো দুরের কথা দুনিয়া তলব করিতে আদেশ করিলেও দুনিয়ার অন্বেষণ তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। ইহার খুব মোটা একটি দৃষ্টান্ত এই যে, এক বেশ্যার প্রতি কোন এক ব্যক্তি অনুরক্ত হইয়া পড়িল। তখন সে নিজের স্ত্রীকে ভুলিয়া কেবল সে বেশ্যার হইয়াই থাকে। এমনকি সেই বেশ্যা যদি তাহাকে অনুমতিও দেয় যে, বিবির নিকট যাও; বরং যদি সে কাজের জন্য আদেশও করে, তবুও সে তাহা করিতে পারিবে না। মহব্বতের বিশেষত্বই তো এই যে, মাহবুব ভিন্ন আর কিছু থাকে না। একটি বাজারী বেশ্যার প্রেমের যখন এই বিশেষত্ব তখন :

عشق مولی کے کم از لیلے بود + گوئے گشتن بہر وے اولی بود

"মাওলার এশ্‌ক লাইলার এশ্‌কের চেয়ে কেন কম হইবে? তাঁহার এশ্‌কে তো পায়ের সম্মুখে ফুটবল হওয়াই শ্রেয়: হইবে।" শেখ বলেন :

ترا عشق همچو خودے ز اب و گل + رباید همه صبر و آرام دل

"তোমরা কাদা-পানির তৈরী মানুষের প্রেম এত প্রবল যে, উহা ছবর এবং অন্তরের আরাম আয়েশ সবকিছুই ছিনাইয়া নেয়।" আর মাল-দৌলতের অবস্থা এইরূপ হয় যে:

چو در چشم شاهد نیاید زرت + زر و خاک یکسان نماید برت

"তোমার ধন-দৌলত যদি মা'শুকের চক্ষুর সম্মুখে না আসিল, তবে স্বর্ণ এবং মাটি তোমার নিকট সমান মনে হইবে।" একটু পরে আরও বলেন :

عجب داری از سالکان طریق + که باشند در بحر معنی غریق

"তুমি তরীকতপন্থীগণকে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিতেছ যে, তাঁহারা এশ্‌কে হাকীকীতে নিমজ্জান থাকিতেছেন।"

অর্থাৎ, এশ্‌কের মধ্যে যখন সকল অবস্থায় সকল ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষত্ব রহিয়াছে, তখন এশ্‌কে হাকীকীর মধ্যে এ সমস্ত বিশেষত্ব অবশ্যই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান হইবে।

অর্থাৎ, মানুষ একজনেরই হইয়া থাকিবে। এই জন্যই দাবী করিয়া বলিতেছি, গ্রাম খরিদ করা, স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করা, ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র বৃদ্ধি করা যদিও মূলতঃ তরীকতের বিরোধী নহে, কিন্তু মহব্বতের প্রাবল্য হইলে এই সমুদয়ের মোহ আপনাআপনিই ছুটিয়া যাইবে। আমি ছাড়াইতেছি না।

॥ তাসাওউফ এবং শরীয়ত ॥

কিন্তু কি করা যাইবে—এক খাপে দুই তরবারি থাকে না, দুইটি একত্রিত হইতে পারে না। হাঁ, এতটুকু সম্ভব যে, আসল তরবারিকে পরিবর্তন করিয়া উহার স্থানে কাঠের তরবারি রাখা যায়। ইহাতে খাপেরও কোন আপত্তি হইবে না এবং আসল তরবারিরও কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তরবারি চিনে তাহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হয় যে, আসল তরবারির স্থলে কাঠের তরবারি রাখে? এইরূপে যে হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলা প্রবেশ করিয়াছেন, সে হৃদয়ে অপরের স্থান কোথায়? দুইয়ের সমাবেশ সম্ভব নহে। হাঁ, এতটুকু অবশ্যই সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও তথায় স্থান দিতে পারে। কিন্তু দিবে কোন্ প্রাণে? বলুন দেখি, এরূপ করা যাইতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলাকে কেহ কি ছাড়িতে পারেন?

মোটকথা, মহব্বতের প্রাবল্যের লক্ষণ হইল এই। ইহাতে মানুষ অপারগ হইয়া যায়। কিন্তু তাসাওউফের বিধান এই যে, যাহা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয উহা কেহই নিষেধ করিতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা যখন গ্রাম খরিদ করা, যমিন খরিদ করা এবং চারিজন বিবি রাখা জায়েয করিয়াছেন, কাহার সাধ্য আছে তাহা নিষেধ করিয়া দেয়? আর খোদা যখন এই সমস্ত জিনিষ নিষেধ করেন নাই। তখন এই সমুদয় তরীকতের বিরোধী বা প্রতিবন্ধক কেমন করিয়া হইতে পারে? এরূপ বিশ্বাস রাখাও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের বিরোধিতা করা। হাঁ, এতটুকু কথা অবশ্যই আছে যে, এ সমস্ত বস্তুতে এমনভাবে মশ্‌গুল হইবে না যাহাতে আসল কাজ হইতে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ হইতে বিরত হইয়া গুনাহের কাজে লিপ্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ অবস্থায় এ সমস্ত বস্তুর সহিত আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধই প্রযোজ্য হইবে। কেননা, শরীয়তের প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই পরিষ্কার বুঝা যায়। ফলকথা, তাসাওউফ শরীয়ত ছাড়া কোন নূতন জিনিষ নহে।"

॥ মোকামের তথ্য ॥

কিন্তু দেখুন, তরীকতের পথের নাম লইয়া মানুষ কেমন মুশ্‌কিলে ফেলে। দুনিয়াকে সম্পূর্ণ বর্জন না করিলে তাহাকে তরীকতপন্থীই বলা হয় না, যদিও আজকাল এই দুনিয়া তরক করার অর্থ অপরের হক নষ্ট করা, যাহা কোন ক্রমেই জায়েয নহে,

এবং কখনও উহা আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার উপায়রূপে গণ্য হইতে পারে না। আমি তরীকতের পথের যে তথ্য বর্ণনা করিলাম তাহা কত পরিষ্কার। আমি এই জন্যই বলি, তাসাওউফ কোন মুশ্‌কিল বিষয় নহে। কিন্তু কাজ শর্ত। শুধু কথায় তো কোন কাজই হইতে পারে না। মোটকথা, তাসাওউফের কোন অংশ কোন অভূতপূর্ব বস্তু নহে, যেমন মানুষ মুর্খতা বশতঃ বুঝিয়া রাখিয়াছে। যেমন, 'মোকাম' শব্দটি। এই মোকাম শব্দেরই কত রকমের অর্থ মানুষ নিজের তরফ হইতে বানাইয়া লইয়াছে। যেমন, আজকাল যদি একটু লেখাপড়া জানা ফকির হয়, তবে সে 'মোকামের' অর্থ বলে— لَاهُوْت جَبَرُوْت (আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী এবং সত্ত্বার স্তর বিশেষ) তাসাওউফের আলেমগণ হইতে ইহারা এই দুইটি শব্দ চুরি করিয়া লইয়াছে। সাধারণ লোকের সম্মুখে এই শব্দগুলিকে আওড়ায় যাহাতে লোকে মনে করে যে, এই ব্যক্তিও তাসাওউফ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অথচ যে দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিল, তাহারা নিজেরাই জানে না যে, শব্দ দুইটির অর্থ কি ? এবং এই দুইটি কি বস্তু, শুধু جبروت ও لاهوت শব্দ দুইটি স্মরণ রাখিয়াছে, আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, لاهوت ও جبروت শব্দ দুইটি অর্থহীন ; অর্থপূর্ণ নিশ্চয়ই বটে ; কিন্তু এগুলি অস্তিত্বের স্তর বা পর্যায়, ছুফীদের পরিভাষায় যাহাকে মোকাম বলে এবং শেষ পর্যায় সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করিতে যাইতেছি। উহা এই অস্তিত্বের স্তর নহে ; বরং নেকীর কাজ অবলম্বন করাকে মোকাম বলে। তবে এতটুকু বিশেষত্ব আরও আছে যে, নেক কাজ বলিতে এখানে বাতেনী আ'মল উদ্দেশ্য। যাহেরী আমলকে মোকাম বলা হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তি নামায পড়িতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং উত্তমরূপে নামাযের পুর্ণতা সাধন করিয়াছে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তিকে ছুফীদের পরিভাষায় নামাযের সমস্ত মোকাম সমাপ্ত করিয়াছে বলা যাইবে না ; বরং বাতেনী আ'মলের নাম মোকাম, যেমন 'নম্রতা' অর্থাৎ, নিজকে নিজে হীন মনে করা কিংবা 'এখ্‌লাছ' অর্থাৎ, কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কাজ করা, কিংবা যেমন ছবর, শোকর, রেযামন্দী, তাওহীদ প্রভৃতি। যাহাদের বিস্তারিত বিবরণ তাসাওউফ শাস্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে, এসমস্ত গুণ হাছিল করাকে মোকাম হাছিল করা বলে। অতএব, বলা যদি হয়, "অমুক ব্যক্তি 'তাওয়াযু' অর্থাৎ নম্রতার মোকাম অতিক্রম করিয়াছে" তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, তিনি উহাতে স্থায়ী ক্ষমতার পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। ইহার উপর অন্যান্য মোকাম অনুমান করিয়া লউন।

॥ সুলূকের অর্থ ॥

বাতাসে উড়া কিংবা পানির উপর দিয়া হাটার নাম 'সুলূক' নহে। কেননা, তরীকতের পথে গমনকারী মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। তরীকতের পথে আসিয়া

সে মাছও হইয়া যায় না, পক্ষীও হইয়া যায় না, লোকে এসমস্ত অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্যকে কামালিয়াৎ মনে করিয়া লইয়াছে এবং ইহাকেই তাসাওউফের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। ইহা হাছিল করিতে পারিলেই কামেল হইয়া গেল, আর এই কামালিয়াত হাছিল না হইলে সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া গিয়াছে মনে করে। কিন্তু কোরআনে ও হাদীসে কোথাও ইহার চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মোকাম অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকারের বাতেনী আ'মল কল্‌ব্‌কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়। এই কল্‌বের পরিচ্ছন্নতা সাধনই ঐ সমস্ত আমলের মূল উদ্দেশ্য। ইহাই বড় জিনিষ। পানির উপর হাটা এবং বাতাসে উড়াকে উদ্দেশ্য মনে করার অর্থ এই যে, মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া হায়ওয়ান জান্‌ওয়ারের দিকে রূপান্তরিত হইয়া যাও, মানুষ হইতে মাছ কিংবা পক্ষী হইয়া যাও। সারকথা এই যে, কতক বাতেনী আমল এরূপ আছে—যাহা বর্জনীয়, আর কতক আমল এরূপ আছে যাহা অবলম্বনীয়। যেমন, 'রিয়াকারী' ও তাকাব্‌বুরী, প্রভৃতি বর্জনীয় আ'মল। এই সমস্তই হইল মোকাম। এ সমস্ত হাছিল করা ও পূর্ণতা সাধন করার নামই 'সুলূক'। এই সমস্ত মোকাম হাছিল করার বেলায় কোনটি আগে হাছিল করিতে হয় এবং কোনটি পরে হাছিল করিতে হয়। যেমন, আমি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি যে, আলিফ-বে ও ছিপারা পড়ার মধ্যে পর্যায় রক্ষা করা একান্ত জরুরী। আলিফ-বে' আগে আয়ত্ত না করিলে ছিপারা যেরূপ হাছিল হওয়া উচিত তদ্রূপ হাছিল হইতে পারে না। আবার কোন কোন আ'মল দুই দুইটি এক সঙ্গে হাছিল করা যাইতে পারে, কোন কোন আমল পর্যায়ক্রমিক ভাবে। কোন্ কোন্ আমল সঙ্গে সঙ্গে হাছিল করা যাইতে পারে। তাহা মুর্শিদের নির্দেশের উপর নির্ভর করিবে।

যেমন, চিকিৎসক কোন কোন ঔষধ পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করেন যেমন মুন্‌জেয্‌ ও মুস্‌হেল্‌া অর্থাৎ, পরিপাকশীল ঔষধ ও জুলাবের ঔষধ, এই দুইটি ঔষধকে পর্যায় ক্রমে ব্যবহার করিতে দিয়া থাকে। এই পর্যায়ের কোন পরিবর্তন এই দুইটির মধ্যে করা যাইতে পারে না এবং দুইটিকে একত্রে ব্যবহার করিতেও দেওয়া যাইতে পারে না। এমনও হইতে পারে না যে, উহাদের পর্যায় পরিবর্তন করিয়া আগে জুলাবের ঔষধ এবং পরে পরিপাকের ঔষধ খাইতে দেওয়া যাইবে। আবার কোন কোন ঔষধকে একত্রেও সেবন করিতে দেওয়া হয়। যেমন, জুলাব এবং উহার সহায়ক ঔষধ একই দিনে এক সঙ্গে সেবন করিতে দেওয়া হয়।

ফলকথা, বিশেষজ্ঞগণ অবগত আছেন কোন্ কাজ পর্যায়ক্রমিক ভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং কোন্ কাজ এক সঙ্গে করা যাইতে পারে। ইহার কিছু নিয়মাবলীও আছে। কিন্তু এখন উহা বর্ণনা করার সময়ও নাই। উহা বর্ণনা করিলে কোন লাভও হইবে না। কেননা, কেহ যদি ইচ্ছা করে যে, উক্ত নিয়মাবলী শ্রবণ পূর্বক

উহাদেরই সাহায্যে নিজের আভ্যন্তরীণ রোগের সংশোধন করিয়া লইবে এবং কোন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিবে তাহা সম্ভব নহে। উহার দৃষ্টান্তও ঠিক এইরূপ হইবে যেমন চিকিৎসা করাইবার প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাহার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন করাই কার্যকরী হইবে। চিকিৎসার নিয়মাবলী রোগীর সম্মুখে আওড়াইলে কোনই ফল হইবে না। কেননা, উক্ত নিয়মাবলীর সাহায্যে রোগী নিজের চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবে না; বরং ইহারই প্রয়োজন যে, যখন চিকিৎসার আবশ্যক হয়, তখন চিকিৎসকের নিকট হইতে জানিয়া লইবে, সে প্রকৃত কোন্ রোগের রোগী এবং ইহার জন্য নির্দিষ্ট কোন্ ঔষধের আবশ্যক। এই পন্থাই সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সহজ।

॥ রেযামন্দীর অর্থ ॥

সুতরাং পর্যায়ক্রমে করা এবং একত্রে করা সম্বন্ধীয় উক্ত নিয়মাবলী বর্ণনা করা অনর্থক ও নিষ্ফল। হাঁ, মোটামুটিরূপে এতটুকু বর্ণনা করিতে চাই যে, কোন কোন কাজে পর্যায় রক্ষা করা হইয়া থাকে—সেই পর্যায়ক্রমের সর্বশেষ পর্যায় কি? অর্থাৎ, যে স্তরে যাইয়া সমস্ত মোকাম অতিক্রম হইয়া যায় এবং মুজাহাদা অর্থাৎ চেষ্টা ও পরিশ্রম সমাপ্ত হয় তাহা কোন্ পর্যায়? অতএব, বলিতেছি যে, এসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের উক্তি ও মত রহিয়াছে। কেহ বলেন, রেযামন্দী সর্বশেষ মোকাম। 'রেযা' শব্দটি মছদর বা ক্রিয়া বিশেষ, ইহার কর্তা নিজেকেও বলা যাইতে পারে। তখন অর্থ এই হইবে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যে পর্যায়ে যাইয়া রাযী হন এবং আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিধানে আপনার মনে অসন্তোষ বা অপছন্দ ভাব না থাকে। অথচ এই ক্রিয়ার কর্তা যদি আল্লাহ্ তা'আলা বলা হয়, তখন অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র সন্তোষ ও বান্দার সন্তোষের মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। আ'মলের মোকাম উভয় অবস্থায় একই বটে। ইহার নাম আল্লাহ্র সন্তোষও বলিতে পার কিংবা বান্দার সন্তোষও বলিতে পার। 'তালাযুম' অর্থাৎ, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি বয়েত মনে পড়িল। তাহাতে এই বক্তব্য বিষয়টিও পরিষ্কার হইয়া যাইবে:

بخت ا گر مدد کند دا منش آورم بکف + گر بکشد زہے طرب ور بکشم زہے شرف

"অদৃষ্ট সাহায্য করিলে তাহার আঁচল হাতে ধরিব। অতঃপর সে টানিয়া নিলে তো খুবই আনন্দের কথা, আর যদি আমি তাহাকে টানিয়া আনিতে পারি তাহাও অতি সৌভাগ্য এবং গৌরবের বিষয়।" অর্থাৎ, মাহ্বুবের আঁচল হাতে আসা চাই। অতঃপর মাহ্বুব আমাকে টানিয়া নিলেও মিলন এবং আমি তাহাকে টানিয়া আনিলেও মিলনই হাছিল হইল। ফলকথা, রেযার উভয় অর্থ, (অর্থাৎ, বান্দার সন্তোষ কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ,) পরস্পর বিজড়িত। সর্ব অবস্থায়ে উহাতে ইহাই লক্ষ্যণীয়

যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজে ও বিধানে বান্দার মন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত না হয়। 'রেযা' শব্দের অর্থ আপনি বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজের উপর বান্দা অসন্তুষ্ট না থাকাই 'রেযা'। 'রেযা ক্রিয়ার কর্তা বান্দাকে বলা হইলে তো ইহার অর্থ এইরূপই হইবে। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে কর্তা বলা হয়, তবে অর্থ এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু ইহা রেযা শব্দের শাব্দিক অর্থ নহে। কেননা, কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ্ রাযী হইলে উহার অবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যম্ভাবী হয় যে, বান্দা আল্লাহ্‌র সমস্ত কাজে রাযী থাকে। ফলকথা, রেযার মোকামে একথা অবশ্যই হয় যে, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক কাজে রাযী থাকে। উহার পরীক্ষা ইহার দ্বারাই হয় যে, স্বভাবতঃ রাযী না হইলেও বিবেক অনুযায়ী কোন অভিযোগ নাই। এই কথাটুকুর মধ্যে মূর্খ ফকিরগণ কত রকমের প্যাঁচ লাগাইয়া দিয়াছে। তাহারা 'রেযার' ব্যাখ্যা এইরূপ করে, এমন অবস্থাকে 'রেযা' বলা হইবে যাহাতে তীর আসিয়া লাগিলেও উঃ শব্দ মুখ দিয়া বাহির না হয় এবং খবরও না হয়। এই জাতীয় ব্যাখ্যার ফলেই লোকে বুঝিয়া লইয়াছে সাধ্যাতীত কষ্টের নাম তাসাওউফ। এই কারণেই তাসাওউফের নাম শুনিয়া মানুষ ঘাব্‌ড়াইয়া যায় এবং বলে, ইহা আমাদের সাধ্যের কাজ নহে। খামাখা ঝামেলায় পড়িয়া লাভ কি? খুব ভালরূপে বুঝিয়া লউন। স্বভাবতঃ আল্লাহ্‌র কাজ অমনঃপুত হওয়া 'রেযা'র বিপরীত নহে। তবে জ্ঞান ও বিবেকানুযায়ী অসন্তুষ্ট হওয়া চাই না। যেমন, পুত্র মরিলে দেখিতে হইবে—অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার কাজের প্রতি কোন অভিযোগ আছে কি না এবং এরূপ বলে কি না—ছেলেটি না মরিলে ভাল হইত। স্বাভাবিক কষ্ট যতই হউক তাহাতে দোষ নাই। শুধু এটুকু দেখিতে হইবে যে, জ্ঞান এবং বিবেকানুযায়ী আল্লাহ্‌র এই কাজকে নাপছন্দ করে কি না এবং আল্লাহ্‌র কাজকে খারাপ মনে করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছে কি না। অর্থাৎ এরূপ মনে করা উচিত—যাহা কিছু ঘটিয়াছে খুব ঠিকই হইয়াছে এবং এরূপ হওয়াই উচিত ছিল এবং ইহাতেই কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর ইহার সহিত যদিও স্বাভাবিক অসন্তোষ আসিয়া যায়, তবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবে না যে, স্বাভাবিক অসন্তোষ এবং বিবেকানুযায়ী সন্তোষ একত্রিত কেমন করিয়া হইতে পারে। বাহ্যিক তো এই দুইটি বস্তুকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত আছে। তদ্দ্বারা এই প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তাহাতে ইহাও বুঝা যাইবে যে, এই মোকামটি বেশী মুশ্‌কিল নহে। মানুষ এই ধরনের বিষয়কে তত্ত্ববিদগণের সাহায্যে মীমাংসা করিয়া লয় না। নিজেই বসিয়া বসিয়া যাহাকিছু বুঝে আসে, উহার উপর সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লয়। যেমন অনেক লোক ইহারই সম্বন্ধে বুঝিয়া বসিয়াছে যে, সন্তোষ আর অসন্তোষ কেমন করিয়া

একত্রিত হইতে পারে এবং এতটুকু তাওফীক হয় না যে, কাহারও নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। খুব ভালরূপে বুঝিয়া লউন যে, স্বভাবতঃ কষ্ট হওয়া এবং জ্ঞানতঃ না হওয়া সম্ভব। কেননা, দুই বিপরীত বস্তুর মধ্যে বিবেচনার দিক এক হওয়া শর্ত এবং যেহেতু এখানে একটির মধ্যে জ্ঞানতঃ এবং অপরটির মধ্যে স্বভাবতঃ বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক কেমন করিয়া হইল? আবার ইহাদের মধ্যে ঐক্যও নাই। কেননা, উভয়টি অস্তিত্ববাচক নহে। সুতরাং এই দুইটি বিষয়ের একত্রে সমাবেশ জ্ঞানতঃ নিষিদ্ধ ও অসম্ভব নহে। অন্য কথায় ইহাকে এরূপও বলিতে পারেন যে, ইহাদের একত্রে সমাবেশ জ্ঞানতঃ সম্ভব। অতএব, বিস্ময়ের ব্যাপার, শিক্ষিত লোকেরা ইহাতে জটিলতা কেন আনয়ন করেন। হাঁ, সাধারণের জ্ঞানে যদি ইহা না আসে কিংবা ইহাকে অসম্ভব মনে করে, তবে কিছুটা সঙ্গত ছিল। কিন্তু আমি এখন যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি, উক্ত কথাটি খুব সহজেই বোধগম্য হইয়া যাইবে এবং অসম্ভব মনে করার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।

দৃষ্টান্তটি এই : মনে করুন, কাহারও ফোঁড়া হইয়া খুব কষ্ট পাইতে লাগিল। চিকিৎসককে দেখাইলে সে বলিল, অস্ত্রোপচার ব্যতীত ইহার অন্য কোন উপায় নাই। দুই চারি জন অভিজ্ঞ সার্জনকে দেখাইল। সকলেই এবিষয়ে একমত হইলেন। ফলকথা, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, অস্ত্রোপচারই করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সকলেরই প্রিয়, বাধ্য হইয়া সে উহা স্বীকার করিবে এবং চিকিৎসককে অস্ত্রোপচার করিতে আদেশ করিবে। উহাতে কষ্টও হইবে এবং সে উহা বরদাশতও করিবে। অগত্যা অস্ত্রোপচার করাইতে বসিল। ফোঁড়াটি ছিল খুব খারাপ ধরনের। উহার ক্রিয়া মাংসের ভিতর হাড্ডির নিকট পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। চিকিৎসক গভীর অস্ত্রোপচার করিলেন। রোগী জোরে উঃ শব্দ করিল, চক্ষু হইতে অশ্রুও নির্গত হইল। যদিও খুব জোয়ান এবং সাহসী ছিল কিন্তু ধৈর্য রাখিতে পারিল না। মুখও বিকৃত করিল। সমস্ত শরীর কাঁপিয়াও উঠিল। যাহা হউক, অস্ত্রোপচার সমাপ্ত হইল। পুঁজ ও দুষিত রক্ত প্রচুর পরিমাণে বাহির হইল। দুষিত মাংস কাটিয়া ফেলিয়া মলম লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এখন রোগী হাসিতে লাগিল, ফোঁড়া হইতে নির্গত দুষিত পদার্থসমূহ দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইল। মনে করিল, ভালই হইয়াছে। খোদা তা'আলা ইহার কষ্ট দুর করিয়া দিয়াছেন। চতুর্দিক হইতে লোকে তাহাকে মোবারকবাদ দিতে লাগিল। রোগী আদেশ দিলেন, চিকিৎসককে দশ টাকা পারিশ্রমিক এবং বিশ টাকা পুরস্কার দাও এবং জামা-কাপড়ও দাও। খুবই বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ এবং অনুগত। খুব চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া এবং আন্তরিকতার সহিত সে এই কাজ করিয়াছে।

দৃষ্টান্তটি আপনি শ্রবণ করিলেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, এস্থলে কষ্ট এবং রেযামন্দী একত্রিত হইল কি না। যদি কষ্ট হয় নাই, তবে অশ্রু কেন বাহির হইল?

উঃ কেন করিল, মুখ কেন বিকৃত করিল এবং শরীর কেন কাঁপিল ? যদি আনন্দিত বা সন্তুষ্ট না হইত, তবে দশ টাকার উপর আবার বিশ টাকা পুরস্কার কেন দিল ? তাহার প্রশংসা কেন করিতেছে ? কাজেই, বলিতে হইবে অসন্তুষ্টও হইয়াছে সন্তুষ্টও হইয়াছে অর্থাৎ, জ্ঞানতঃ এই দৃষ্টান্ত হইতে বিষয়টি খুবই পরিষ্কার এবং সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। এখন আর ইহার কোন প্রশ্নও উঠিতে পারে না। আর অসম্ভব মনে করার অবকাশ রহিল না, অর্থাৎ, সন্তোষ ও অসন্তোষ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে একত্রিত হইতে পারে। অতএব, এখন আর 'রেযা' শব্দের অর্থের মধ্যে এরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, মানুষ বিপদকালে দুঃখ-কষ্ট জনিত স্বাভাবিক অসন্তোষও অনুভব করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের প্রতি সন্তোষও কায়েম থাকে। কেননা, দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি স্বভাবগত। আর খোদার বিধানের প্রতি সন্তোষ জ্ঞান সম্মত।

॥ রেযা'র মোকাম ॥

ফলকথা, 'রেয়া'র মোকাম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় কাজে জ্ঞানতঃ রাযী থাকিবে যদিও স্বভাবতঃ অসন্তোষ বা দুঃখ-কষ্ট অনুভূত হউক। যেমন পুত্রের মৃত্যুতে কষ্ট হইয়া থাকে এবং অশ্রুও নির্গত হয়। কিন্তু জ্ঞানতঃ একথা জানে এবং খুব ভালরূপে একথার প্রতি মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ইহাই ঠিক যাহা আল্লাহ্ তা'আলা করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তি রেযার মোকাম হাছিল করিয়াছে।

সারকথা এই যে, 'রেযার' মধ্যে স্বভাবগত খুশী অনুভব করা শর্ত নহে। হাঁ, খোদার কোন কোন বান্দা এমনও আছেন, যাঁহাদের স্বভাব সুলভ খুশীও হাছিল হইয়াছে। এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, কষ্টের সময় হাসিয়াছেন বরং খিল খিল করিয়া হাসিয়াছেন, কিন্তু ইহা ছিল হালের প্রাবল্য জনিত। এই অবস্থাটি প্রকাশ্যত সর্বাপেক্ষা কামেল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, মধ্যবর্তী অবস্থায় এরূপ 'হাল' হইয়া থাকে, শেষ পর্যায়ে বা পূর্ণতা প্রাপ্তির পর্যায়ে এরূপ অবস্থা হয় না। দেখুন, আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা এরূপ হয় নাই। ইহা সর্ববাদি সম্মত যে, তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক কামেল ছিলেন। অতএব, ইহা কামালিয়তের অবস্থা কেমন করিয়া হইতে পারে ?

॥ কামালিয়তের অবস্থা কেমন হইতে পারে ॥

আসল কথা এই যে, মধ্যবর্তী অবস্থার আল্লাহ্ওয়ালাগণ হালের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। তাঁহারা দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতে পারেন না। যেমন, কাহাকেও ক্লোরো-ফরম শুঙ্গাইয়া অপারেশন করা হইলে সে অনুভব করিতে পারে না। আর শেষ পর্যায়ের কামেলদের অবস্থা এই যে, কুরসীর উপরে বসিয়া অপারেশন করাইয়া লইয়াছে। উহাতে কষ্টও পুর্ণ মাত্রায় অনুভুত হইয়াছে, কপালও কুঞ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু এত বলিষ্ঠ হৃদয় এবং সাহসী যে, সহ্য করিয়া গিয়াছেন আম্বিয়া কেরামের অবস্থাও এইরূপই যে, কষ্টের অনুভূতি তাঁহাদের পুরাপুরিই হইয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের বল এত অধিক যে, সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতে পারেন। দুঃখ কষ্টের বা চিন্তার লক্ষণও প্রকাশ পায় এবং বাস্তবিক পক্ষে দুঃখ এবং চিন্তাও হয়। যেমন, কুরসির উপর বসিয়া যাঁহারা অপারেশন করান তাঁহারাও কষ্ট পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিয়া থাকেন কিন্তু জ্ঞানতঃ আল্লাহ্র বিধানের প্রতি রেযা ও সম্মতি প্রবল থাকে এবং চুল পরিমাণও সীমা লঙ্ঘন করেন না। যাঁহারা সবেমাত্র আল্লাহ্র যেক্রে ডুবিয়াছেন তাঁহাদের চেয়ে ইঁহাদের অবস্থা আরও উন্নত। যেমন, ক্লোরোফরম শুঙ্গিয়া অজ্ঞান অবস্থায় অপারেশনকারীর চেয়ে সজ্ঞানে কুরসীর উপর বসিয়া অপারেশন-কারীর অবস্থা উন্নত। খুব বুঝিতে চেষ্টা করুন। আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কাহারও পুত্র বিয়োগ ঘটিলে তাঁহারা হাসেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহেবযাদার এন্তেকাল হইলে তিনি কাঁদিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন :

إِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ✻

'হে ইব্রাহীম ! আমরা তোমার বিচ্ছেদে নিশ্চয় দুঃখিত।' এখানে কেহ ইহাও বলিতে পারে না যে, সম্ভবতঃ হুযূর (দঃ) চিন্তার আধিক্য বশতঃ এইরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। কেননা, হুযূর (দঃ) নিজেও এমতাবস্থায় অর্থাৎ, বিপদকালে দুঃখ-চিন্তা আদৌ না হওয়াকে ইহা অপেক্ষা ভাল মনে করিতেন। যেমন, হাদীস শরীফে ইহার বিপরীত উল্লেখ রহিয়াছে যে, হুযূরের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়া ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর ! দুঃখের সময় আমাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, অথচ নিজে কাঁদিতেছেন ? তিনি বলিলেন : 'ইহা রহ্মত'। আল্লাহ্ তা'আলা মুমেন লোকের অন্তরে এই রহ্মত রাখিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, এই অবস্থা কোন নিম্ন স্তরের অবস্থা নহে। কেননা, হুযূর এই অবস্থার প্রশংসা করিয়াছেন। এমন শব্দে প্রশংসা করিয়াছেন যাহা হইতে উত্তমরূপে বুঝা যায় যে, উহার বিপরীত নিন্দনীয়। কেননা, ইহাকে রহ্মত বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রহ্মতের বিপরীত নিন্দনীয়। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, সর্বাপেক্ষা পূর্ণতম অবস্থা ইহাই। আর বিপদকালে হাসা ইহা অপেক্ষা নিম্ন স্তরের অবস্থা। আল্লাহ্র যেক্রে নিমজ্জিত লোকগণ হালের প্রাবল্য ঘটিলে এরূপ করিয়া থাকেন।

॥ জোশ্ এবং হুশ্ ॥

মধ্যম স্তরেই তরীকতপন্থীদের হালের প্রাবল্য হইয়া থাকে। শেষ পর্যায়ে উপনীত তরীকতপন্থীদের মধ্যে হালের প্রাবল্য হয় না। ইহাদের মধ্যে এক জনের হুশ বহাল আছে, অপর জন জোশে মত্ত। মধ্যম স্তরের সালেক ও শেষ পর্যায়ে উপনীত সালেকের দৃষ্টান্ত—পাকের পাতিলের মত মনে করুন। প্রথম অবস্থায় যখন উহাতে উত্তাপ

দেওয়া হয়, তখন উহা হইতে কেমন জোশ উঠিতেদেখা যায়। কিন্তু শেষ অবস্থায়সেই জোশ থাকে না। প্রথম অবস্থায় জোশ দেখিয়া কেহ বলিতে পারে উত্তাপের ক্রিয়া কবুল করার যোগ্যতা ইহার মধ্যে অধিক এবং শেষ অবস্থায় উক্ত ক্রিয়া গ্রহণের ক্ষমতা থাকে নাই, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। উত্তাপের ক্রিয়া শেষ অবস্থায়ই অধিক হয়। কেননা, কর্তা দীর্ঘ সময় ধরিয়া উহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ক্রিয়া গ্রহণকারীর মধ্যেও প্রথম অবস্থায় ক্রিয়া গ্রহণ করার প্রতিবন্ধকও যাহাকিছু ছিল দীর্ঘ সময় যাবৎ ক্রিয়া কবুল করিতে করিতে এখন সেই প্রতিবন্ধকও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রতিবন্ধক ছিল পানি। উত্তাপ গ্রহণপূর্বক পরিপক্ব হইতে হইতে এখন পানির মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে। এদিকে উত্তাপ গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ওদিকে কর্তার ক্রিয়াশক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং ক্রিয়াও এখন অবশ্যই অধিক হইবে। ইহার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ইহা চোখের দেখা ব্যাপার এবং সর্ববাদী সম্মত। ইহা যেন খোলা কথা, কিন্তু এখন জোশ নাই; বরং এখন অবস্থা এই যে, অগ্নির উত্তাপে পানি হ্রাস পাইয়া সমস্ত উত্তাপ হাড়ির মধ্যস্থিত বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় লাগিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যদি পাতিল চুলার উপর হইতে নামান না হয়, তবে উহার মধ্যস্থিত সবকিছুই জ্বলিয়া কয়লা হইয়া যাইবে, আর বলক উঠিবে না। শেষ পর্যায়ে উপনীত লোকদের অবস্থাও তদ্রূপ। এখন তাঁহার মধ্যে জোশ অর্থাৎ ভাব চাঞ্চল্য মোটেই নাই। এমনকি, তাঁহার সম্বন্ধে যাহারা কিছুই জানে না তাহারা বলে, এই ব্যক্তির কোন ক্রিয়াই গ্রহণ করে নাই, কিন্তু তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া এমন ধীর গম্ভীর হইয়াছেন যে, অন্যান্য লোকেরাও তাঁহার ক্রিয়াশীলতায় জ্বলিয়া যায়। তাঁহার কথায় অপরের হৃদয়ে আগুন ধরিয়া যায়। কিন্তু বাহ্যত তিনি খুবই ঠাণ্ডা, তাঁহার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ সম্বন্ধে কাহারও খবর নাই।

যেমন, কোন কোন ঔষধ আছে। দেখিতে কিংবা স্পর্শ করিতে তাহাতে কিছুমাত্র উত্তাপ নাই, কিন্তু খাওয়ামাত্র উহার ক্রিয়া শরীরে এত অধিক উত্তাপ আরম্ভ হয় যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না; বরং কোন ঔষধ এমনও আছে যাহা স্পর্শ করিলে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হয়। এমন কি, উহার পরশে অপর পদার্থের মধ্যেও শীতলতা উৎপন্ন হয়। অথচ উহা সেবন করামাত্র শরীরে অসাধারণ উত্তাপ আরম্ভ হয়।

কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের অবস্থা এরূপ হয় যে, সকলে তাঁহাকে চিনিতেও পারে না, তাঁহাকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহার মধ্যে কোন জ্বলন বা উত্তাপ অনুভূত হওয়ার পরিবর্তে উহার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। যেমন, বরফে হাত দিলে উত্তাপ অনুভূত হওয়ার পরিবর্তে ঠাণ্ডাঅনুভূত হইয়া থাকে। উহার প্রকৃত ক্রিয়া উপলব্ধি করার জন্য শর্ত এই যে, উহাকে পান করা হউক। এইরূপে উক্ত

আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের অবস্থা উপলব্ধি করার জন্য শর্ত হইল, তাঁহার সহযোগীতায় কিছুকাল বাস করা এবং জনসমাজে ও নির্জনে তাঁহার সহিত মেলামেশার অভ্যাস করিয়া লওয়া। আজকাল ইহাও এক পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে যে, একবারের সাক্ষাতেই ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে চাহিতেছে। বন্ধুগণ! ইহারা যে, এমন লোক যদি গুপ্ত থাকিতে চাহেন, তবে কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁহাদের অবস্থার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার এই অর্থ নহে যে, একবারের সাক্ষাতে কোন ফলই হয় না; বরং অর্থ এই যে, যদি একবারের সাক্ষাতে ফল না পাওয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ যেন কোন সিদ্ধান্ত করিয়া না বসেন। সম্ভবত তাঁহাকে অনুভব করিবার কোন প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। যেমন, ক্রিয়া গ্রহণকারীর মধ্যে যোগ্যতার অভাব কিংবা স্বয়ং কর্তা নিজেকে নিজে গোপন রাখিতে মনস্থ করিয়া ক্রিয়া প্রদান করেন নাই।

ফলকথা, শেষ পর্যায়ের লোকের মধ্যে জোশ বা ভাব-চাঞ্চল্য হওয়া তো দূরের কথা—কোন কোন সময় বরং জোশের বিপরীত নিস্তেজতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, বরফের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে উত্তাপ রহিয়াছে। কিন্তু বাহিরে ঠাণ্ডাই অনুভূত হয়। যদি বিপরীত অনুভব নাও হয়, তবে এতটুকু অবশ্য হয় যে, জোশ হয় না এবং পরিপক্ক তরকারীর পাতিলের মত হয়। অর্থাৎ, টগ্‌বগ করিয়া ফুটে না। কিন্তু কামালিয়ত যাহাকিছু হাছিল হওয়ার ছিল, সবকিছুই হাছিল হইয়াছে। কোন অবস্থাই আর বাকী নাই। আর মধ্যম স্তরের 'সালেক' অর্ধপক্ক তরকারীর পাতিলের ন্যায় টগ্‌বগ করে এবং উহার স্ফুটন থামে না। কিন্তু প্রত্যেকেই জানে যে, ইহা উপকার লাভের যোগ্য নহে। এখন পর্যন্ত কাঁচা গোশ্‌তের গন্ধও দূর হয় নাই। এখনও অনেক কিছু উলটপালট হইবে। ভাজা হইবে, ঝোল দেওয়া হইবে, পাক করা হইবে, অতঃপর কাহারও সম্মুখে রাখার উপযুক্ত হইবে।

সারকথা এই যে, মধ্যম স্তরের লোকের মধ্যেই হালের প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। শেষ পর্যায়ের লোকের মধ্যে নহে। অতএব, বিপদকালে স্বভাবতঃ আনন্দ বা খুশী হওয়া এবং হাসা মধ্যম স্তরের লোকের মধ্যেই হইবে। আর শেষ পর্যায়ের লোক দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানতঃ আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব, রেযার মোকামের জন্য স্বভাবতঃ খুশী হওয়া শর্ত নহে। তবে জ্ঞানতঃ খুশী থাকা চাই। অর্থাৎ, মানুষ অন্তর হইতে যেন উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার যে কাজই হউক না কেন—উহা যথার্থ মঙ্গল এবং উহাই হওয়া সঙ্গত। উহাতে স্বভাবত দুঃখ-কষ্ট হইলেও এবং উহার অবসান চাহিলেও ইহাতে অন্তর সঙ্কীর্ণ হওয়া উচিত নহে।

॥ বেহেশ্‌তের চেয়ে বড় নেয়ামত ॥

এই বর্ণনা হইতে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন যে, দুঃখ-কষ্ট এবং 'রেযা' এক স্থানে একত্রিত হইতে পারে। অতএব, এই 'রেযা'কেই কেহ কেহ সর্বশেষ আ'মল বলিয়াছেন।

ইহা সর্বশেষ মোকাম হওয়ার কারণেই সমস্ত বেহেশ্‌তের বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ "অর্থাৎ, বেহেশ্‌ত আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দাগণের জন্য তো বটেই ; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দী অর্থাৎ সন্তোষ বেহেশ্‌তের চেয়েও বড় নেয়ামত, তাহাও তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন।" ইহার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, বেহেশ্‌তীরা যখন বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবেন এবং তথাকার নানাবিধ নেয়ামত উপভোগ করিবেন, এমন কি তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার 'দীদার' ও লাভ করিবেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে যে শুভ-সংবাদ প্রদান করা হইবে ; "আরও একটি নেয়ামত তোমাদিগকে প্রদান করা হইতেছে। তাহা এই, অদ্য হইতে কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না।" ইহা এমন নেয়ামত হইবে যে, ইহাতেই যাবতীয় নেয়ামত এবং সুখ-শান্তির পরিপূর্ণতা সাধিত হইবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের সম্ভাবনা থাকিলে সমস্ত নেয়ামতই মাটি। কেননা, সর্বক্ষণ এরূপ আশঙ্কা থাকে,—এমন না হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া এই নেয়ামত কাড়িয়া লন।'

ইহা ঠিক এইরূপ যেমন—কাহারও সম্মুখে পোলাও কোরমা এবং দুনিয়ার সমস্ত বাছা বাছা নেয়ামত রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, "আমার ইচ্ছা হইলে যে কোন সময় এই সমস্ত নেয়ামত তোমার সম্মুখ হইতে উঠাইয়া লইব।" এমতাবস্থায় উক্ত লোকটি সেই নেয়ামতগুলি কি ছাই মাটি উপভোগ করিতে পারিবে ? সে তো উহার একটু স্বাদও আস্বাদন করিবে না!

আপনারা হয়ত দেখিয়া থাকিবেন—ফাঁসীর উপযোগী ব্যক্তিকে যখন ফাঁসীর জন্য দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় : "তোমার কিছু খাইতে ইচ্ছা হয় কি ? তখন সে যাহা কামনা করে—তাহাকে তাহা দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে যে, তাহার হাত কাঁপিতে থাকে, খাদ্য-দ্রব্য মুখে দিলেও গিলিতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সে জানে এই বস্তুটি আমাকে দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু এখনই কাড়িয়া লওয়া হইবে। এই চিন্তা সমস্ত স্বাদ নষ্ট করিয়া দেয় এবং তাহার নিকট মাটি ও মিষ্টি উভয়ই সমান।

এইরূপে বেহেশ্‌তে যদি এই আশঙ্কা থাকিত যে, হয়ত কোন সময় এই সমস্ত নেয়ামত কাড়িয়া নেওয়া যাইতে পারে, তবে বেহেশ্‌তী কোন নেয়ামতেরই স্বাদ উপভোগ করিতে পারিত না ; বরং উক্ত নেয়ামত তাহার জন্য কঠিন কষ্ট হইয়া দাঁড়াইত। কেননা, নেয়ামত যত বড় হয়—উহা কাড়িয়া লওয়া হইলে ততোধিক কঠিন কষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে কোন সাধারণ নেয়ামত হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে খুবই কষ্ট হয়। অতএব, বেহেশ্‌তীদের নেয়ামত কাড়িয়া লওয়ার আশঙ্কা থাকিলে তাহাদের এত কষ্ট হইত যে, দুনিয়ার কোন কষ্টই উহার সমকক্ষ নহে। কাজেই যদি বেহেশতীরা

এই শুভ-সংবাদ প্রাপ্ত হয় যে, এখন হইতে আর কখনও আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না, তবে এই শুভ-সংবাদ তাঁহাদের প্রত্যেক নেয়ামতের পরিপূর্ণকারী হইবে। অন্যথায় এই শুভ-সংবাদের অভাবে সমস্ত নেয়ামতই অসম্পূর্ণ ছিল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষকে اكبر। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত বলা হইয়াছে।

কাজেই 'রেযা'র মোকামকে সর্বশেষ মোকাম বলা ঠিক হইয়াছে। আর যদি দুনিয়াতেও এই মোকাম লাভ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে—যেমন ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনগণ পার্থিব জীবনেই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের শুভ সংবাদ পাইয়াছিলেন: رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ "আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। কিন্তু দুনিয়াতে উহা লাভ করা সন্দেহ ও ধারণার পর্যায়ে রহিয়াছে এবং আখেরাতে উহা লাভ করা সুনিশ্চিত। কেননা, ইহলোকে কেহ কুতুব হইয়া গেলেও কোন দোষত্রুটি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার রেযা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

॥ মজলিসের আদব রক্ষা না করার অপরাধ ॥

দোষ-ত্রুটি বলিতে শুধু যেনা এবং চুরি উদ্দেশ্য নহে। খাছ লোকদের জন্য কেবল এসমস্ত গুনাহ্র কাজই অপরাধ নহে; বরং অতি সামান্য উক্তিও তাহাদের জন্য অপরাধ হইয়া যায়। ইহাতে মনে করিবেন না যে, তাঁহাদের শরীয়ত স্বতন্ত্র যাহাতে অপরাধমূলক কার্যগুলিও অন্যরূপ এবং এবাদতও অন্যরূপ। যেমন কোন কোন জাহেল কল্পনা করে যে, বুযুর্গী লাভ করিতে পারিলে মানুষের উপর হইতে এবাদতের দায়িত্ব হ্রাস পায়। পীর ছাহেব নামায পড়েন না। মুরিদগণ বলে, "হুযূর 'ফানা' হইয়া গিয়াছেন, "বিন্দু" সাগরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কিছুমাত্রও ব্যবধান নাই। এখন নামায পড়িলে তো নিজের নামাযই পড়া হইবে। গুনাহও তাঁহাদের কম হইয়া থাকে। এমন কি, তাঁহার সহিত মেয়েদের পর্দা করারও প্রয়োজন হয় না। অনেক পীরকে দেখা যায়, মুরিদদের গৃহে দ্বিধাহীন ভাবে বসবাস করেন। (ফল এই দাঁড়ায় যে, অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইয়া যায়।)

এসমস্ত কথা নিতান্ত বাজে। শরীয়ত সকলের জন্যই সমান, যে পর্যন্ত জীবন আছে, জ্ঞান ও অনুভূতি আছে, সে পর্যন্ত কোন এবাদতের দায়িত্ব হইতেই অব্যাহতি পাইতে পারে না। কোন গুনাহ্র কাজও জায়েয হইতে পারে না। অতএব, কাহারও জন্য কোন স্বতন্ত্র শরীয়ত নাই। তবে সামান্য সামান্য ব্যাপারে অপরাধ হওয়ার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সেই অপরাধ আইনগত নহে। উহা মজলিসের আদব রক্ষা না করার অপরাধ, আপনি যদি কোন বড় অফিসারের সম্মুখে যান, তবে আপনি কি

সেখানে কেবল আইনগত অপরাধের প্রতিই লক্ষ্য রাখেন ? যদি আপনি ডাকাতি কিংবা চুরির অপরাধে অপরাধী না হন, তবে কি আপনি তাঁহার সম্মুখে দর্প ও গর্বের সহিত নিঃসঙ্কোচে চলা-ফেরা করিবেন ? আপনি এরূপ ভাব প্রকাশ করিলে আপনার আচরণের প্রতি প্রশ্ন উঠিবে না ? প্রশ্ন উঠিলে কি আপনি বলিতে পারিবেন যে, 'আমি তো আইনগত কোন অপরাধ করি নাই" ? দুনিয়ার হাকিমের সম্মুখে তো আপনাদের এরূপ অবস্থা ; যাহা সকলেই অবগত আছে যে, একটু চক্ষু উঠাইয়া পর্যন্ত দৃষ্টি করেন না। কথা বলিতে রসনা আপনাদের সাহায্য করে না। হাটিতে পা কাঁপিয়া যায়। অথচ দুনিয়ার হাকিমের অস্তিত্বই কি ? আল্লাহ্ পাকের মহিমা ও মাহাত্ম্য যদি দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, তবে খোদাই জানেন, আপনাদের কি অবস্থা হইবে ? সম্ভবতঃ নিশ্বাস গ্রহণ করিতেও মনে করিবেন যে, অপরাধ হইয়া গেল। আল্লাহ্‌র যে সমস্ত বান্দা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, তাঁহাদিগকে মজলিসের আদবও রক্ষা করিতে হয় এবং সামান্য অসমতার দরুন তাঁহাদিগকে পাকড়াও করা হয়, যদিও শরীয়তের আইন অনুসারে তাহা অপরাধ নহে।

এক বুযুর্গ লোকের ঘটনা। বৃষ্টি বর্ষিলে তিনি বলিলেন : "আজ কেমন উপযোগী সময়ে বৃষ্টি বর্ষিয়াছে।" তৎক্ষণাৎ এল্‌হাম যোগে তাঁহাকে বলা হইল : "হে বে-আদব ! কোন্ দিন অনুপযোগী সময়ে বৃষ্টি হইয়াছিল ?" এতটুকুতেই তিনি বেহুশ হইয়া পড়িলেন। করিয়াছিলেন 'শোকর', হইয়া গেল 'বেআদবী'। আর তলব করা হইল কৈফিয়ত।

ইহা তাহাদের অপরাধ। আর আমাদের জন্য এই শব্দটি শোকরব্যঞ্জক, কাজেই সওয়াবের কারণ। দেখুন, শুধু 'আজ' শব্দটির জন্য তিরস্কার করা হইল।

কোন বুযুর্গ লোকের সময়ে জঙ্গলে বৃষ্টি বর্ষিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, এই বৃষ্টি বস্তীর মধ্যে বর্ষিলে কতই না ভাল হইত ! শুধু এতটুকু উক্তির জন্য তাঁহাকে বুযুর্গীর স্তর হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি তাহা টেরও পাইলেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ঘটনা বা ব্যাপার সম্বন্ধে ওলিগণের টের পাওয়া বা অবগত হওয়া জরূরী নহে। জানি না, মানুষ ওলীদিগকে কি মনে করে। যদিও ওলীরা অধিকাংশ সময়েই নিজের সম্বন্ধে সবকিছু জানিতে পারেন ; কোন কোন সময়ে হয়ত পারেনও না। যেমন আলোচ্য ঘটনার বুযুর্গ লোক নিজের অবনতি সম্বন্ধে টের পান নাই। অন্য একজন বুযুর্গ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এই বুযুর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে অপর একজন লোকের নিকট বলিয়া গেলেন যে, অমুক উক্তির কারণে এই বুযুর্গ লোকের উপর আল্লাহ্‌তা'আলা অসন্তুষ্ট। সেই লোকটি বলিল : আপনি তাঁহার নিকট ইহা প্রকাশ করিলেন না কেন ?' তিনি বলিলেনঃ 'আমার লজ্জা হইল।'

মনে করিলাম, প্রকাশ করিলেতিনি মনে দুঃখ পাইবেন,সে উক্ত বুযুর্গকে ইহা জানাইয়া দিবার জন্য অনুমতি চাহিল, তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন এবং লোকটি তাহা উক্ত বুযুর্গ লোককে জানাইয়া দিল। ইহা অবগত হইয়া তিনি খুব মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন: "ইহার প্রতিকারের জন্য আমার সাহায্য করুন।" প্রতিকারের উপায় এইরূপে করিয়াছিলেনযে, তাহাকেবলিলেন, দড়ি বাঁধিয়াআমাকে হেঁচ্ড়াও। ফলতঃ তাহাই করা হইল। "আল্লাহু আক্‌বার" যুগের এক শ্রেষ্ঠ পীরের এই অবস্থা।

ایں چنیں شیخ گدائے کو بکو "এই শ্রেণীর পীর অলিগলির ফকির।" আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের উপর এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। মানুষ তাছাওউফকে নানীর বাড়ী মনে করিয়া থাকে। এই হইলেন ছুফী। ছুফীদের এরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। রজ্জুবদ্ধ হইয়া হেঁচ্ড়াইয়া নিবার জন্য প্রস্তুত হও। তখন তাছাওউফের নাম মুখে আনিও। শুধু কাপড় রঙ্গাইয়া লওয়ার নাম তাছাওউফ নহে। কোন দুনিয়াদার এই বুযুর্গ লোকের অবস্থা দেখিলে ইহাই তো বলিত যে, এই ব্যক্তির মাথা বিকৃত হইয়াছে। এই মাত্র সুস্থ ও শান্ত অবস্থায় বসা ছিলেন। যুগের শ্রেষ্ঠ পীর, খানকায় থাকিয়া সম্মান পাইতেছিলেন, এই কি পাগলামি? দড়ি বাঁধিয়া হেঁচ্ড়ান হইতেছে। উত্তরে ইহা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে:

اے ترا خارے بپا نشکستہ کے دانی کہ چیست + حال شیر انے کہ شمشیر بلا برسر خورند

"ওহে, তোমার পায়ে একটি কাঁটাও বিধে নাই, তুমি কেমন করিয়া জানিবে যে, ঐ সমস্ত বাঘতুল্য সাহসীর অবস্থা কিরূপ যাঁহারা মাথায় বিপদরূপ তরবারির আঘাত খাইতেছেন?" তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা কর, খোদা তা'আলা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে জানিয়া তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইয়াছে। ইহার মোকাবেলায় প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়াও কিছুই নহে। দুনিয়া তাঁহাকে পাগল বলিলে কি হইবে। তিনিই দুনিয়াদারকে পাগল মনে করেন। গায়েব হইতে আওয়ায আসিল—ব্যস্, আর কখনও এমন বেআদবী করিও না। তৎক্ষণাৎ সেই লোকটি তাঁহার পায়ের রশি খুলিয়া দিল। মোটকথা, দুনিয়াতে থাকিতে থাকিতে কদাচিৎ অপরাধ করিয়া ফেলার সম্ভাবনা থাকে। তাঁহাদের অপরাধও সাধারণ লোকের চেয়ে সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। অতএব, অপরাধ তাঁহাদের অনেকেই হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর অপরাধ করিলে খোদার সন্তোষ হারাইতে হয়। কাজেই দুনিয়াতে কে শান্তি ও নিশ্চিন্ততার সহিত বাস করিতে পারে? যে পর্যন্ত এসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হওয়া যায়, সে পর্যন্ত সমস্ত কাজই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রতি মুহূর্তে নানা প্রকারের আশঙ্কা লাগিয়া থাকে। এই আশংকা অবশ্যই বেহেশ্‌তে থাকিবে না। ইহার অর্থ এই নহে যে,জান্নাতবাসীরা নাফরমানী করিলেও তাহাদিগ হইতে আল্লাহুর সন্তোষ রহিত করা হইবে না; বরং রহস্য এই যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার পরে, আল্লাহু তাআলা অসন্তুষ্ট হন,

এমন কোন কাজই তাঁহাদের দ্বারা হইবে না। ফলকথা, 'রেযা' একটি মহান সম্পদ। ইহা যাবতীয় মোকামের পরিপূরক এই কারণেই উহাকে (রেযাকে) সর্বশেষ মোকাম বলা হইয়াছে।

॥ ফানার অর্থ ॥

কেহ কেহ 'ফানা'কে সর্বশেষ মোকাম বলিয়াছেন। 'ফানার' অর্থ মৃত্যু নহে। কখনও কেহ মনে করিতে পারে যে, হত্যা করিয়া লও তাহা হইলেব্যস সমস্ত মোকাম অতিক্রম হইয়া যাইবে। মৃত্যু হইল জীবনের শেষ সীমা, তরীকতের শেষ মোকাম নহে। 'ফানা' শব্দের অর্থ—গুনাহের কাজ এবং আল্লাহ্ তা'আলারঅসন্তোষ উৎপাদক কার্যাবলী সম্বন্ধীয় নাফ্‌সের খাহেশ নির্মূলভাবে খতম হইয়া যাওয়া। নাফ্‌সের খাহেশ যে পর্যন্ত শেষ না হইবে, সে পর্যন্ত সে বেহুদা কাজে, কু প্রবৃত্তিজনিত কাজে এবং স্বার্থপরতায় লিপ্ত হইয়া যায়। নাফ্‌সের এসমস্ত খাহেশ লোপ পাওয়ার নামই 'ফানা'। আর فنا ضا অর্থাৎ, খাহেশ্ শব্দটি এই জন্য বলিলাম যে, নাফরমানী-মূলক কাজের প্রতি নাফ্‌সের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাওয়া জরুরী নহে। অবশ্য তৎপ্রতি নাফ্‌সের খাহেশ বিলুপ্ত হওয়া আবশ্যক এবং মুজাহাদা ও সাধনার দ্বারা তাহা হাছিল হইতে পারে। মুজাহাদা অর্থাৎ চেষ্টার ফলে নাফ্‌স্ এমন বশীভূত হইয়া পড়ে যেমন সভ্য ঘোড়া বশে আসিয়া যায় এবং আরোহীর অনুগত হইয়া যায়, অথচ উহার শক্তি এবং গতি সবকিছুই ঠিক থাকে। হাঁ, এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই হয় যে, পূর্বে উহার গতি ও দৌড় নিজের খাহেশ অনুযায়ী ছিল, এখন আরোহীর ইচ্ছানুরূপ হইয়া গিয়াছে।

সারকথা এই যে, নাফ্‌সে আম্মারাই কালক্রমে নাফ্‌সে মুত্‌মাইন্নায় পরিণত হয় নাফ্‌সে মুত্‌মাইন্নাহ্ অন্য কোন পদার্থ নহে। এই নাফ্‌সেরই এক অবস্থা 'আম্মারাহ্'। এই অবস্থা লোপ পাইয়া আর এক অবস্থার উৎপত্তি হয়। ইহাকেই 'মুত্‌মাইন্নাহ্' বলে। মুত্‌মাইন্নার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এমন নহে যে, গুনাহের কাজ করার খাহেশ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। কেননা, মূল গুণ তো উহার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু মুত্‌মাইন্নাহ্ হইলে অবস্থা এরূপ হয় যে, যদিও কোন সময় গুনাহের কাজের খাহেশ হয় কিন্তু উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কঠিন হয় না। যেমন, শিক্ষিত ও সভ্য ঘোড়া। এখনও সময় সময় দুষ্টামি করিতে চায়; কিন্তু শিক্ষার ক্রিয়া এই হয় যে, আরোহীর পক্ষে উহাকে বশ মানাইতে বেগ পাইতে হয় না। যেরূপ অশিক্ষিত ও অসভ্য ঘোড়াকে বশ করিতে বেগ পাইতে হয়। নাফ্‌স্ মুত্‌মাইন্নাহ্ হইলে মানুষ এই ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। যেমন, প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা খুবই কঠিন, যদিও

অসম্ভব এবং সাধ্যাতীত নহে। অন্যথায় ইহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ অসম্ভব ও অসাধ্য সাধনের পর্যায়ভুক্ত হইবে। বলা বাহুল্য, সর্বদা মাথা নীচু করিয়াও রাখা যাইতে পারিত কিন্তু উহাতে অস্থিরতা অত্যধিক হইত এবং প্রায় সাধ্যের অতীত ছিল। আর মুজাহাদার পর এই অবস্থা হয় যে, এইরূপ আকর্ষণও পূর্বের মত থাকে না। অর্থাৎ সর্বদা লাগিয়া নাই। কোন কোন সময় হয় বটে; কিন্তু নিবৃত্ত করিলে পূর্বের ন্যায় তত কষ্ট হয় না। নিবৃত্ত করিতে চাহিলে সহজেই সফলকাম হওয়া যায়। পূর্বে দৃষ্টি ফিরাইতে ইচ্ছা করিলে অনেক সময় কৃতকার্যও হইতে পারিত না। কৃতকার্য হইতে পারিলেও অত্যধিক কষ্ট হইত। অবশ্য সে কষ্টও কু-দৃষ্টি জনিত কষ্ট অপেক্ষা লঘু ছিল। কু-দৃষ্টি বড় সাংঘাতিক বস্তু। স্বয়ং কু-দৃষ্টিকারীরা স্বীকার করিয়াছে: بحیرتم که عجب تیر بکمان زدهٔ "আমি বিস্মিত, ধনুক ব্যতীত বিচিত্র তীর নিক্ষেপ করিয়াছ।"

কু-দৃষ্টি বাস্তবিকই এমন বস্তু যাহার ক্রিয়া তীরের চেয়েও অধিক, যদিও দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখাতে কষ্ট অবশ্যই হয়, কিন্তু এই কষ্ট ক্ষণেকের জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ডাইনী এবং তাহার সাজসজ্জা ও বেশ-ভূষা চোখের সম্মুখে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়া বাস্তবিকই গুর্দাওয়ালা লোকের কাজ। কিন্তু একবার বলপ্রয়োগে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারিলে সমস্ত কষ্টের অবসান হইয়া গেল। আর যদি নাফ্‌সের ধোকায় পড়িয়া গেল এবং দৃঢ়তার সহিত কাজ না করিয়া একবার দেখিয়া লইল, তবেই আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। ভাল হউক মন্দ হউক নাফ্‌সের উপভোগ কিছুক্ষণের জন্য অবশ্যই হাছিল হইয়াছে। কিন্তু এমন আগুন লাগিয়াছে যাহা সারা জীবনেও নিভিতে পারে না। ইহা শুধু চর্ম এবং মাংসকেই দগ্ধ করিবে না; বরং কাপড় এবং ঘরকেও পুড়িয়া ছারখার করিয়া দিবে। আর এখন তো শুধু দৃষ্টির গুনাহ হইয়াছে, কিন্তু ইহা আসল গুনাহের কাজে না পৌঁছাইয়া এদিকে ক্ষান্ত হয় না এবং ইহা এক গুনাহ্ নহে, বহু গুনাহের বীজ। কু-দৃষ্টির মধ্যে বিশেষ করিয়া এই ক্রিয়া রহিয়াছে যে, একবার করিয়া কখনও নিবৃত্ত হয় না; বরং ইহার প্রত্যেকটি বার আর একবারের জন্য আগ্রহ প্রদানকারী হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া অন্য কোন পাপের মধ্যে নাই। কু-দৃষ্টি-কারীর মনে কখনও শান্তি আসে না। এখন দেখুন, কু-দৃষ্টি করার মধ্যেই কষ্ট অধিক, না একবার দৃঢ়তার সহিত দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়ার মধ্যেই অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়ার এই সামান্য কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই অশেষ কষ্ট খরিদ করিয়া লয়। আর একটি আশ্চর্য কথা এই যে, দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়ার মধ্যে সামান্য কষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তৎপর উহা শান্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারিয়াছে সে ব্যক্তিই তাহা জানে।

যদি এই কথাটুকু মনের মধ্যে খেয়াল রাখে, তবে কু-দৃষ্টির পাপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ফলকথা, কু-দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে যে কষ্ট হইয়া থাকে, মুজাহাদার ফলে নাফ্‌সের মধ্যে এমন অবস্থা উৎপন্ন হয় যে, পুনরায় মনকে নিবৃত্ত করা কঠিন হয় না এবং চেষ্টার পূর্বে যে কষ্ট হইত এখন আর তদ্রূপ কষ্ট হয় না। ব্যস্, ইহারই নাম 'ফানা' অর্থাৎ নাফ্‌সের কু-প্রবৃত্তির অবসান ঘটাইয়া দেওয়া। এমন কখনও সম্ভব হয় না যে, নাফ্‌সের মধ্যে পাপ কার্যের প্রতি আকর্ষণ শক্তিই থাকে না এবং পাপ কার্যের স্বাদই তিরোহিত হইয়া যায়।

॥ সবকিছুই তিনি ॥

হাঁ, প্রাথমিক অবস্থায় কোন কোন সময় অবস্থার উত্তেজনায় ও প্রাবল্যে এরূপ অবস্থা হয় যে, গুনাহের কাজের প্রতি মুলেই কোন আকর্ষণ হয় না, কিন্তু অবস্থা যেহেতু দীর্ঘ-স্থায়ী নহে, কাজেই এরূপ অবস্থা কিছুক্ষণ পরেই দুর হইয়া যায়। অতঃপর সমতার সহিত এক দৃঢ় অবস্থা উৎপন্ন হইয়া গুনাহের কাজের প্রতিবন্ধক হয়। উহাকে গুনাহের খাহেশ না থাকা বলিয়া প্রকাশ করা হইতেছে, কিন্তু তরীকত পন্থী অজ্ঞতা বশতঃ ইহার প্রাথমিক অবস্থাকে দ্বিতীয় অবস্থার চেয়ে অপেক্ষাকৃত পুর্ণ মনে করিয়া ধারণা করে যে, আমার অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে, আমার অবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সে ধোকায় পতিত হইয়া পীরের নিকট অভিযোগ করে যে, আমার মধ্যে পুর্বের মত আ'মলের জোশ নাই। মনে হয়, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আমার সম্পর্ক হ্রাস পাইয়াছে এবং ইহা তরীকত পন্থীর জন্য এমন একটি অবস্থা যাহার জন্য সে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়া যায়।

অতএব, ইহার প্রকৃত তথ্য এই যে, সম্পর্ক হ্রাস পায় নাই। তবে দৃঢ় অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার ফলে যাবতীয় আ'মল তাহার দ্বারা সমতা ও সহজ ভাবে সম্পন্ন হইতে আরম্ভ করে। সেই জোশের ন্যূনতা হেতু সে মনে করে যে, মহব্বত হ্রাস পাইয়াছে এবং এটুকু বুঝে না যে, জোশ বা উত্তেজনা সর্বদার জন্য থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। এরূপ অবস্থা মন্দ নহে।

কোন একজন বুযুর্গ লোক এই অবস্থার ব্যাখ্যা খুব ভালরূপে করিয়াছেন। এই বুযুর্গ লোক মাওলানা ফযলুর রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদী। কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট অভিযোগ জানাইল যে, "আজকাল আমি যেক্‌র ফেক্‌রে পুর্বের ন্যায় জোশ ও উৎসাহ পাইতেছি না।" তিনি বলিলেন: বিবী পুরাতন হইলে মা হইয়া যায়। দেখুন, কথাটি নিতান্ত সাধারণ লোকের কথার ন্যায় বটে; কিন্তু আসল তথ্য ইহা দ্বারা পুর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, প্রথম অবস্থায় বিবীর প্রতি যে মাদকতা ও উত্তেজনা ছিল, পুরাতন হওয়ার পর তাহা থাকে না। ইহাতে বলা যায় না

যে, বিবীর প্রতি মহব্বত কমিয়া গিয়াছে ; মহব্বত তো এখন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু পূর্বের মত জোশ নাই।

মহব্বতের অবস্থা তো এইরূপ হয় যে, জনৈক আমীর লোকের বিবীর মৃত্যু হইল। লোকটি সমাজের প্রধান ছিল, হাকিম এবং অফিসার মহলেও তাঁহার খুব সম্মান ছিল। তাঁহার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কালেক্টর সাহেব আসিলেন এবং যথোপযোগী ভাষায় বলিলেন : "আপনার বিবীর মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত।" তখন আমীর লোকটি বলিলেন : "সাহেব, সে আমার স্ত্রী ছিল না, সে আমার মা ছিল। আমাকে রুটি পাকাইয়া খাওয়াইত।" কালেক্টর সাহেব হাসিতে লাগিলেন। অতএব, দেখুন, যদিও মা ছিল না কিন্তু মায়ের ন্যায় কেমন প্রিয় ছিল! তরীকতের পথেও এইরূপই অবস্থা। প্রথমতঃ, আগ্রহ এবং উৎসাহের খুবই আতিশয্য থাকে। তদবস্থায় কোন বস্তুই ভাল লাগে না। ধন-দৌলতও ভাল লাগে না, বিবী-বাচ্চাও ভাল লাগে না, গুনাহের কাজের প্রতি আদৌ আকর্ষণ হয় না। ইহা যেন ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিলুপ্ত হওয়ার অবস্থা। কিছুদিন পরে সেই জোশ ঠাণ্ডা ও শান্ত হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ঠিক হইয়া যায়। এখন পূর্ণরূপে মানবতা প্রাপ্ত হয়, যাহাকিছু ভাল উহা ভাল বোধ হয়। কিন্তু অবস্থা তখন এইরূপ হয় যে, ভাল জিনিষকে ভাল বলিয়া তো বোধ করে কিন্তু পাপ কাজের ইচ্ছা তখন হইতে পারে না। কেহ সামনে পড়িলে মাথা নীচু করিয়া লয়। তখন তাহার পূর্বেকার অবস্থা স্মরণ করা উচিত। এক সময় এমন ছিল যে, দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়াকে কষ্টকর বলিয়া মনে করা হইত কিন্তু এখন তাহা মুশ্‌কিল নহে। ইহা তাছাওউফ রূপ দৌলৎ হাছিল হওয়ার লক্ষণ এবং ধোকা হইতে মুক্তি লাভ। এই সম্পদের নামই 'ফানা'। এই ফানা বহুবিধ মোকামের মধ্যে একটি মোকাম বিশেষ, সর্বশেষ মোকাম নহে।

হালের বিভিন্ন স্তরের একটি স্তরকেও 'ফানা' নামে অভিহিত করা হয়। মোকামকে কেহ কেহ হাল বলিয়া ভ্রম করে, সে 'ফানা'কে হালের সহিতই খাছ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তদবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে না এবং অপরের প্রতি তাহার লক্ষও থাকে না। সে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে কেবল খোদাই খোদা দেখিতে পায়। এ সময় তাঁহার উপর এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ধ্যান প্রবল থাকে। এই অবস্থায়ই সে বলে, همه اوست অর্থাৎ, খোদাই সব কিছু," অর্থাৎ, দুনিয়াটা খোদাতেই পরিপূর্ণ। ইহাতে খোদা ছাড়া আর কোন পদার্থই নাই। এরূপ অর্থ নহে যে, "সমস্ত পদার্থই খোদা।" নাকালগণ এরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছে। খোদার অস্তিত্বে নিমগ্ন ব্যক্তির দৃষ্টি বা লক্ষ্য অপর কোন বস্তুর প্রতি তো থাকেই না। তবে এরূপ অর্থ কেমন করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, পুনরায় "সমস্ত পদার্থই খোদা।" বহু লোক همه اوست শব্দের অনেক রকম বিকৃত অর্থ

গ্রহণ করিয়াছে, অথচ কথাটি খুবই সহজবোধ্য এবং আমাদের প্রচলিত কথা বার্তার মধ্যেও এই জাতীয় কথা বিদ্যমান আছে।

যেমন কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট যাইয়া ফরিয়াদ করিল, হুযুর! আমার প্রতি যুলুম করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন: এসম্বন্ধে পুলিশে রিপোর্ট কর, যথারীতি মোকদ্দমা দায়ের কর, কাহাকেও উকীল নিযুক্ত কর। তখন সে বলিল, হুযুর আপনি আমার পুলিশ, আপনিই আমার উকিল। তবে কি ইহার অর্থ এই যে, কালেক্টর সাহেব উকিলও অর্থাৎ, ওকালতি তাঁহার পেশা এবং তিনি পুলিশও অর্থাৎ, তিনি কনেষ্টবলও, কিংবা কোতোয়ালও? না, তাহা নহে; বরং তাহার উদ্দেশ্য এই যে, পুলিশ কিছুই নহে, উকিল কিছুই নহে, যাহাকিছু আছে সব আপনিই এবং ইহার এই অর্থও নহে যে, পুলিশ এবং উকিলের অস্তিত্বই দুনিয়াতে নাই; বরং তাহারা আছে। কিন্তু আপনার সম্মুখে তাহাদের অস্তিত্ব কোন অস্তিত্বই নহে বরং না থাকারই মত। অতএব, তাহাদের অস্তিত্ব যখন নাই, তবে কালেক্টর সাহেবের অস্তিত্বই অস্তিত্ব এবং পুলিশের ও উকিলের স্থানেও তিনিই আছেন। এই অর্থে তাঁহাকে همه اوست "তিনিই সব" বলা হয়। همه اوست -এর এই অর্থ একেবারে পরিষ্কার। মানুষ প্রকৃত তাছাওউফ না জানিয়া শুধু উক্তি নকল করিতে থাকে। কিন্তু হাল নকল করার বস্তু নহে। হালের প্রাবল্যের সময়ে এই মর্মেই 'জামি' বলিয়াছেন:

بسکه درجان فگار وچشم بیدارم توئی + هر که پیدا می شود از دور پندارم توئی

"ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার আহত প্রাণে এবং জাগ্রত চক্ষুতে তুমিই বিরাজ করিতেছ। দূর হইতে যাহাকিছু দেখা যায়, আমি ধারণা করি তাহা তুমিই।"

মানুষ কাহারও প্রতি আশেক হইলে তাহার ধ্যান প্রত্যেক বস্তু হইতেই মা'শুকের দিকে ধাবিত হয়; বরং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সে মা'শুককেই দেখিতে পায়।

যেমন কেহ বলিয়াছে:

جب کوئی بولا صدا کانو نمیں آئی آپکی

"যে কেহ কথা বলুক আমার কানে আপনার কথার শব্দই আসিয়া থাকে।" জামী (রঃ) উপরোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিলে, জনৈক আহমক, হালের প্রাবল্য সম্বন্ধে যাহার কোন ধারণা নাই; বরং সে ইহা বিশ্বাস করিত না—বলিয়া উঠিল, اگر خر پیدا شود অর্থাৎ, "যদি দূর হইতে গাধা দেখ?" মোল্লা জামী তৎক্ষণাৎ বলিলেন: پندارم توئی "আমি ধারণা করিব তাহা তুমিই।" আহমক লোকটি দাঁত ভাঙ্গা জবাব পাইয়া নীরব হইয়া গেল। ইহা মোল্লাজামীর কৌতুকতা বিশেষ।

মোটকথা, নাফ্‌সের খাহেশ বিলোপকারীর উপর এই 'ফানা' হালের স্তরেও আসিয়া পড়ে। এই 'ফানা' হাল এবং পূর্বোক্ত 'ফানা' মোকাম। মোকাম ইচ্ছাধীন

হাল ইচ্ছাধীন নহে। অতএব, 'ফানা' দুই স্তরে বিভক্ত 'মোকামী ফানা' আর 'হালী ফানা'।

॥ দাসত্বের মোকাম ॥

(ইতিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ লোক সভা ত্যাগ করিয়া যাইতে মনস্থ করিয়া মাওলানার সহিত মুছাফাহা করিতে হাত বাড়াইয়া দিল। মাওলানা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, ইহা কোন্ সভ্যতা ? ওয়াযের মধ্যস্থলে মুছাফাহা করিতে চাও। সে বলিল, আমার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।" বলিলেন, যাইতে হয় যাও। যাওয়ার সময়ে মুছাফাহা করা এমন কি ফরয কাজ ? দুঃখের বিষয় রসম ও প্রথা মানুষের রুচি এত বিগড়াইয়া দিয়াছে যে, ওয়ায মধ্যস্থলে বন্ধ হইয়া যাওয়ার খেয়ালও করে না এবং মজলিসের লোকের কষ্ট হওয়ার প্রতিও খেয়াল করে না। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া মুছাফাহা করিতে আসিয়াছে। যখন নামাযের জমাআতেই পাছের সারি হইতে লোকের ঘাড়ের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া সম্মুখের সারিতে আসা জায়েয নহে, তখন মুছাফাহার জন্য ডিঙ্গাইয়া আসা কেমন করিয়া জায়েয হইবে ? সভ্যতা ইংরেজী শিক্ষার দ্বারাও আসে না এবং কেহ শিখাইলেও শিক্ষা পায় না। ইহা শুধু আল্লাহ্ওয়ালা লোকের সংসর্গের মাধ্যমে হাছিল হইতে পারে। কেহ যদি সভ্যতার দাবীদার থাকে আহ্লুল্লাহর সংসর্গে পৌঁছিলে সংসর্গের আলোকে দেখিতে পাইবে যে, যাহাকে সে সভ্যতা বলিয়া মনে করিতেছে তাহা শুধু কৃত্রিম সভ্যতা। প্রকৃত সভ্যতা আল্লাহ্ওয়ালা লোকের দরবারেই পাওয়া যায়। যাহা হউক, খোদা সেই বুড়ো লোকটির মঙ্গল করুন যাহার বদৌলতে তাহ্যীবের অর্থাৎ, সভ্যতার মাস্আলাও বর্ণিত হইয়া গেল। যদিও ওয়াযের মধ্যস্থলে ফাঁক পড়িল।)

কেহ কেহ আব্দিয়ৎ অর্থাৎ, দাসত্বকে সর্বশেষ মোকাম বলিয়াছে। ইহাকে 'বাকা'ও বলা হয়। ফানার পরে আর একটি অবস্থা উৎপন্ন হয় উহার নাম আব্দিয়ৎ বা দাসত্ব। ফানার মধ্যে হালের প্রাবল্য থাকে। এই অবস্থায় পৌঁছিয়া সেই 'হাল' পরাভূত হইয়া যায়, স্থৈর্য আসিয়া পড়ে এবং একেবারে প্রাথমিক লোকের ন্যায় অবস্থা হইয়া যায়। ফানার মধ্যে যে হাল প্রবল থাকে উহা ছিল উন্নতির অবস্থা। আর ফানার পরে যে স্থৈর্য আসে তাহা অবনতির অবস্থা। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছি, বুঝিয়া লউন। ইহাকে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময় সংকীর্ণ। সুতরাং একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব। ইহা হইতে বিষয়টি ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন, এক ব্যক্তি "শামসে বাযেগা" পর্যন্ত পৌঁছিল। ইহাতে সে শেষ সীমায় অধিষ্ঠিত হইল। এখন যদি সে প্রাথমিক স্তরের "মীযান" কিতাবটি কোন ছাত্রকে পড়াইতে বসে, তবে তাঁহার হাতে "মীযান" দেখিয়া

কেহ কি মনে করিতে পারে যে, এই লোকটি এবং সেই মীযান পাঠকারী ছাত্রটি সমান? কিংবা সেই লোকটির উভয় অবস্থাকে—অর্থাৎ, যে অবস্থায় সে সবে মাত্র মীযান পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যে অবস্থায় সে মীযান হাতে লইয়া পড়াইতে বসিয়াছে, সমান মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে যে, এই ব্যক্তির অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে? কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রথমে তাহার হাতে 'মীযান' ছিল শিখিবার উদ্দেশ্যে। তখন ছিল তাহার ওরুজ বা উন্নতির অবস্থা। আর এখন মীযান হাতে লইয়াছে পড়াইবার উদ্দেশ্যে। ইহাকে নুযূল বা অবতরণ বলে।

অবতরণের অর্থ কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, উন্নতি হইতে এখন অবনতি ঘটিয়াছে। কেননা, ইহা সেই অবনতি যাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—ما النهاية "শেষ কি?" উত্তরে বলা হইয়াছিল, العود الى البداية "প্রারম্ভের দিকে ফিরিয়া আসা"। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করা হইল শেষ পর্যায়ের অবস্থা কি? উত্তর হইল প্রারম্ভের দিকে ফিরিয়া আসা। ইহা বাহ্যিকরূপে অবনতিই বটে, কেননা, ইহাতে বাহ্যিক অবস্থা একেবারে প্রাথমিক অবস্থার মতই হইয়া যায়। কিন্তু প্রভেদ এই যে, প্রথমে শূন্য ছিল আর এখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে নিজে ফয়েয হাছিল করিত, এখন তাহা হইতে অপরে ফয়েয প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থাকেই বলে "বাকা"।

॥ মাহ্‌বূবিয়্যৎ বা প্রিয়তার মোকাম ॥

কেহ কেহ বলিয়াছেন, (স্পষ্ট ভাষায় দেখা যায় নাই, ইঙ্গিতাদি দ্বারা বুঝা যায়) যে, প্রিয়তা সর্বশেষ মোকাম। নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিয়া থাকেন।

وَلَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّذِىْ يَبْطِشُ بِهٖ *

"অর্থাৎ, আমার বান্দা নফল এবাদতের সাহায্যে আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে, এমন কি আমি তাহাকে মাহ্‌বূব করিয়া লই। যখন আমি তাহাকে প্রিয় করিয়া লই, তখন আমি হই তাহার কান যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি হই তাহার চক্ষু, যদ্দ্বারা সে দেখে এবং আমি হই তাহার হাত যদ্দ্বারা সে ধরে।" এই হাদীসের শব্দগুলি এবিষয়ে খুবই স্পষ্ট। কেননা, শেষ সীমাবোধক حتى রহিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করাকে শেষ সীমারূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে। অতএব, অর্থ এই দাঁড়ায়, নৈকট্য লাভের শেষ সীমা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হওয়া। এখন উক্ত উক্তির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হওয়াই সর্বশেষ মোকাম।

ফল কথা, সর্বশেষ মোকাম সম্বন্ধে এতগুলি উক্তি রহিয়াছে—কেহ বলেন, 'রেযা' সর্বশেষ মোকাম, কেহ বলেন, 'ফানা,' কেহ বলেন, বান্দা হওয়া, কেহ বলেন, প্রিয় হওয়া শেষ মোকাম। এই বিভিন্ন উক্তিগুলির মধ্যে বিরোধ নাই ; বরং ইহাদের মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, 'ফানা' ভিন্ন পুর্ণ 'রেযা' হইতে পারে না। অতঃপর ফানা ও রেযার পরে যেহেতু অবতরণ অর্থাৎ প্রশান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অনিবার্য, কাজেই এই প্রশান্ত অবস্থাকে 'বাকা'ই বলুন কিংবা 'আবদিয়াৎ' বা দাসত্ব বলুন উভয়েরই সারমর্ম এক। এমতাবস্থায় চরম নৈকট্য অবধারিত। আর চরম নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই মোকামগুলির নাম যাহাই রাখুন সবগুলি একে অন্যের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। কিংবা এই বিভিন্ন উক্তিগুলির এইরূপে মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, মোকামাতের মধ্যে সর্বশেষ মোকাম 'রেযা,' আর হালের মধ্যে সর্বশেষ হাল 'ফানা'। ইহা ওরুজ অর্থাৎ উন্নতির অবস্থা। আর নুযুল বা অবতরণের সর্বশেষ স্তর আব্‌দিয়াৎ। বাকী রহিল মাহ্‌বুবিয়াৎ। ইহাকে উন্নতির পর্যায়েও দাখিল করিতে পারেন কিংবা অবতরণের পর্যায়েও দাখিল করিতে পারেন। এইরূপে উক্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। ইহাই উক্তিগুলি সম্বন্ধীয় মীমাংসা।

এখন আমি সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষণটি বর্ণনা করিব যাহা সম্বন্ধে অদ্যকার ওয়াযের প্রথম ভাগে বলিয়াছিলাম যে, পরশু দিনের ওয়াযের উদ্দেশ্য যেমন ছিল একটি ভুল প্রকাশ করা, তদ্রূপ অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য একটি বিষয়ে অভিযোগ করা।

॥ অদ্যকার ওয়াযের উদ্দেশ্য ॥

তাহা এই যে, ধর্মে-কর্মে পুর্ণতা লাভ করার পুর্বে তৃপ্তি কেন আসিয়া পড়ে ? এই পুর্ণতা লাভ বিষয়টির তথ্য বিশ্লেষণের জন্যই সর্বশেষ আমল নির্ণয় করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহা যখন আমি বর্ণনা করিয়া দিয়াছি কাজেই এখন আমি সেই অভিযোগটি উল্লেখ করিতেছি। এতটুকু বর্ণনার ফলে হয়ত আপনারা সেই অভিযোগটি ভালরূপে বুঝিয়াও গিয়াছেন। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য এই যে, যাহাকিছু বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আ'মল কর এবং লাভ কর। কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাবেই পুনরায় বলিয়া দিতেছি, অর্থাৎ যখন আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন সর্বশেষ মোকাম এই, তখন আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, আমাদের মধ্যে তাহা হাছিল হইয়াছে কি না এবং যে পর্যন্ত তাহা উৎপন্ন না হইবে সে পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকা উচিত। তৎপুর্বে তৃপ্ত হইয়া বসিয়া কেন থাকিব ?

কোন দিল্লীর যাত্রীকে দুই এক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করিয়াই গমনে ক্ষান্ত দিয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়াছেন কি ? এমন কি দিল্লী শহরের নিকটে পৌঁছিয়াও

শহরের বাহিরে কোন স্থানে থাকিয়া যাওয়াও পছন্দ করে না; বরং শহরে পৌঁছিয়াও তাহার সাধ্যানুযায়ী উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট স্থান বাছিয়া লইতে ত্রুটি করে না। ইহা অতিরঞ্জন নহে, যদি সাধ্য হয়, শাহী মহল ব্যতীত অন্য কোন গৃহ কিংবা হোটেলে যাইয়া বাস করিতেও চায় না। তবে ধর্ম-কর্মে গন্তব্য স্থানের এদিকে থাকিতে তৃপ্ত হওয়ার কারণ কি? তখন এসমস্ত মোকামাত হাছিল না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালু রাখা হয় না কেন?

اندریں رہ می تراش ومی خراش + تادم آخر دمے فارغ مباش
تادم آخر دم آخر بود + کہ عنایت با تو صاحب سر بود

"এই রাস্তায় সর্বদা ঘর্ষণ মার্জন করিতে থাক। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তকালও নিষ্কর্ম বসিয়া থাকিও না, যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী তোমার সঙ্গী থাকে।" অর্থাৎ, অবিরাম চেষ্টায় লাগিয়া থাক। কোন মুহূর্তে নিশ্চেষ্ট থাকিও না এবং নিরাশও হইও না। ইহাও মনে করিও না যে, এসমস্ত মোকাম লাভ করা আমার সাধ্যে নহে। চেষ্টা ও অন্বেষণে লাগিয়া থাক। ইন্‌শাআল্লাহ্ উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইহাই হইল সর্বশেষ মোকামের তথ্য। ইহার জন্য যাহাকিছু উচিত ছিল বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন নিম্নোক্ত আয়াতটির মর্মের সহিত আমার বর্ণিত বিষয়গুলিকে মিশাইয়া লউন এবং ইহার পরেই আমি ওয়ায শেষ করিয়া দিব :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

এখানে দুইটি বাক্য। প্রত্যেকটি বাক্যে দুইটি করিয়া মোকামের উল্লেখ রহিয়াছে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ "আর মানুষের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে যাহারা নিজেদের নাফ্‌সকে বিক্রয় করিয়া ফেলে," ইহাতে 'ফানা'-এর মোকাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, شراء শব্দের অর্থ বিক্রয় করিয়া ফেলা। যে বস্তু বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, বিক্রেতার উহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে না, উহা ক্রেতার হইয়া যায়। নিজের জানকে যখন বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল, তখন জানের চেয়ে নিম্ন স্তরের যাবতীয় পদার্থ আরও উত্তমরূপে বিক্রিত হইয়া গিয়াছে। অতএব, জান বিক্রয় করিয়া ফেলার পর নিজের বলিতে আর কিছু অবিক্রিত থাকে নাই। কোন বস্তুতেই কোন প্রকারের হস্তক্ষেপের অধিকার রহিল না। ইহারই নাম 'ফানা'। ইহার পর দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ হইয়াছে—'বাকা'। ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ অর্থাৎ, এই বিক্রয় কার্যটি করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলার রেযা অর্থাৎ, সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে। ইহাতে পরিষ্কার শব্দে 'রেযার' মোকাম বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, এক বাক্যে 'ফানা' ও 'রেযা' উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় বাক্যে وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ এখানেও দুইটি শব্দ রহিয়াছে। এক এক শব্দে এক একটি করিয়া মোকাম উল্লেখিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার কার্য

এইরূপ যে, তিনি رَءُوْفٌ অর্থাৎ, অতিশয় মেহেরবান। رَأْفَتٌ বলা হয়, চরম অনুগ্রহকে। বান্দাকে মাহ্বুব করিয়া লওয়ার চেয়ে অধিক মেহেরবানী আর কি হইতে পারে? সুতরাং ইহা মাহ্বুবিয়্যতের মোকাম। আর এই ব্যবহার হয় বান্দার (عِبَاد) সহিত। অর্থাৎ, যাহারা আব্দিয়াতের মোকাম লাভ করিয়াছে।

দেখুন, চারিটি মোকামই এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতটি লোকে প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকে, আলেমগণও সর্বদা পড়িয়া থাকেন, কিন্তু কেহ কখনও এদিকে খেয়াল করেন না যে, ইহাতে তাছাওউফ কতটুকু পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই তাছাওউফের এল্ম্ ছুফিয়াই কেরামের সংসর্গে থাকিলে লাভ করা যায়। তখন মূল্য বুঝা যায়। আল্লাহ্ওয়ালাগণ কেমন সুন্দর ভাবে কোরআনকে বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য কোরআনে সবকিছুই বিদ্যমান রহিয়াছে। অপর লোকের গায়ে ইহার বাতাসও লাগিতে পারে না। দেখুন, আয়াতটিতে দুইটি বাক্য রহিয়াছে। উহাতে চারিটি মোকামই কেমন পরিষ্কারভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই বর্ণনায় শুধু আমার ওয়াযকে মুখরোচক করা উদ্দেশ্য ছিল না। কোরআনের বালাগৎ (উচ্চাঙ্গীন ভাষা) দেখাইবার সাথে সাথে ইহাও দেখান উদ্দেশ্য ছিল যে, ছুফিয়ায়ে কেরামের উক্তিগুলি মনগড়া নহে; বরং তাঁহাদের প্রত্যেকটি কথাই কোরআন ও হাদীস শরীফের অনুরূপ এবং সোজাসুজি অন্তরেও গ্রহণ করে। ইহাতে কোন পরিবর্ধন ও পরিবর্তন নাই। কোন প্রকারের মারপ্যাচ নাই। একেবারে সর্বসাধারণের বোধগম্য।

উদ্দেশ্যের সারমর্ম এই, নিজের অবস্থাকে যাচাই করিয়া দেখ এবং বুঝিয়া লও যে, যে পর্যন্ত আমরা এসমস্ত মোকাম হাছিল না করিব, সে পর্যন্ত আমরা অপূর্ণ। চেষ্টা করিতে থাক, গতি মন্থর করিও না, গন্তব্য স্থলে পৌছার পূর্বে এদিকে তৃপ্ত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হইও না। সেই মোকামসমূহ হাছিল হওয়া সম্বন্ধে তোমাদের সিদ্ধান্ত ধর্তব্য নহে। কেননা, এমনও অনেক সময় হইয়া থাকে যে, কোন ভাল অবস্থার উদ্ভব দেখিতে পাইলেই বুঝিয়া লয় যে, আমি অমুক মোকাম লাভ করিয়াছি। নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলে, প্রকৃতপক্ষে ইহার সিদ্ধান্তকারী আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ আ'আলার দৃষ্টিতে যখন তোমার অবস্থা সংশোধিত এবং সঠিক হইয়া যাইবে, তখন তুমি শান্ত হইতে পার, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও অবস্থা সঠিক হওয়ার সংবাদ দিতে বা অনুমোদন করিতে আসেন না; কাজেই তিনি সাবরেজিষ্ট্রার পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেই সাবরেজিষ্ট্রারের অনুমোদনের উপরই তোমাদের অবস্থা সঠিক হওয়া নির্ভর করে। সেই সাবরেজিষ্ট্রার হইলেন আল্লাহ্ওয়ালাগণ। সাবরেজিষ্ট্রারের অনুমোদনই রেজিষ্ট্রারের অনুমোদন বলিয়া গণ্য হইবে। যখন আল্লাহ্ওয়ালাগণের নিকট অনুমোদন লাভ করিল, তখনই বলা হয় طُوْبٰى لَكُمْ "আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত তোমাদের জন্য মোবারক হউক। ইহার শোক্রগুযারী কর। কিন্তু এখনও চেষ্টা এবং গমনে ক্ষান্ত হইও না।

আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ভ্রমণ সমাপ্ত হইয়াছে। যেমন দিল্লীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিয়াছ। এখানেই পড়িয়া থাকিও না ; বরং দিল্লী দেখিতে আসিয়াছ, ভিতরে প্রবেশ কর। সেখানে এমন সব দর্শনীয় বস্তু দেখিতে পাইবে যে, অতঃপর কখনও তুমি দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিবে না। পরিশ্রম, চেষ্টা এবং সফরের কষ্ট সব কিছুই দরজা পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। এখন শান্তি ও মজা উপভোগের সময়। কিন্তু শেষ হওয়ার পরেও আরও চেষ্টা আছে। দিল্লীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াও তো পদব্রজেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে হইবে এবং আনন্দ ও আমোদ উপভোগের যে সমস্ত বস্তু রহিয়াছে সে সমস্ত বস্তুর নিকট পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য নড়াচড়া করিতে হইবে ; ইহাও এক প্রকার মুজাহাদা। ফলকথা, এখানেও মুজাহাদা শেষ করিও না। এই মুজাহাদার কোথাও শেষ নাই। সারা জীবনের ব্যাপার। সারকথা এই যে, প্রাথমিক অবস্থারও সংশোধন কর। অর্থাৎ, তওবা কর। পূর্ববর্তী ওয়াযে একথা আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, তওবাই সর্ব প্রথম আ'মল। অতঃপর সর্বশেষ কর্তব্যকে লক্ষ্যস্থল করিয়া অবিরাম চলিতে থাক। সে পর্যন্ত না পৌঁছিয়া গমনে ক্ষান্ত হইও না। কোন এক স্থানে যাইয়াই তৃপ্ত হইয়া বসিও না, যে পর্যন্ত না এই বিষয়ের অভিজ্ঞ কোন মহাপুরুষ তোমাকে বলিয়া দেন যে, তুমি এখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছ যাহা আজিকার বর্ণনায় প্রমাণিত হইল। এখন দোআ করুন, আল্লাহ্‌তা'আলা যেন আমাদিগকে সুবুদ্ধি, সৎসাহস এবং নেক কাজের তাওফীক দান করেন। 'আমীন' ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বন্ধুগণ! এলাহাবাদ শহরে দুইটি ওয়ায হইয়াছিল। একটির নাম ظاهر। অপরটির নাম باطن। উক্ত দুই ওয়াযে যাহের ও বাতেনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছিল। আর এই কানপুর শহরে পূর্ববর্তী ওয়াযে সর্ব প্রাথমিক আ'মল সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছিল। আর আজ সর্বশেষ আ'মল সম্বন্ধে বর্ণনা করিলাম। এই চারিটি বস্তু নিম্নোক্ত আয়াতটির বিষয়বস্তুই প্রকাশ করিতেছে।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ❋

(অতঃপর হাত উঠাইয়া দোআ করিলেন এবং মজলিস খতম হইল)

একটি ঘটনা : সাধারণভাবে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীই এই ওয়াযে বেশ প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। মাদ্রাসা জামেউল উলূমের এক মুদার্‌রেস ছাহেবের অবস্থা তো এইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, এশার নামাযের সময় হযরত থানবীর (রঃ) বিশ্রাম কেন্দ্রে একখানি দরখাস্ত সহ উপস্থিত হইলেন। উহাতে লিখিত ছিল, "আমি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া থানা ভোয়ান যাইতেছি, যদি হুযুর অনুমতি দেন।" হুযুর বলিলেন, আমি থানা ভোয়ানে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই দরখাস্তের উত্তর প্রদান করিব।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ❋